



সহপাঠ

(উপন্যাস ও নাটক)

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত।

সহপাঠ একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

নাটক : সিরাজউদ্দৌলা
সিকান্দার আবু জাফর

উপন্যাস : লালসালু
সৈয়দ উয়ালীউল্লাহ

লেখক ও সংকলক

অধ্যাপক ড. ভীমদেব চৌধুরী
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মালান
অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম
ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান
প্রীতিশ্রুত্যার সরকার

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য : ৬৮.০০ (আটষষ্ঠি টাকা মাত্র)।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চালেজ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অস্তিনিহিত যোগ্য ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিত্তির দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর দক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে একাদশ-ছাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিক্রিয়া ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্য ও অহঙ্কার অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিঙ্গ-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ আগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বৃত্তঙ্গুর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রশীত হয়েছে একাদশ-ছাদশ শ্রেণির প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উচ্চ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে অধিকাংশ বিষয়ের মূল্যবোধকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

একাদশ-ছাদশ ও আলিম শ্রেণির বাংলা সহগাঠ শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রশীত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির উপন্যাস ও নাটক এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিঙ্গ-সংস্কৃতি, নৈতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়া এই জনসোষ্ঠীর জীবনধারণ, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতিচেতনা, নারী-পুরুষের সমর্যাদাবোধ, আত্মবোধ, বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাকার বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকটি প্রশংসনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। সুস্থ চিত্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক ধরণের মধ্যে অতি বাল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলক্রটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংক্রলণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ছফ্টমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রশীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, নমুনা প্রশাসনি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আভ্যন্তরিত মনন, যোগ্য ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জাগন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।



(প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা)

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নাটক সিরাজউদ্দৌলা	সিকান্দার আর. জাফর	১-৬২
উপন্যাস লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	৬৩-১৪৮

নাটক

সিরাজউদ্দৌলা
সিকান্দার আবু জাফর

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির উপযোগী সংক্ষরণ



নাট্যকার-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৮ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত একজন কবি হলেও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিল তাঁর স্বচ্ছ পদচারণা। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি বরাবরই অঞ্চলভৌমী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ‘সমকাল’ হয়ে উঠেছিল তরুণ সাহিত্যিকদের মিলনস্থল; পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিগৰ্বক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এক বলিষ্ঠ প্লাটফর্ম। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচার কঠে প্রতিবাদ ব্যক্ত করায় এই পত্রিকা একাধিকবার নিষিদ্ধ ও এর প্রকাশিত সংখ্যা বাজেয়াঙ্গ হয়েছিল।

সিকান্দার আবু জাফরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তৎকালীন খুলনার (বর্তমানে সাতক্ষীরা) তালা বিডি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে (পূর্বনাম রিপন কলেজ) অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হবার পর ১৯৪১ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের মননশীল পেশায় তিনি যুক্ত হন। দেশভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় চলে আসেন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের স্টাফ আটিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন মুখ্যত একজন সাংবাদিক। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘নবযুগ’ পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে ‘সাংস্কৃতিক অভিযান’ পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের শুরুদায়িত্ব পালন করেন তিনি।

‘আয়াদের সংগ্রাম চলবেই’, ‘বাংলা ছাড়ো’ প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্মষ্টা সিকান্দার আবু জাফর নাট্যকার হিসেবেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। ‘সিরাজউদ্দৌলা’ ছাড়াও তাঁর আরও যেসব বিখ্যাত নাটক রয়েছে তাদের মধ্যে ‘মাকড়সা’ (১৯৬০), ‘শকুন্ত উপাধ্যান’ (১৯৬২) এবং ‘মহাকবি আলাওল’ (১৯৬৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাট্যচর্চার শীকৃতিস্থলে ১৯৬৬ সালে তাঁকে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। কবিতা ও নাটকের পাশাপাশি উপন্যাস, অনুবাদসহ বিভিন্ন স্থিতিশীল কর্মকাণ্ডে তিনি সবিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

নাটকের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

সাহিত্য রচনার একটি বিশেষ রূপশ্রেণি (genre) হলো নাটক। প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রে একে দৃশ্যকাব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। যিক ভাষা থেকে আগত ‘জ্ঞান’ শব্দটির অর্থ হলো ‘অ্যাকশন’ তথা কিছু করে দেখানো। বাংলা ‘নাটক’, ‘নাট’, ‘নট’, ‘নটী’ প্রভৃতি শব্দগুলি উভ্যে হয়েছে ‘নট’ ধাতু থেকে— যার অর্থ ‘নড়া-চড়া করা’। অর্থাৎ, নাটকের মধ্যে এক ধরনের গতিশীলতা রয়েছে যা একটি ত্রিমাত্রিক শিল্পকার্তামো গড়ে তোলে। বলে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান সময়ে নাটক পরিবেশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম টেলিভিশন হলেও মঞ্চেই নাটকের প্রকৃত ও যথার্থ পরিবেশনা-স্থল। তাই নাটক বিষয়ক এই আলোচনায় মঞ্চনির্ভর নাট্য-বৈশিষ্ট্যই কেবল বিবেচনা করা হবে। অকৃতপক্ষে নাটকের মধ্যে একটি সামষ্টিক শিল্প-প্রয়াস সম্পূর্ণ থাকে। এতে কুশীলবগণ দর্শকদের উপস্থিতিতে মধ্যে উপনীত হয়ে গতিময় মানব-জীবনের কোনো এক বা একাধিক বিশেষ ঘটনার প্রতিচ্ছবি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সাধারণভাবে, নাটকে যে চারটি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয় তা হলো : কাহিনি বা প্লট (plot), চরিত্র, সংস্কারণ ও পরিপ্রেক্ষিত। একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে ঘিরে শিল্প-ঘন কাহিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং সহায়ক বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপকে আশ্রয় করে উপস্থাপিত হবার প্রয়াস পায় নাটকে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নৃত্য-গীত, আবহ সংগীত, শব্দ সংযোজন, আলোক সম্পাদন, মঞ্চ-কৌশল প্রভৃতি। তবে, এটি নাটক সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা মাত্র। দু-হাজার বছরেরও বেশি বয়সী এই শিল্প মাধ্যমে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যারিস্টোটেল কিংবা শেকসপিয়ারের কালে সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য নিশ্চিত করা ছিল নাটক রচনার পূর্বশর্ত; কীভাবে কাহিনিমূখ (exposition), কাহিনির ত্রুম্যব্যাস্তি (rising action), চূড়াস্পর্শী নাট্যস্বন্দ (climax), প্রহিমোচন (falling action) এবং যবনিকাপাত (conclusion)-এর মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে নাটক শুরু থেকে সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাবে— তা-ও ছিল বিশেষভাবে কাঠামোবজ্জ্বল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবন পাল্টেছে। নাটক যেহেতু জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি সেহেতু এই জীবনশ্রেণির মূল বৈশিষ্ট্য অস্তুগ্রহণ রেখেও এতে নামাবিধ পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক কালে অনেক নাটকেই কোনো বৃত্ত থাকে না, কেবল একটি চরিত্রে নিয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্য সফল নাটক; এমনকি সংস্কারণ ছাড়াও নাট্য-নির্মাণ অসম্ভব নয়। তবে উল্লিখিত কাঠামোবজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যগুলো একজন নাট্যকারের পক্ষে যথার্থভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হলেই কেবল নাটকের সংগঠনে বিচিত্র মাঝে যোজনা করা সম্ভব।



নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যমাধ্যমের পার্থক্য কী— তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলোচনা হয়ে আসছে। মহাকাব্য ও নাটকের পার্থক্য নিয়ে ত্রিক সাহিত্যাত্ত্঵িকগণ আলোচনা করে গেছেন। নাটকের সঙ্গে যে সাহিত্য-মাধ্যমের সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড় সেই উপন্যাস থেকে নাটক কীভাবে ব্যতৃত— সেই বিষয়েও নানা মনীষী আলোকপাত করেছেন। তবে, উপন্যাস ও নাটকের পার্থক্য এক সময় যত প্রকটই থাকুক, উপন্যাস-রীতির পরিবর্তন সাধনে যে অসামান্যতা এসেছে তাতে বর্তমান কালে নাটক ও উপন্যাস একে অপরকে নানাভাবে পরিপূরণ করছে। প্রসঙ্গত নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় :

১. কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ এবং গতি নাটক ও উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য;
২. মানব মনস্তত্ত্ব, প্রেম, মহসুল, দ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ ও অন্যান্য মৌলিক প্রবৃত্তিসমূহের দ্বন্দজটিল উপস্থাপন উভয় শিল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়;
৩. এই দুই শিল্পমাধ্যমেই মিলনাত্মক কিংবা বিয়োগাত্মক কিংবা উভয়ের সমন্বিত পরিণাম দেখতে পাওয়া যায়;
৪. উভয় সাহিত্য রূপশৈলীই কেবল পাঠের (অধ্যয়ন করে) মধ্য দিয়েও সিদ্ধ উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা দান করতে পারে;

এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, নাটক একটি বিশেষ শিল্পীতি যা উপস্থাপনা, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাপের ভিত্তিতে উপন্যাস থেকে তাৎপর্যপূর্ণতাবে পৃথক। বলা যেতে পারে নাটক সাহিত্য হয়েও এর চেয়ে আরও বেশি কিছু। এর সঙ্গে দর্শকের ঝটিচ-চাহিদা, রংজমঞ্চের ব্যবস্থাপনা ও অভিনয়-কোশল অঙ্গসূচীতাবে সম্পৃক্ত। প্রাথাগতভাবে, নাটকে ঘটনা সন্নিরবেশকঞ্জে একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করা হয়। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ঘটনার বিকাশ থেকে পরিণতি ধাপে ধাপে সংঘটিত হতে থাকে। বলা প্রয়োজন যে, নাটকের শুরুতেই একটি দ্বন্দ্বের আভাস দেওয়া থাকে, যা মূলত নাটকটিকে পরিগণিতমুখী করে তুলবার বীজশক্তিকে ধারণ করে। নাটক যত এগিয়ে যায় সেই দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত রূপ লাভ করে একটি উত্তুজ অবস্থানে পৌছায়। আসলে নাটকের এই দ্বন্দ্ব নিজ গতিপথের দিক থেকে বিপরীতমুখী প্রবণতায় প্রতিভাত সত্যগুলিকেই রূপ দিতে সাহায্য করে। তাই বলা যায় যে, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং তার শিল্পসফল পরিসমাপ্তি নাটকের বিশেষ লক্ষণ।

নাটকের শ্রেণিবিভাগের বিষয়টি বিবেচনা করলে একে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভাজন সম্ভব। তবে, মুখ্যত নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা, ট্রাজিকমেডি এবং প্রহসন— এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে ট্র্যাজেডিকেই সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা হয়েছে; এমনকি কখনও কখনও নাটক বলতে ট্র্যাজেডিকেই বোঝানো হয়েছে। প্রথমেই ট্র্যাজেডি বিষয়ে সাধারণ ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন।

ট্র্যাজেডি : দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অভিনয় থেকে ‘ট্র্যাজেডি’র জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে ট্র্যাজেডি নাটকের মূলে রয়েছে ব্যক্তি-আত্মার দ্বন্দ্ব-বিকুঠ তীব্র যন্ত্রণা আর হাহাকার। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল যা বলেছেন, তা আজও সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষভাবে প্রগিধানযোগ্য। এস. এইচ. বুচার অনুদিত অ্যারিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিক্স’ (৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এতে বলেছেন :

Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

নায়ক কিংবা নায়িকামুখ্য করণ রস পরিবেশন ট্র্যাজেডির ধর্ম। এখানে রসই প্রধান। ট্র্যাজেডির ধর্ম হলো কোনো জটিল ও শুরুতর ঘটনার আশ্রয়ে বিশেষ ধরনের রসসংক্ষার যা আমাদের অনুভূতিকে অভূতপূর্ব আবহে আলোড়িত করবে। এটি জৈব-ঐক্যবিশিষ্ট হবে অর্থাৎ, এর একটি একক আটুট আকার থাকবে। সেইসঙ্গে, এর ভাষা হবে সাংগীতিক গুণসম্পন্ন। দ্বন্দ্পূর্ণ কাহিনির এতে বিশেষ ভূমিকা থাকলেও গঠনগত দিক থেকে এতে নাট্যিক বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। সর্বোপরি তা একদিকে দর্শকের মনে করুণা ও ভয়ের সংঘার করবে; আবার অপরদিকে এক ধরনের প্রশান্তি জাগাবে। কেননা, নাটকে শত-বিপর্যয় সত্ত্বেও নায়কের যে সুদৃঢ় মহিমাবিত অবস্থান রূপায়িত হবে তা দর্শককে বিস্ময়ঘন আনন্দ প্রদান করবে; একইসঙ্গে যে বিপর্যয় দর্শক দেখবেন তা তাঁকে এই বলে স্বত্তি দেবে যে, অন্তত দর্শকের নিজের জীবনে তা ঘটেনি। এতে দর্শকের ভাবাবেগের মোক্ষণ বা বিশেষ প্রবৃত্তির পরিশোধন ঘটাবে।

প্রাচীন শিক ট্র্যাজেডিতে ‘নিয়তির’ বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। মানুষ দৈবের কাছে কট্টা অসহায়, দৈবের দুর্বিপাকে মানুষ কীভাবে চরম হতভাগ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয় এবং বেঁচে থেকে মৃত্যুময় যজ্ঞগা ভোগ করে – তা-ই নানা বৈচিত্র্যে ছিক ট্র্যাজেডিতে শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই নিয়তি অতীতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো মানুষের দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাকে গ্রাস করে। যাকে ছিক ট্র্যাজেডিতে বলা হয়েছে নেমেসিস। অর্থাৎ, মানুষ কোনোভাবেই নেমেসিসকে এড়াতে পারে না – এই বিশ্বাস শিক ট্র্যাজেডির মর্মবাচী। সাধারণভাবে, হত্যা, মৃত্যু, ভাগ্য বিপর্যয়, ভাস্তি এইসব উপাদানেই প্রাচীন ট্র্যাজেডি সার্থকতা লাভ করেছে। তবে, এতে মানুষের সত্ত্বার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অস্বীকৃত। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজ নাট্যকার শেকসপিয়ার ট্র্যাজেডির এক ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজ পর্যন্ত এই আদর্শই বহুবিচ্ছিন্ন নাট্যিক কাঠামোকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শেকসপিয়ারের নায়ক-নায়িকা প্রায়শই নিজেদের কৃতকর্মে বিবেচনাগত ভুল বা error of judgement-এর জন্য দেয়। আর পরিপন্থিতে তা-ই তাদেরকে চরম মৃত্যুজ্ঞায় নিপত্তি করে। অর্থাৎ, দৈব নয়, মানুষের দুর্ভাগ্যময় পরিপন্থির কারণ মানুষ নিজেই – এই চিরায়ত সত্য দর্শক শেকসপিয়ারীয় ট্র্যাজেডির মধ্যমে বারবার উপলব্ধি করে। তবে যে ধরনের ট্র্যাজেডিই হোক না কেন, নায়ক কিংবা নায়িকার দুর্ভোগ বা sufferings সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর এর মধ্য দিয়েই ট্র্যাজেডি ভয়াবহতা-মিশ্রিত করুণরস সৃষ্টি করে। সফোক্লিস রচিত ‘আন্তেগোনে’, ‘অদিপাউস’, ইসকাইলাসের ‘আগামেমনন’, শেকসপিয়ারের ‘হ্যামলেট’, ‘ম্যাকবেথ’ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক।

কমেডি : অন্যান্য নাট্যশ্রেণির মধ্যে কমেডির পরিসমাপ্তি আনন্দে বা মিলনে। জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে আশ্রয় করে রসসৃষ্টি এবং আকর্ষণীয় ও হৃদয়ঝাহী সংলাপকুশলতার মধ্য দিয়েই এর সার্থকতা। সাধারণভাবে, জীবনের সহজ ও হাস্যরসপূর্ণ দিকটির রূপায়ণই কমেডির মূল প্রতিপাদ্য বলে বিবেচিত হয়। ট্র্যাজেডিতে যেমন নায়ক বা কোনো চরিত্রের হৃদয়-গভীরে গিয়ে তার মনোজগত, উপলব্ধির জগতকে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয় কিংবা নায়কের আত্মজিজ্ঞাসাকে ঘাস্তিক মাত্রায় উপস্থাপন করা হয় সেরূপ কোনো কৌশল কমেডিতে গৃহীত হয় না। এর একেবারে যে ব্যতিক্রম ঘটে না তা নয় তবে তা কখনোই ট্র্যাজেডির মতো একক কোনো চরিত্রকে আশ্রয় করে পরিষিদ্ধিশালী হয় না। নাটকের দম্প, জাটিলতা এসবই সকল চরিত্রের সমবায়ে সংঘটিত হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে নাটকে বুদ্ধি ও মননশীলতার তর্ফক প্রকাশ ঘটে। শেকসপিয়ারের ‘টেমিং অব দ্য শ্যু’, ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’, ‘কমেডি অব এরবস্’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কমেডি নাটক।

মেলোড্রামা : একে অতিনাটকও বলা চলে। মেলোড্রামায় আবেগের উৎকট প্রাধান্য থাকে। এটিও বিয়োগাত্মক নাট্যশ্রেণি। তবে, এতে ট্র্যাজেডির মতো কোনো উত্তুঙ্গ নান্দনিকতা সঞ্চারিত হয় না। কখনও কখনও নাট্যিক দম্প অস্পষ্ট রয়ে যায় কিন্তু আবেগের তীব্রতা দিয়ে এই শ্রেণির নাটক দর্শকের হৃদয়কে আন্দোলিত করতে চায়। প্রায়শই দুর্বল ট্র্যাজেডি নাটক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়।

ট্রাজিকমেডি : এতে ট্র্যাজেডির গুরুগম্ভীর পরিবেশকে খানিকটা লম্বু করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হাস্যরস সম্পৃক্ত করা হয়। এর প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে খুব সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞার্থ কিংবা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে, ট্রাজিকমেডির ধারণাকে নাট্যলক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে অনেক নাট্যকার dramatic relief হিসেবে ট্র্যাজেডি নাটকে স্বল্প পরিসরে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রহসন : মেলোড্রামা কিংবা ট্রাজিকমেডি থেকে প্রহসন বিভিন্ন মাপকাঠিতেই পৃথক। সমাজ বা ব্যক্তির দোষ-অসংগতি বিশেষভাবে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রকার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপমূলক নাটক রচিত হয়। এর বিষয় হিসেবে কোনো গভীর বা মৌলিক সমস্যাকে বেছে নেওয়া হয় না; কিংবা নিলেও তাকে সেই মাত্রার গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করা হয় না। ব্যঙ্গ বা সমষ্টির ভাস্তি, অসংগতি ও দুর্বলতার চিত্রসমূহ প্রহসনের বিষয় ও মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়। নাটকের চরিত্রসমূহের হাস্যকর ক্রিয়া, নির্বান্দিতা এবং কৌতুককর সংলাপ এই শ্রেণির রচনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাট্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের নাম স্মরণ করা যেতে পারে : ইসকাইলাসের ‘প্রমিথিউস বাউট’, সফোক্লিসের ‘দি কিং অদিপাউস’, ভবভূতির ‘স্বপ্ন বাসবদন্ত’, কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশূলকলম’, শেকসপিয়ারের ‘হ্যামলেট’, গ্রেটের ‘ফাউন্ট’, ইবসেনের ‘দি ডলস্ হাউজ’, স্ট্রিন্ডবার্গের ‘দি ড্রিম প্লে’, জর্জ বার্নার্ড শা-র ‘ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান’, চেখভের ‘দি চেরি অরচার্ট’, রবিন্সনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’, ম্যাস্কিম গোর্কির ‘দি লোয়ার ডেপথ’, শ্রেষ্ঠ-এর ‘মাদার কারেজ’ প্রভৃতি।



বাংলা নাটকের উৎসব ও বিকাশ

আধুনিক বাংলা নাটকের বিকাশে পাঞ্চাত্য বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের ভূমিকা সবিশেষ। উনিশ শতকে পাঞ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নবীন জীবনানুভব শিক্ষিত বাঙালিকে স্পর্শ করেছিল এবং যে নবজাগরণের সূচনা ঘটেছিল, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রকাশ ওই সময়ের প্রহসন; যার মথৰ্থ পরিণতি – বাংলা নাটক। উনিশ শতকের এক দন্তকুম্ভ পরিবেশে বাংলা নাট্যবন্ধের বিকাশের ধারাবাহিকতায় জন্ম নিল আধুনিক বাংলা নাটক। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে। হেরাসিম লেবেদেক, তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকন্নাথ দাসের সাহায্যে, ‘ছান্দবেশ’ (The disguise) নামক ইংরেজি থেকে অনুদিত নাটকের পাঞ্চাত্য ধাঁচের মঞ্চায়ন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু থিয়েটারে ও ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর নিজ বাড়িতেও বিলিতি ধরনের রঙমঞ্চের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তবে ১৮৫৭ সালে জানুয়ারি মাসে অনুবাদ নাটকের পরিবর্তে নন্দকুমার রায়ের ‘অভিজান শকুন্তলা’ প্রথম বাংলা নাটক হিসাবে অভিনীত হয়। এ পর্যায়ের নাটকের মধ্যে আরও উল্লেখ্য ১৮৫৭ সালে রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করঞ্জের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’। বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভৃতপূর্ব ঘটনা ঘটে পাইকগাড়ার রাজা দেশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং রাজা প্রাতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া বাগান বাড়িতে স্থাপিত নাট্যশালায়। ১৮৫৮ সালে ‘রঞ্জাবলী’ নাটক দেখতে এসে সদ্য মাদ্রাজফেরত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর মান দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য তাঁর হাত থেকে পেয়ে যায় প্রথম সার্থক বাংলা নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’। মধুসূদনের মেধাস্পর্শে বাংলা নাটকের বিষয়, সংলাপ, আদিক, মঞ্চায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। নবজগত বাঙালির প্রতিছবি হয়ে ওঠে এই নাট্যধারা ‘নব নাটক’ হিসেবে সবিশেষ পরিচিত। মধুসূদন, দীনবন্ধু এই নব নাটককে করে তুললেন অনেক বেশি কৃচিসম্মত ও নান্দনিক। এরই ধারাবাহিকতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দিজেন্দ্রলাল রায় প্রযুক্ত নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে বাংলা নাটকের অঙ্গে; বিকশিত হতে থাকে বাংলা নাট্যধারা। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ও আদিকে নিরীক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা নাটকে যোগ করেন বিশ্বমানের স্বাতন্ত্র্য। বিশ শতকের সাহিত্যে অমোদ প্রভাব বিস্তারকারী দুই বিশ্বযুক্ত এসময়ের নাটককে নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। এরই সঙ্গে রূপ বিপ্লব, ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, বিশ্বব্যাপী মার্কিসবাদের বিস্তার, তেতাঞ্জিশের মৰ্ষত্ব, দেশভাগ, শ্রেণিসংগ্রামচেতনা, শ্রেণিবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বাংলা নাটকে সূচনা করে গণনাট্টের ধারা। বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রযুক্ত নাট্যকার এই নতুন ধারার নাটক নিয়ে জনমানুষের কাছে পৌছাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হন। এর কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসা শোষণ ও বৈষম্য, এই অঞ্চলের নাট্যকারদেরও গণনাট্টের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে তোলে। সেইসঙ্গে, পূর্ববাংলায় একের পর এক আন্দোলনের পটভূমি স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যধারা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাংলা নাটকের নাম নিম্নরূপ : রামনারায়ণ তর্করঞ্জের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’, মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’, ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’, দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’, ‘সধবার একাদশী’, মীর মশাররফ হোসেনের ‘জামিদার-দর্পণ’, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’, দিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘সাজাহান’, বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবাবা’, তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়াতার’, উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ প্রভৃতি। বাংলা নাটকের এই সমৃদ্ধি উন্নয়নাধিকার বহন করে বাংলাদেশের একটি নিজস্ব নাট্যধারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে; যেমন : নূরল মোমেনের ‘নেমেসিস’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘বহিগীর’, মুনীর চৌধুরীর ‘চিঠি’, আলিস চৌধুরীর ‘মানচিত্র’, সাইদ আহমদের ‘মাইলস্টোন’, ‘কালবেলা’, মরতাজ উদ্দীন আহমদের ‘রাজা অনুসারের পালা’, ‘কি চাহ শজ্জালিল’, সৈয়দ শামসুল হকের ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’, ‘নূরলদীনের সারাজীবন’, জিয়া হায়দারের ‘শঙ্কা সুন্দর কল্পণী আনন্দ’, ‘এলেবেলে’, আবদুল্লাহ আল মামুনের ‘সুবচ্ছ নির্বাসনে’, ‘এখন দুঃসময়’, ‘মেরাজ ফকিরের মা’, মামুনুর রশীদের ‘ওরা কদম আলী’, ‘গিনিপিগ’, সেলিম আল দীনের ‘কিউনখোলা’, ‘কেরামতমঙ্গল’, এম এম সোলায়মানের ‘তালপাতার সেপাই’, ‘ইংগিত’ প্রভৃতি।

ইতিহাসভিত্তিক নাটক : প্রসঙ্গ ‘সিরাজউদ্দোলা’

ইতিহাসের সত্য এবং সাহিত্যের সত্য সবসময় অভিন্ন পথে না-ও চলতে পারে। তা সত্ত্বেও ইতিহাসকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির বীতি সুপ্রাচীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা” প্রবক্ষে ইতিহাসের ‘বহুতর ঘটনাপুঁজি’ এবং বিবিধ অনুষঙ্গকে সাহিত্যে পরিহার করার পক্ষে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, এতে সাহিত্য



নিজের ‘কর্তৃত’ হারিয়ে ফেলে এবং ফলত সাহিত্যের যে শিল্পরস আহরণ তা ব্যাহত হয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের মত ছিল, ইতিহাসকে কেবল ঘটনাসূত্রের মধ্যে সীমিত রেখে তাকে রচয়িতার সৃষ্টিশীল কল্পনায় ডুবিয়ে শিল্পস্থান করে তোলা। কেননা, ইতিহাসের পুনর্লিখন সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য নয়। তবে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে এক্ষণ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই যে, ইতিহাসের প্রতি সাহিত্যিকের আনুগত্য প্রদর্শন অপ্রয়োজনীয়। মূল কথা এই যে, ইতিহাসের মূল সত্ত্বের প্রতি আঙ্গ রেখেই সাহিত্যিক ইতিহাস-অবলম্বী সাহিত্য রচনা করবেন; তবে ইতিহাসকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণের কোনো দায় লেখকের থাকবে না।

বাংলা ইতিহাসভিত্তিক নাটক রচনার উল্লিখিত এই আদর্শ সর্বদা অনুসৃত হয়েছে — এমন দাবি যৌক্তিক হবে না। তবে, ইতিহাসকে অবলম্বন করে নাটক রচনার প্রচেষ্টা যে শতাব্দী-আটাচীন তা অনস্বীকার্য। এসব নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ইতিহাসের প্রসঙ্গ এসেছে তা রাজ-রাজড়ার ইতিহাস। কোনো স্ম্রাট কিংবা নবাব অথবা সেনাপতি তথা কোনো না কোনো সামন্ত বীর, এমনকি কখনও কখনও কোনো সামন্ত নায়ি এসব নাটকের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। অর্থাৎ, এই ধরনের নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সর্বদাই সামন্ত শ্রেণির প্রতিনিধি; যেখানে সামন্তপ্রভু তথা রাজার ইচ্ছাতেই প্রজার ইচ্ছা — কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা এক্ষেত্রে মূল প্রেরণা নয়। আর সাধারণভাবে, কেন্দ্রীয় চরিত্রকে মহিমাবিত করার অর্থ হলো প্রকারান্তরে সামন্ত ব্যবস্থাকেই অভিনন্দিত করা। কিন্তু সময় ভারতবর্ষ যে সময় সামন্ত কাঠামো থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, উপনিবেশ-শক্তির সঙ্গে লড়াই করে ক্রমশ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে চলেছে তখন এই পেছনমুখী সামন্তপ্রীতি সমাজ-পরিবর্তনের গতিধারার সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে উঠার আশঙ্কা জাগায়। আবার এ কথাও সত্য যে, দীর্ঘ ইরেজ শাসনের দ্বেরাটোপে থেকে নাট্যকারণা যখন কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পসূচির উপরোগী চরিত্রের সঞ্চাল করেছেন তখন তাঁদের সামনে এই সামন্ত বীরগণই আবির্ভূত হয়েছে। সমাজগতির বিপরীত প্রোত্তে না হেঁটেও উল্লিখিত এসব অনুষঙ্গ নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য নাট্যকারণা কখনও ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট হিসেবে রেখে তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন মানব-মনস্তুত, প্রেম, জীবনোপলক্ষি প্রত্তিতির দিকে, আবার কখনও অভিষ্ঠ সামন্ত নায়কের ইতিহাসসূত্রকে অঙ্গুষ্ঠ রেখে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে একটি দেশোভাবেক কাঠামোতে ওই চরিত্রটিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন; এমনকি এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটানোও অসম্ভব নয়। প্রথম বর্ণিত কৌশলের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিত হিসেবে স্মরণ করা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’ কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘সাজাহান’ নাটকের কথা; হিন্দীয় কৌশলের সবচেয়ে সমদ্রূপ দৃষ্টিত ‘সিরাজউদ্দৌলা’। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব যতই সামন্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হন না কেন, বাংলা নাট্যকারদের সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতাকামী মানুষের চিরায়ত আইকন। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে, ঐতিহাসিক চরিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ করেকটি নাটক লেখা হয়েছে। এসব নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্ৰ ঘোষ, শচীন সেনগুপ্ত এবং সিকান্দার আবু জাফর। গিরিশচন্দ্ৰ ঘোষ তাঁর রচিত নাটকের ভূমিকায় বলেন : ‘বিদেশি ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নির্বিলানাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বদ্দোপাধ্যায় প্রযুক্ত শিক্ষিত সুধী অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশি ইতিহাস খঙ্গন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবন্দেশ সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ওই সমস্ত লেখকগণের নিকট খৃণী।’ অপরাদিকে, শচীন সেনগুপ্ত তাঁর ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন : ‘ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি। নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের ঘটনাবস্থা জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। এই জন্য যে সংঘটিত ঘটনাটিই নাট্যকারের বিষয়বস্তু। রাজনৈতিক যে পরিস্থিতিতে সিরাজ বিব্রত ও বিপন্ন হয়েছিলেন, বহু দেশের বহু নরপতিকে সেইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেউ তা অতিক্রম করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, কেউ তা পারেননি। এইখানেই তাঁর স্বভাবের, তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা এসে পড়েছে। সেইখানেই রয়েছে নাটকের কাজ। আমি এই (সিরাজ) চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছি, সিরাজের মতো উদার স্বভাবের লোকের পক্ষে, তাঁর মতো তেজস্বী, নিভীক, সত্যশ্রয়ী তরুণের পক্ষে কুচক্ষীদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। বয়স যদি তাঁর পরিণত হতো, কৃটনীতিতে তিনি যদি পারদর্শী হতেন, তাহলে মানুষ হিসেবে ছোট হয়েও শাসক হিসেবে তিনি হয়ত বড় হতে পারতেন। সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা, সিরাজের অস্তরের দয়া-দাঙ্কিণ্যই তাঁকে তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিপন্থির পথে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়। অধিকাংশ বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এরকমই। সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয় হলো। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিও হলো পতিত।’

উল্লিখিত দুই নাটকের থেকে সিকান্দার আবু জাফরের নাট্যসূচির উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের নিজের অভিযোগ স্মরণীয় : ‘নৃতন মূল্যবোধের তাগিদে, ইতিহাসের বিভাস্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য ও প্রেরণার উৎস হিসেবে



সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নৃতন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজউদ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজউদ্দৌলার যে অক্ষিয় বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলোকে চাপা দেওয়ার জন্য ঔপনিরোধিক চক্রস্তকারীরা ও তাদের স্বার্থাঙ্গ স্বাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।' প্রকৃতপক্ষে, সিকান্দার যে সময়ে নাটক লিখছেন সেসময়ে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে ক্রমশ সোচার ও স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছে। ফলে, তাঁর নাটকের সিরাজ জনমানুষের মুক্তির কর্তৃত্বকে ধারণ করে আছে। মোটাদাগে ইতিহাসের নির্দেশনা মেনে নিয়ে সিকান্দার আবু জাফর এই নাটকে সিরাজউদ্দৌলাকে দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী বাঙালির জাতীয় বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

নাট্যরূপ দান ছাড়াও সিরাজউদ্দৌলার এই শর্মাঙ্গিক ঐতিহাসিক কাহিনি নিয়ে শাটের দশকে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে সিরাজউদ্দৌলা-চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত অভিনেতা আলোয়ার হোসেন বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এছাড়া এই ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশে অনেক যাত্রাপালা লিখিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা : নাটক বিশ্লেষণ

সিকান্দার আবু জাফর রচিত এই নাটকটি কর্মসূচীক; এক অপরিসীম যত্নাশাদস্ফুর পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে রচনাটি। ট্র্যাজেডিস্টুশ বেদনাবহতা এই নাটকে বিদ্যমান। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিরাজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজা একইভাবে ট্র্যাজেডির শিল্পমানকে স্পর্শ করেছে। এক অনিবার্য ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপন লক্ষ্যে অবিচল ধাকার মধ্য দিয়ে সিরাজকে নাট্যকার ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই এক অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আবার এ কথাও সত্য যে, সিরাজের মৃত্যু তাঁর যন্ত্রণাভোগের ও অবসান ঘটিয়েছে – যা ট্র্যাজেডির মেজাজ কিছুটা সুন্দর করেছে। তবে বলে রাখা প্রয়োজন, নাটকটি রচনার সমসময়ে বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতিতে যে আন্দোলনের অভিঘাত লক্ষ করা যাচ্ছিল তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই সম্ভবত, পুজানুপুজ্যভাবে ত্রীক কিংবা শেকসপিয়রীয় ট্র্যাজেডির ব্যাকরণ মেনে কোনো নাটক রচনায় নাট্যকার উন্নত হননি। কেননা, নাটকটির রচনাকাল মূলত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় নতুন করে বাঙালির জেগে উঠার সময়। এক অনিঃশেষ আশাবাদে উজ্জীবিত হবার সময়। এই প্রেক্ষাপটে ব্যর্থতা কারণ্য আসতেই পারে কিন্তু তা কোনোভাবেই অস্তিত্ব যন্ত্রণায় অবসিত হতে পারে না। অথচ ট্র্যাজেডি মানেই শেষ পর্যন্ত নায়কের সীমাহীন দুর্ভোগে নিপত্তি হওয়া। নাটক যেহেতু সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি সেহেতু সিকান্দার আবু জাফর সমকালকে সহীহ না করে পারেননি। যদি এর অন্যথা করতে চাইতেন তবে তা আরও অনেক বেশি শিল্পবৃক্ষের মধ্যে পড়ত। নাট্যকার উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রিক ট্র্যাজেডির নিয়তিবাদ একালে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আবার নিরপরাধ বাঙালিকে নেমেসিসের কাঠামোতে বাঁধবেন— এরও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাননি। সেই তুলনায় তাঁর অনেক বেশি আগ্রহের জায়গা ছিল শেকসপিয়র রচিত ট্র্যাজেডি। কেননা, এই প্রেমির ট্র্যাজেডিতে নায়কের কোনো অল্প বা ক্ষুদ্র ত্রুটি শেষ পর্যন্ত তাঁর চরম পরিণতির জন্য দায়ী বলে গণ্য হয়। শেকসপিয়রীয় ট্র্যাজেডি নায়কের কোনো বিবেচনাগত ভুল বা error of judgement-কে তিনি সিরাজের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু যেভাবে শেকসপিয়রের ‘ওথেলো’ কিংবা ‘হামলেট’-এর নায়কের অসহ্য যন্ত্রণা ও পরিতাপের আঙ্গনে দক্ষ হয়, এর খেকে মুক্তির কোনো পথ তাদের সম্মুখে অবশিষ্ট থাকে না, সেভাবে সিরাজকে নির্মাণ করার কোনো আঁচাহ সিকান্দারের ছিল না। তাহলে তিনি বাঙালিকে কী বার্তা পোঁছাতেন— আর কোনো আশা নেই, ভরসা নেই! এরপ তাঁর অবিষ্ট ছিল না। বরং তিনি বলতে চান, সিরাজ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, ষড়যন্ত্র টের পেয়েও ও ষড়ার্থ ও মানবিকতায় আমৃত্যু আস্থাশীল সিরাজ ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কখনো চরমভাবে নির্ম ও কঠোর হতে পারেননি। নাট্যকার আরও বলতে চান, সিরাজ যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আগাতভাবে পালিয়ে শিয়েও আবার যুদ্ধ করতে চেয়েছেন, শেষে বন্দি হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তারপরও সিকান্দারের নাটকের আন্তর-প্রেরণারপে এই সুর ধ্বনিত হতে থাকে— ‘জনতার সংগ্রাম চলবে’। সিরাজ পারেনি, এবার বাঙালিরা পারবে। এই আশাবাদ যে নাটকের মূলশক্তি সেই নাটকের পরিণতি নির্মাণে অনুপুজ্যভাবে ট্র্যাজেডির বিধিবদ্ধ কাঠামো অনুসরণ প্রত্যাশিত নয়। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি হওয়ার পরিবর্তে ট্র্যাজেডির লক্ষণাক্রম হওয়াই এই নাটকের শিল্পসাফল্যের অস্তর্নির্দিত প্রেরণা। তবে, কর্মসূচ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়েছে যাতে নাটকটি মেলোড্রামা বা অতিনাটকে পরিষ্ঠত না হয়। কেননা, কর্মসূচ যদি যথাযথভাবে ঘনীভূত না হয়, তবে তা অতি-আবেগ প্রকাশের মধ্য দিয়ে নাটককে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে; যা কোনোভাবেই সিকান্দারের কাম্য ছিল না। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে শিল্পসীমা লজ্জন না করে এই নাটককে এক বেদনবর্দ্ধ করণসামুক্ত পরিণতি প্রদান করেছেন। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আলোচ্য নাটকের প্রেক্ষাপট এবং তার শিল্পরূপ বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পলাশি যুদ্ধের পটভূমি

বাণিজ্যের আকর্ষণেই ইউরোপীয়রা দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতে আসে এবং ক্রমশ এদেশের রাজশীতিতে তারা তাদের অধিগত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। বাণিজ্যের কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে, এই অঞ্চলের পণ্য দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল সময় ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কলম্বাস এদেশ আবিষ্কারের উদ্দেশেই এককালে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন আমেরিকা। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, পর্তুগিজ নাবিক ও বেনিয়া ভাস্কো দা গামা ভারতে পৌছেছিলেন ১৪৯৮ সালে। এই পর্তুগিজদের সূত্র ধরেই একের পর এক বাণিজ্য কৃষ্টি পূর্ব-ভারতসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হতে থাকে। এরা দস্যুত্বিতেও লিঙ্গ ছিল। এদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে তৎপর হন যোগাল স্বার্ট জাহাঙ্গীর। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর অনুমতি পেয়েই ইংল্যান্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম সুরাটে বাণিজ্য কৃষ্টি স্থাপন করে। বলা যেতে পারে, এই আপাত ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ঘটনাটিই মূলত ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, ১৬৩২ সালে বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ সুজার সম্মতি পেয়ে ইংরেজরা হাঙ্গলিতে কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৬৯৮ সালে ইংরেজরা সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা প্রাম ত্রন্য করে এবং উল্লিখিত এই তিনটি প্রাম নিয়েই পরে কলকাতা নগরী গড়ে উঠে। এর কাছাকাছি সময়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। মরণপন্থ যোগাল স্বার্ট ফররুখ শিয়রকে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন। আর এরই পূরুক্ষার হিসেবে ডাক্তারের অনুরোধে ইংরেজদের এদেশে অবাধ বাণিজ্যের ফরমান প্রদান করেন স্বার্ট; যা ইংরেজদের বিনা শুক্রে বাণিজ্য, জমিদারি লাভ, নিয়ন্ত্রণ টাকশাল স্থাপন এমনকি দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করবার ক্ষমতাও প্রদান করে। তবে, দিল্লি থেকে এমন ফরমান জারি হলেও বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ তাঁদের নিজনিজ এলাকায় এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা কেউই বাদশার এই অন্যায় ফরমান মানেননি। আর এ থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের ঘনঘন সংঘর্ষ, লড়াই চলতে থাকে। এই সকল লড়াইয়ে ইংরেজরা বারংবার পরাভূত হয়েছে। অস্তত, নবাব আলিবর্দি খাঁ-র শাসনামল পর্যন্ত এসকল লড়াই খুব একটা ব্যাপকভাৱে লাভ করেন; তবে ভেতরে ভেতরে নানা রকম ষড়যন্ত্র চলছিল। কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে অতি অল্প বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে একের পর এক লড়াই ও ষড়যন্ত্রে লিঙ্গ হয়। ইংরেজদের এই ষড়যন্ত্রে সামিল হয় ফরাসিরাও। কেন্দ্রা, বাণিজ্য কৃষ্টি স্থাপনের সূত্র ধরে ফরাসিদেরও নানারকম স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়। বাণিজ্যের সূত্রে প্রথমে ফরাসি ও ইংরেজদের মধ্যে রেবারেষি তৈরি হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তারা একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এদিকে দিল্লির শাসনব্যবস্থা সেসময়ে দুর্বল থাকায় মারাঠা বর্গ, পারস্যরাজ নাদির শাহ, আফগান শাসনকর্তা আহমদ শাহ আবদালি প্রযুক্তের আক্রমণে গোটা দেশ জুড়েই অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসিরা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা দেশীয় স্বার্থপর লোকী বেনিয়া মুসুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। দেশীয় এসব ব্যক্তির কাছে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ শেষ কথা ছিল; তাতে দেশের ক্ষতি হলো কি না হলো সে বিষয়ে কোনো চিন্তা ছিল না। এমনকি দেশের স্বাধীনতা বিসর্জনেও তারা পিছ-পা হয়নি। বলা প্রয়োজন যে, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কিংবা নবাব আলিবর্দি খাঁ কেউই তাঁদের শাসনামলে এসব পুঁজিপতি কিংবা বিদেশি বেনিয়াদের কোনোরকম কোনো প্রশ্ন দেননি। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পর তিনিও একইভাবে পূর্বসূরিদের পদাক অনুসরণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বয়সে তরুণ। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবর্তীর্ণ হন। তবে ফরাসিদের প্রতি তার প্রশংশ্য ছিল বলে কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তা মনে করেন। কিন্তু সিরাজের সামনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। নবাবের অধিকাংশ অমাত্য ও সেনাপতি অর্থ ও ক্ষমতার লোভে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিঙ্গ হয়। মিরজাফর আলি খাঁ নিজেই নবাব হওয়ার লোভে হাত মেলান রাজা রাজবন্ধুত, জগত্শেষ্ঠ, রায়দুর্লভ প্রযুক্ত বিশ্বাসযাত্ক ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে। এমনকি নবাবের খালা ঘসেটি বেগমও নিজ পুত্রস্থে অঙ্ক হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য অর্থ ব্যয় করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭ প্রিষ্ঠাদের ২৩এ জুন পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব যুদ্ধে অবর্তীর্ণ হন। ইংরেজদের তুলনায় নবাবের অস্ত্র, গোলা-বাকুন, সৈন্য সবই বেশি ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ পক্ষে ছিল তিনহাজার সৈন্য এবং আটটি কামান; এর বিপরীতে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার এবং কামানের সংখ্যা ছিল তেক্ষণাত্ম। এত বিপুল সমর-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নবাবের পরাজয় হলো, কেননা তাঁর অধিকাংশ সেনাপতি



যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। এভাবে এক অন্যায় যুদ্ধে বাংলা ইংরেজদের অধীন হলো। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ বস্ত্ব করতে গিয়ে বিশ্বাসযাত্তক পুঁজিপতি আর সেনাপতিরা বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জন দিল। সিরাজের এই পরাজয়ে তাঁর সমরশক্তির কোনো অভাব ছিল না; কেবল অভাব ছিল নিকটজনের সততা ও আন্তরিকতার। এই পরাজয় একান্তভাবেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ঘটেছিল। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের সূত্রে ইংরেজরা দিল্লির সন্মাট ফররুখ শিয়র প্রদত্ত সেই ফরমান কার্যকর করতে সক্ষম হলো। এভাবেই বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইংরেজরা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলো।

নাটকের প্লটকাঠামো

নাটকটি চারটি অঙ্কে বারোটি দৃশ্যে রচিত। এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত। নাটকটি আবর্তিত হয়েছে সিরাজকে কেন্দ্র করে। নাটকের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে সিরাজ এবং অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে। নাটকটির কাহিনিমুখ উন্মোচিত হয়েছে যুদ্ধ দিয়ে। সিরাজের বাহিনী কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের তাড়িয়েছে। কিন্তু সিরাজের স্পন্তি নেই; তাঁকে সিংহাসন থেকে হটাতে চলছে নানাবিধি প্রাসাদ ঘড়্যস্ত্র। এরই সঙ্গে ক্রমব্যাঙ্গ হয়েছে নাটকের কাহিনি। যত্যন্ত্রের যে জাল ক্রমণ বিভাগ লাভ করেছে তাতে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিকটতম আজ্ঞায়, তাঁর প্রধান সেনাপতিসহ বিভিন্ন অমাত্য। নাট্যকার এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে গড়ে তুলেছেন নাট্যক দ্বন্দ্ব যাকে বহন করে চলেছে সিরাজের বহুমাত্রিক সংকট। একদিকে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে অপরাদিকে অসুয়া-বিষে জর্জীরিত ঘড়্যস্ত্রকারী নিকটজনদেরও পরিত্যাগ করতে পারছেন না সিরাজ। নাট্যকার এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি নাট্যক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তিনি নাটকটিকে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, সিরাজ সবকিছু বুঝতে পারছেন কিন্তু কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে তাঁর মানবিক শুগাবলি তাঁকে বাধা দিচ্ছে। এরকম একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে নাট্যকার আবাসও যুদ্ধের আবহ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এবার যত্যন্ত্র সফল হয়েছে; সিরাজের আস্থাভাজন সামরিক কর্মকর্তারা একের পর এক মৃত্যুবরণ করেছে; সিরাজকেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে হয়েছে – প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নয় রাজধানীতে ফিরে এসে আবার শক্তি সঞ্চয় করে ‘স্বাধীনতা বজায় রাখার শেষ চেষ্টা’ করার সংকল্পে। এভাবে, নাটক এগিয়ে গেছে ধ্রুভিমোচনের অভিমুখে। শেষ পর্যন্ত সিরাজের সংকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। সিরাজ ধরা পড়েছে, কারাগারে বন্দি হয়েছে এবং চূড়ান্ত দৃশ্যে কৃতৃপক্ষ মোহাম্মদি বেগের হাতে নিহত হয়েছে। এক অপরিসীম বেদনায় পাঠক হৃদয়কে ভারাকান্ত করে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নাটকটিতে সিকান্দার ইতিহাসকে পূর্বাপর অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কোনো শুরুত্তপূর্ণ ঘটনা তিনি বাদ দেননি বা পাস্টাননি। তবে, কোনো কোনো অঙ্কের শুরুতে তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যগত অসংগতি দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসকে শুরুত্ত দিতে গিয়ে কখনও কখনও সিরাজের চরিত্র-বিকাশও বাধাঘন্ট হয়েছে। বিশেষ করে নাট্যক দ্বন্দ্ব গড়ে উঠার ক্ষেত্রে যে সময় দেওয়ার দরকার ছিল, সিরাজের চরিত্র-মনন্তত্ত্ব প্রক্ষুটিত করে তুলতে যে ধরনের শিল্প-পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের চাপে ব্যক্তি-সিরাজের যন্ত্রণা, হাহাকার খুবই নিচু স্বরে নাটকে শোনা যায়। তারপরও এ কথা অনস্থীকার্য যে, ইতিহাসের নিরস তথ্যপূর্জ থেকে এক পরম মানবিক শুণসম্পন্ন উদার-হৃদয় স্বাধীনচেতা নবাবকে তিনি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

চরিত্রায়ণ কৌশল ও ক্ষেত্রীয় চরিত্র-চিত্রণ

একটি নাটকে যে এক বা একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাদের রূপায়ণের পেছনে সক্রিয় থাকে নাট্যকারের চরিত্রায়ণ কৌশল। এদিক থেকে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে, যত্যন্ত্র বিপর্যস্ত এক জাতীয় বীর নায়ককে সৃজন করাই ছিল নাট্যকারের কেন্দ্রীয় চরিত্রায়ণ কৌশল। লক্ষণীয় যে, বীরের বিপর্যয় দেখাতে গেলে নায়কের বিপ্রতীপ চরিত্রগুলোকেও সমান শৈলীক দক্ষতায় সৃজন করা প্রয়োজন। তা না হলে, নায়কের বিপর্যয়কে মহিমান্বিত করে তোলা সম্ভব হয় না। এই বিষয়টি আলোচ্য নাটকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হয়নি। নাটকে প্রায় চল্লিশটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু সিরাজ ব্যক্তি অন্য কোনো চরিত্রেই নাট্যিক শুণ নিয়ে বিকশিত হয়নি। এই চরিত্রগুলোর প্রতিটিই একমাত্রিক। ঘসেটি বেগম, ক্লাইত কিংবা মিরজাফর কেবলই শহ-মানসিকতার অধিকারী। মিরমর্দন, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা তথা নারায়ণ সিংহ কেবলই নীতিবান, শুক্র মানুষ। শুৎফুলেসার কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই পাঠকের চোখে পড়ে না। কিন্তু দোষে শুণে মিলিয়েই তো মানুষ; যা এই নাটকে অনুপস্থিত। এই একমাত্রিকতার সমস্যা সিরাজের মধ্যেও বিদ্যমান।



সিরাজও ধীরোদাস্ত, স্থির-প্রতিজ্ঞ, সহানুভূতিশীল; বলতে গেলে প্রায় ছটচিহ্ন। নিকটজনদের পরিত্যাগ করতে না পারা কিংবা কঠো শাস্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়ার error of judgement যদি তাঁর চরিত্রে অন্ধিত না হতো তবে পুরো নাটকটিরই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিত।

সিরাজ চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একজন সামন্ত নবাব থেকে জনতার শক্তিতে জাপ্ত হবার বিশ্বাস নিয়ে দেশপ্রেমিক নেতায় পরিগত হওয়া। নাটকের উপান্তে লক্ষ করা যায় যে, সিরাজ আর জনতা একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। সিরাজকে তারা সমর্থন করে। কিন্তু জনতা যুদ্ধ জানে না। তাই সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হবার পরে জনতা অত্যন্ত বাস্তব কারণেই ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার ছেড়েছে। বুবাতে কষ্ট হয় না এই প্রস্থান অনেক কষ্টের, নিতান্তই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। এই জনসম্পৃক্ততাই সিরাজ চরিত্রিকে অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কিন্তু সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতা হলো তাঁর যত্নগাভোগের সীমাবদ্ধতা। নবাব দরবার থেকে জনতা সরে যাবার পর লুৎফার সঙ্গে সিরাজের যে কথোপকথন লক্ষ করা যায়, তাতে একদিকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের আশাবাদ অপরদিকে পলায়নের প্লানি – এই দুয়ো মিলে যে মনীভূত ক্লাইম্যাত্রের জন্য দিতে পারত তা পরিস্কৃত হওয়ার প্রয়োজনীয় সুযোগ পায়নি। নাটকের শেষ অক্ষের প্রথম দৃশ্যে সিরাজ অনুপস্থিত; আর দ্বিতীয় দৃশ্যে খুব অল্প পরিসরেই সিরাজ নিহত হয়। ফলে, বন্দি সিরাজের যত্নগাভোগ, তাঁর দন্ত, পরিতাপ কোনোকিছুই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু নাট্যকার এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তুলতে চেয়েছেন পাঠক ও দর্শকের মাঝে সিরাজের জনসম্পৃক্তির আমেজকে বজায় রাখার মধ্য দিয়ে। সিরাজের মৃত্যুতে নাটক শেষ হয় কিন্তু নাট্যকারের বার্তা ছাড়িয়ে পড়ে পাঠক তথা দর্শকের মধ্যে। সিরাজের মৃত্যু দৃশ্যবর্ণনা করতে শিয়ে নাট্যকার যখন বলেন : ‘শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মৃষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল’ – তখন এই ‘আক্ষেপ’ তো লালন করে পাঠক-দর্শক। এই ‘আক্ষেপ’ থেকে মানুষের মধ্যে এমন প্রভায় জেগে উঠে : সিরাজ যা পারেনি তা তাদের পারতে হবে। সিরাজের অসমান্ত লড়াইটি তাদেরকেই শেষ করতে হবে। সকল যত্নের জাল ছিন্ন করে দেশকে স্বাধীন করতে হবে, স্বাধীনতার সুরক্ষা করতে হবে। কর্মণরসাত্মক পরিগতি সংগ্রহের মধ্য দিয়ে বিশাল জনমানুষের মধ্যে এই লড়াকু মনোভাবকে জাগিয়ে তোলাই সিরাজ চরিত্রের সার্থকতা।

নাটকের গঠন-কৌশল

সিকান্দার আবু জাফর নাটকটির গঠনবৈশিষ্ট্য নিয়ে খুব বেশি নিরীক্ষা করেননি। এমনকি দৃশ্যগুলো কীভাবে মঞ্চায়িত হবে তা-ও খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, মূলীর চৌধুরী রচিত ‘কবর’ নাটকের কথা; যেখানে আলোর ব্যবহার, মধ্যের গঠন পরিবেশ প্রভৃতির বিস্তৃত উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। তবে, ইতিহাস-আন্তিম নাটকের উপযোগী সংলাপ ব্যবহার ‘সিরাজউদ্দেলা’-র অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সিরাজ যখন বলেন : ‘বাঢ়ার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরংবে অস্ত ধরবার স্পর্শ ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ত চাই’ – তখন তার সাহস, ধীরত্বই প্রতিভাত হয়; যা ইতিহাস-আন্তিম নাটকের জন্য একান্ত জরুরি। আবার এই সিরাজকেই তিনি তৃতীয় অক্ষের প্রথম দৃশ্যে লুৎফার সঙ্গে সংলাপ বিনিয়োগের সূত্র ধরে একজন হৃদয়বান, মানবিক শুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে, নবাব হিসেবে, স্বামী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে, যথোপযোগী সংলাপ ব্যবহার এই নাটকের গঠন-কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নাট্যকার স্টেলিত পরিবেশ সৃজনের প্রয়োজনে কখনও আলংকারিক সংলাপ ব্যবহার করেন, dramatic relief-এর জন্য রাইসুল জুহালাৰ মতো চরিত্র সৃষ্টি করেন; তার সংলাপে, সিরাজের সংলাপে নানা বিদ্রূপ, শ্রেষ্ঠ কিংবা প্রতীকী বক্তব্য সমন্বিত করেন। অপরদিকে বোরকা পরিয়ে ক্লাইভকে দৃশ্যে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তার ভারতাকে প্রকট করার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসেরও সংগ্রহ ঘটান। উমিচাঁদ, জগন্মশেষ কিংবা মিরজাফরের সংলাপে বালাখিল্পনা এনে তাদের কাপুরুষতাকে তুলে ধরেন।

নাটক মূলত ক্রিয়াশীলতার সৃজনভূমি। এই চিন্তা সিকান্দার পূর্বাপর বজায় রেখেছেন। দীর্ঘ বর্ণনার ভার কখনোই নাটকটিকে আকস্ত করেনি। একটি দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যে নাট্যকার চলে গেছেন অনায়াসে দ্রুততার সঙ্গে। এমনকি পলাশির প্রান্তর থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে ফিরে এসে সিরাজের মধ্যে যে বর্ণনাধীর্ঘী সংলাপ প্রদানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা-ও মূলত সিরাজকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে আলংকার ব্যবহার এবং দৃঢ় ও সাবলীল ভাষায় নাট্যিক বক্তব্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সিকান্দার আবু জাফর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।



প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিতে নেপথ্যে ঘোষণা :

- ঘোষণা :** এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্যোগের পথ আমরা পাঢ়ি দিয়েছি; বহু লাঞ্ছন বহু পীড়নের প্লানি আমরা সহ্য করেছি। দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। আজ এই নতুন দিনের প্রাণে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজউদ্দোলাকে।
নবাব সিরাজের দুর্বহ জীবনের মর্মন্ত্ব কাহিনি আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায়, গভীর সহানুভূতিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিহ্য। আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি।

১৭৫৬ সাল : ১৯এ জুন।

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১৯এ জুন। স্থান : ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।

[শিল্পীবন্দ : মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে—ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালি খান, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাদ,
মিরমর্দান, মানিকচাদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াট্স]

(নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই।
তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয়ে গোলন্দাজ নিয়ে কামান চালাচ্ছেন। ইংরেজ
সৈন্যের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কযন্ত হয়ে পড়েছে।)

ক্লেটন : প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের
প্রতিজ্ঞা। ভিট্টরি অর ডেথ, ভিট্টরি অর ডেথ।

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙালি গোলন্দাজের দিকে
এগিয়ে গেলেন)

ক্লেটন : তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসল্ল দেখে কাপুরুষের মতো
হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো। ভিট্টরি অর ডেথ।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

ওয়ালি খান : যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ক্লেটন : না, না।

ওয়ালি খান : এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও
তারা রেহাই দেবে না।

ক্লেটন : চুপ বেইমান। কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ওয়ালি খান : ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা
বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রমান দেবে।

ক্লেটন : হোয়াট? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

(ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)



- জর্জ : ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিনায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিস পয়েন্টের সমস্ত ছাউনি ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।
- ক্লেটন : কী করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?
- জর্জ : উমিচাঁদের শুণ্ঠর নবাব ছাউনিতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলাম্বাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্ত্রোত্তের মতো ছুটে আসছে।
- ক্লেটন : বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিণ্ঠসরে) ক্যাপ্টেন মিনচিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেননি?
- জর্জ : ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউঙ্গিলার ফকল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।
- ক্লেটন : কাপুরুষ, বেইমান। জুলন্ত আগন্তনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, শুলি চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে উঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের প্রস্তান)

- হলওয়েল : এখন শুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি, ক্যাপ্টেন ক্লেটন?
- ক্লেটন : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি, সার্জন হলওয়েল?
- হলওয়েল : আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসংগত।
- ক্লেটন : তাতে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন।
- হলওয়েল : তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সঙ্গে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্য তো দূরের কথা এক ছুটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।
- (বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)
- ক্লেটন : তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি।
(ক্লেটনের প্রস্তান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। হলওয়েল চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন।)

- হলওয়েল : (পায়চারি থামিয়ে হঠাত চিন্তার করে) এই কে আছ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

- জর্জ : ইয়েস, স্যার।
- হলওয়েল : উমিচাঁদকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়েছে?
- জর্জ : পাশেই একটা ঘরে।
- হলওয়েল : তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।
- জর্জ : রাইট, স্যার।

(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তেই উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

- উমিচাঁদ : (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত, সার্জন হলওয়েল।
- হলওয়েল : সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাত বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিশ্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাত বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন তো?
- উমিচাঁদ : (কান পেতে শুনল) বোধহয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।



- হলওয়েল** : এই সুযোগের সম্ভবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরোধ করুন নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।
- উমিচাঁদ** : বন্দির কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি গভর্নর ড্রেকের ধৰ্মস দেখতে চাই।

(জর্জের প্রবেশ)

- জর্জ** : সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রাজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকা করে পালিয়ে গেছেন।
- হলওয়েল** : দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন?
- জর্জ** : গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে শুলি ছুড়েছিল, কিন্তু তিনি আহত হননি।
- উমিচাঁদ** : দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।
- হলওয়েল** : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আধ ঘটা আগেও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।
- উমিচাঁদ** : ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ শুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।
- হলওয়েল** : উমিচাঁদ, এখন উপায়?
- উমিচাঁদ** : আবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা যয়দানে গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।

(আবার প্রচণ্ড গোলার আওয়াজ ভেসে এল)

- হলওয়েল** : (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।
- উমিচাঁদ** : আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রাকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।

(উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাত বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গোল। বেগে জর্জের প্রবেশ)

- জর্জ** : সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সৈন্য গঙ্গার দিককার ফটক ভেঙে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হড় হড় করে কেন্দ্রার ভেতরে চুকে পড়েছে।
- হলওয়েল** : সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও।

(জর্জ ছুটে গিয়ে একটি নিশান উড়িয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মিরমর্দানের প্রবেশ)

- মিরমর্দান** : এই যে দুশ্মনরা এখানে থেকেই শুলি চালাচ্ছে।
- হলওয়েল** : আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে—
- মিরমর্দান** : সন্ধি না আত্মসমর্পণ?
- মানিকচাঁদ** : সবাই অস্ত্র ত্যাগ কর।
- মিরমর্দান** : মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।
- মানিকচাঁদ** : তুমিও হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দুহাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে।

(দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দিরা কুনিশ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবারে ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)

- সিরাজ** : কোম্পানির ঘূষখোর ডাঙ্কার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।



- হলওয়েল : আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।
- সিরাজ : জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছ তাতে তোমাদের ওপরে সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশি হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?
- হলওয়েল : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।
- সিরাজ : কলকাতার আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার ড্রেক প্রাণভয়ের মতো ল্যাজ শুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কৈফিয়ত তবু কাউকে দিতেই হবে? বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অন্ত ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ত চাই।
- হলওয়েল : আমরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে-
- সিরাজ : শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অন্ত আমদানি করছিলে, তাই না? খবর পেয়ে আমার হৃকুমে কাশিমবাজার কুঠি জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কলেটকে। রায়দুর্লভ।
- রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : বন্দি ওয়াটসকে এখানে হাজির করুন।

(কুর্নিশ করে রায়দুর্লভের প্রস্থান)

- সিরাজ : তোমরা ভেবেছ তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমি রাখি না।
- (ওয়াটসসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)
- ওয়াটস : ওয়াটস।
- সিরাজ : ইওর এক্সিলেন্সি!
- সিরাজ : আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাঞ্চলি আমদানি করছ, কলকাতার আশেপাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিয়েখ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাওনি। তোমরা কি ভেবেছ ইসব অনাচার আমি সহ্য করব?
- ওয়াটস : আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউলিলের কাছে পেশ করব।
- সিরাজ : তোমাদের ধৃষ্টতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।
- ওয়াটস : কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।
- সিরাজ : বাদশাকে তোমরা ঘূরের টাকায় বশীভূত করেছ। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।
- হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।
- সিরাজ : আর আমাকে তিনি যে অনুমতি দান করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কিলপ্যাট্রিক, ফ্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ফ্লাইভ লন্ডনের সিক্রেট কমিটির সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছ? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্য এ পর্যন্ত কোনো বিম্ব ঘটাইনি। কিন্তু সম্ভবহার তো দূরের কথা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায়।
- ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি আমাদের সম্বন্ধে তুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। উই হ্যাত কাম্টু আর্ন মানি অ্যান্ড নট টু গেট ইন্টু পলিটিক্স। রাজনীতি আমরা কেন করব।



সিরাজউদ্দোলা

- সিরাজ : তোমরা বাণিজ্য কর? তোমরা কর লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থায় ওল্টপালট আনতে চাও। কর্ণটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমারা কী করেছ? শাসন স্মরণ করায়স্ত করে অবাধ লুটতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছ। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ-সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি। কেন?
- হলওয়েল : ফরাসি ভাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।
- সিরাজ : ফরাসিরা ভাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?
- ওয়াটস : আমরা অশান্তি চাই না, ইওর এক্সিলেপ্সি
- সিরাজ : চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্গভ।
- রায়দুর্গভ : জাঁহাপনা!
- সিরাজ : গভর্নর ড্রেকের বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশপাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোনো ইংরেজের কাছে কোনো থকারের সওদা না বেচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রহ্য করলে তাকে শুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।
- রায়দুর্গভ : হ্রস্ব, জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আজ থেকে কলকাতার নাম হলো আলিনগর। রাজা মানিকচাঁদ, আপনাকে আমি আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করলাম।
- মানিকচাঁদ : জাঁহাপনার অনুগ্রহ।
- সিরাজ : আপনি অবিলম্বে কোম্পানির ধাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াশ্প করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানির প্রতিনিধিরা আর কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।
- মানিকচাঁদ : হ্রস্ব, জাঁহাপনা।
- সিরাজ : (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হলো, উমিচাঁদ।
 (উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির)
- আর (মিরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।
- মিরমর্দান : হ্রস্ব, জাঁহাপনা।
- সিরাজ : হলওয়েল।
- হলওয়েল : ইওর এক্সিলেপ্সি।
- সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি। (রায়দুর্গভকে) কয়েদি হলওয়েল, ওয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।
- রায়দুর্গভ : জাঁহাপনা!
- (সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল।)

[দ্রশ্যান্তর]



দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়: ১৭৫৬ সাল, তুরা জুলাই। স্থান: কলকাতার ভাগীরথী নদীতে
ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।

[শিল্পীবৃন্দ: মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে—ড্রেক, হ্যারি, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক,
হলওয়েল, ওয়াটস, আর্দলি।]

(কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের
চরম দুরবস্থা। আহার্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ-সামান্য চোরাচালান আসে। পরিধেয়
বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেরই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও নিয়মিত পরামর্শ চলছে কী করে উকার
পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক,
কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দুজন তরঙ্গ ইংরেজ।)

- | | | |
|--------------|---|--|
| ড্রেক | : এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোন, প্রয়োজনীয় সাহায্য—
হ্যারি | : এসে পড়ল বলে, এই তো বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌছোবার আগেই
আমাদের দফা শেষ হবে মি. ড্রেক। |
| মার্টিন | : কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আগাতত আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়।
তিনি মাত্র শ-আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙাও করা যাবে না।
যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা। | |
| ড্রেক | : তবুও তো লোকবল কিছুটা বাড়ল। | |
| হ্যারি | : লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আমাদের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক। | |
| ড্রেক | : আহার্য কোনো রকমে জোগাড় হবেই। | |
| মার্টিন | : কী করে হবে তাই বলুন না মি. ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যটাই তো জানতে চাইছি। এ
পর্যন্ত দুবেলা আহার্যের বন্দোবস্ত হয়েছে ধারেকাহে হাটবাজার নেই। নবাবের হৃকুমে
প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেচেও না। চারঙ্গ দাম দিয়ে কতদিন গোপনে
সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার। | |
| কিলপ্যাট্রিক | : এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন? | |
| হ্যারি | : ধৈর্য ধরব আমরা কীসের আশায় সেটাও তো জানতে হবে। | |
| ড্রেক | : যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়। | |
| মার্টিন | : যাঁরা এ পর্যন্ত হৃকুম দেবার মালিক তাঁদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত।
বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ। | |
| ড্রেক | : আমার হঠকারিতা? | |
| মার্টিন | : তা নয়ত কি? অমন উদ্ভুত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের
আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কী কারণ? | |
| ড্রেক | : সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না। | |
| হ্যারি | : তা তো বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মি. ড্রেক, তা
নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘূর্মের
অঙ্গ বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধর্মকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে
পারেননি মি. ড্রেক। | |



- ড্রেক** : আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।
মার্টিন : রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বাস্তিল কাগজ দেখিয়ে) ওইতো রিপোর্ট তৈরি করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তার। ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?
- ড্রেক** : (টেবিলে ঘূষি মেরে) দ্যাটস নাম অব ইওর বিজেনেস।
মার্টিন : অব কোর্স ইট ইজ।
কিলপ্যাট্রিক : তোমরাই বা হঠাত এমন সাধুত্বের দাবিদার হলে কীসে?
- ড্রেক** : তোমাদের দুজনের ব্যাংক ব্যালানস বিশ হাজারের কম নয় কারোরই। অথচ তোমরা কোম্পানির সম্মত টাকা বেতনের কর্মচারী।
হ্যারি : ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘৃষ খাইনি।
ড্রেক : আমিও ঘৃষ খাইনে।
মার্টিন : অর্থাৎ ঘৃষ খেয়ে খেয়ে ঘৃষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।
ড্রেক : তোমরা বেশি বাড়াবাঢ়ি করছ। ভুলে যেও না এখনো ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।
হ্যারি : ফোর্ট উইলিয়াম?
ড্রেক : ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনো আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।
- মার্টিন** : বড়াই করে কোনো লাভ হবে না, মি. ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।
ড্রেক : এত বড় স্পর্ধা? উইথড্র। হোয়াট ইউ হ্যাভ সেইড, মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। নাথিংশ্ট অফ অ্যান আনকডিশনাল অ্যাপোলজি উইল সেইড ইউ। মাফ চাও তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার ছক্ক দিয়ে দেব।
- (জনেক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাতে ড্রেকের কথায় ঝক্খে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)
- ইংরেজ মহিলা** : তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দস্ত সহ্য করা যেত।
ড্রেক : উই আর ইন দ্যা কাউন্সিল সেশন, ম্যাডাম, এখানে মহিলাদের কোনো কাজ নেই।
ইংরেজ মহিলা : ড্যাম ইওর কাউন্সিল, প্রাণ বাঁচাবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত ফলাচ্ছেন সব।
ড্রেক : সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।
ইংরেজ মহিলা : ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে তো নিজেদের ভেতরে ঝাগড়া। এদিকে দিনের পর দিন এক বেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে, অহোরাত্র এক কাপড় পড়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘূঁটে যাবার জোগাড়।
ড্রেক : বাট ইউ সি—
ইংরেজ মহিলা : আই ডু নট সি অ্যালোন, ইউ ক্যান অলসো সি এভরি নাইট। এক প্রস্তুত জামা-কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই আক্র নেই। এনিবড়ি ক্যান সি দ্যাট পিটিএবল অ্যানটমিক এক্সিবিশন। এর চেয়ে বেশি আর কী দেখতে চান?
- (হাতের ভিজে গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাটি, এমন সময় জনেক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।)



- সৈনিক** : মি. হলওয়েল আর মি. ওয়াট্স।
 (প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াট্স তুকল)
- কিলপ্যাট্রিক** : গড় প্রেশাস্
হলওয়েল : (সকলের উদ্দেশে) গুড মর্নিং টু ইউ।
 (সকলের সঙ্গে করম্দন। ওয়াট্স কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে করম্দন করল।
 মহিলাটি একটু ইতস্তত করে অন্য দিকে চলে গেলেন।)
- ড্রেক** : বল, খবর বল হলওয়েল। উৎকর্ষায় নিশ্চাস বন্ধ হয়ে এল যে।
হলওয়েল : মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে
 হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।
- ড্রেক** : কলকাতায় ফেরা যাবে?
হলওয়েল : না।
ওয়াট্স : আপাতত নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
- কিলপ্যাট্রিক** : কী রকম ব্যবস্থা?
ওয়াট্স : অর্থাৎ মেজাজ বুঝে যথাসময়ে কিছু উপটোকনসহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে
 তোলা সম্ভব হবে।
- ড্রেক** : তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?
হলওয়েল : একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজের ব্যবসা সমূলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা
 চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।
- ড্রেক** : তাহলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয়।
হলওয়েল : কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিঁচান নিজের থেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।
- ড্রেক** : হ্ররে।
ওয়াট্স : মিরজাফর, জগৎশেষ, রাজবংশুভ এঁরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কথাটা তুলবেন।
ড্রেক : (হ্যারি ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। আমাদের
 মিলেমিশে থাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।
- হ্যারি** : আমরা তো বাগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।
মার্টিন : যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই।
- (উভয়ের প্রস্থান)
- ড্রেক** : (উচ্চকণ্ঠে) পেশেল ইজ দ্যা কী ওয়ার্ড, ইয়াংম্যান।
হলওয়েল : (পায়ে চাপড় মেরে) উঃ, কী মশা। সিরাজউদ্দৌলা মসকিউটো ব্রিগেড মিলাইজ করে
 দিয়েছে নাকি?
- ড্রেক** : যা বলছ ম্যালেরিয়া আর ডিসেন্ট্রিতে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।
ওয়াট্স : বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।
ড্রেক : বাট ইট ইজ ইমপরট্যান্ট ফ্রম মিলিটারি পয়েন্ট অব ভিউ। সমুদ্র কাছেই। কলকাতাও চান্দি
 মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।
- কিলপ্যাট্রিক** : দ্যাটস ট্রু। কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ।
 নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। বিপদ যদি আসেই
 তাহলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গার স্রোতে ভেসে। কাজেই সর্তক হবার যথেষ্ট
 সময় পাওয়া যাবে।



- হলওয়েল** : কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গ ফেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেব।
- ড্রেক** : অফকোর্স নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু ফৌজদারের ভয়েই তা পারছে না।
(প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরো কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চেঁচিয়ে উঠল)
উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।
- সকলে** : হোয়াট? এত তাড়াতাড়ি। (চরসহ প্রহরীর প্রবেশ। অভিবাদনাত্তে ড্রেকের হাতে পত্র দিল আগস্তক। ড্রেক ইঞ্জিত করতেই তারা আবার বেরিয়ে গেল)
- ড্রেক** : (মাঝে মাঝে উচ্চেঃস্থরে পত্র পড়তে লাগল)- আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। শৃঙ্খ পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। - মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে, সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এর জন্যে তাহাকে বারো হাজার টাকা নজরানা দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলেই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বলা বাহ্যিক, পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। অবশ্য ড্রেক সাহেবের বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য না হইলে দুই চারি শত টাকা কম লইতেও আমার আপত্তি নাই। কোম্পানি আমার ওপর ঘোলো আনা বিশ্বাস রাখিতে পারেন। সুন্দর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমি আপনাদেরই সমগ্রোত্তীয়।' (চিঠি ভাঁজ করতে করতে)
এ পারফেক্ট স্কাউট্রেল ইজ দিস উমিচাঁদ।
- হলওয়েল** : কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।
- ওয়াটস** : ইভেন হোয়েন ইট ইজ টু কস্টলি।
- ড্রেক** : সেই তো মুক্তি। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতেরো হাজার টাকা দাবি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দুইহাজারের বেশি মানিকচাঁদের পক্ষে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।
- হলওয়েল** : কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?
- ড্রেক** : দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।
(বেরিয়ে গেল)
- ওয়াটস** : শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কী লাভ? মিরজাফর, জগৎশ্রেষ্ঠ, রাজবংশাভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?
- কিলপ্যাট্রিক** : দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।
- হলওয়েল** : কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হলো বখরা নিয়ে মতান্তর ঘটলে।
(ড্রেকের প্রবেশ)
- ড্রেক** : (উমিচাঁদের চিঠি বার করে) আর একটা জরুরি খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নিবে মিরজাফর, রাজবংশের দল। তারা শওকত জঙ্গকে সমর্থন করবে।

- ওয়াটস** : খুব স্বাভাবিক। শঙ্ককতজ্জ্ঞ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। তাঁ খেয়ে নাচওয়ালিদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।
- ড্রেক** : আগেভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।
- কিলপ্যাট্রিক** : আই সেকেন্ড ইউ।
- ওয়াট্স** : তা পাঠান। কিন্তু সম্ভে হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?
- ড্রেক** : অর্ডারলি, বাতি লে আও।
- হলওয়েল** : নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দুদিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?
- ড্রেক** : নট সো ব্যাড আই হোপ।
- (আর্দালি একটা বাতি রাখল)
- ড্রেক** : পেগ লাগাও।
- (দ্বারে থেকে কষ্টস্বর)
- নেপথ্য** : জাহাজ— জাহাজ আসছে।
- চারজনে**
- সমস্বরে** : কোথায়? ফ্রম ছাইচ সাইড?
- নেপথ্য** : সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দুইখানা, তিনখানা, চারখানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজ। কোম্পানির জাহাজ!
- (আর্দালি বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)
- ড্রেক** : কোম্পানির জাহাজ? মাস্ট বি ফ্রম ম্যাজ্রাস। লেট আস সেলিব্রেট। হিপ হিপ হুররে।
- সমস্বরে** : হিপ হিপ হুররে।
- (সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল)
[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১০ই অক্টোবর। স্থান : ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

[শিল্পীবৃন্দ : মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেষ, রাইসুল জুহালা, রায়দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।]

(প্রৌঢ়া বেগম জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিত। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেষ, রায় দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাস্তুল এবং তাত্ত্বকৃত পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্রবেশী অভিথির সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হলো। সকলের হাততালি।)

- ঘসেটি** : বসুন, উমিচাঁদজি। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।
- উমিচাঁদ** : (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাঝ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে শুষ্ক। আজকের জলসা সরগাম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।
- রাজবল্লভ** : তাহলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-
- উমিচাঁদ** : না, না, সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।



- জগৎশেষ** : তাহলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজি। দেখি নাচওয়ালিদের ঘুঙ্গুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।
 (ঘসেটি রাজবন্ধুভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)
- রাজবন্ধুভ** : ওস্তাদজির নামটা-
- আগন্তক** : রাইসুল জুহালা।
 (সকলের উচ্ছাসি)
- রায়দুর্ভ** : জাহেলদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?
 (আবার সকলের হাসি)
- উমিচাঁদ** : (সবৎ রঞ্জ) আমি তো বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরতন্ত্র দুধ খেয়েও গৌফ শকলো রাখেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাহা বনে যাই।
- ঘসেটি** : আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন, ওস্তাদজি।
- রাইসুল**
- জুহালা** : যায়সা হুরুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সমষ্টি ওয়াকিফহাল। আপাতত আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাব। পক্ষীকুলের একটি বিশেষ শ্রেণি, ধার্মিক হিসেবে যার জবরদস্ত নাম, সেই পাথির নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচিকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটি এবং রাজবন্ধুভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবন্ধুভও কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)
- রাজবন্ধুভ** : ওস্তাদজি জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?
 (উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এল)
- উমিচাঁদ** : উনি রাজি আছেন। উপর্যুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারখানা চিঠিপত্রের আদান-পদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।
- রাজবন্ধুভ** : তাহলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার যতো কাজে লাগানো হবে।
- রাইসুল জুহালা:** বহোত আচ্ছা, হস্তুর।
 (সবাইকে সালাম করে কালোয়াতি করতে করতে বেরিয়ে গেল)
- ঘসেটি** : তাহলে আবার নাচ শুরু হোক?
- রাজবন্ধুভ** : আমার মনে হয় নাচওয়ালিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেবে নেওয়াই ভালো।
- ঘসেটি** : তাই হোক।
 (ইঙ্গিত করতেই দলবলসহ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)
- রায়দুর্ভ** : বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।
- ঘসেটি** : আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।
- জগৎশেষ** : সিরাজউদ্দোলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিয়েছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কি পাব তা আমাকে পরিক্ষার করে বলুন।
- ঘসেটি** : শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।
- রায়দুর্ভ** : এটা কোনো কথা হলো না। যিনি নবাব হবেন-
- জগৎশেষ** : আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্ভুরাম।



- রায়দুর্লভ
জগৎশেষ**
- : বেশ, আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।
 - : সে আবার কী কথা?
 - : আপনারা তর্কের ভেতর যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপজ্জনক।
 - জগৎশেষ**
 - : কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলি বলছি। অঙ্গীকার করে লাভ নেই যে, শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। ভাস্যের গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।

**রায়দুর্লভ
জগৎশেষ**

 - : ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেন কুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।
 - : আমি তা বলছিনে। তা ছাড়া এখানে সে কথা অবাস্তর। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিন্দ হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

ঘসেটি

 - : ধনকুবের জগৎশেষকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কী করে?
 - : না, না, আমি নগদ টাকা চাইছিনে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেব, অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলিয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।

রায়দুর্লভ

 - : আমাকেও পদাধিকারের একটা একরানামা সই করে দিতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশ। ঘসেটি বেগমের হাতে পত্র দান)

ঘসেটি

 - : (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র। (পড়তে পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।

**রাজবল্লভ
উমিচাঁদ**

 - : বহোত খুব।
 - : আমার তো কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই, আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।

**ঘসেটি
উমিচাঁদ**

 - : আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখনি বলে ফেলুন।
 - : নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজেরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজউদ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখনি যদি আহাত হনতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।

**ঘসেটি
উমিচাঁদ**

 - : সিরাজের পতন কে না চায়?
 - : অন্ত আমরা চাই। কারণ সিরাজউদ্দৌলা নবাবিতে নির্বিন্দ হতে পারলে আমাদের সকলের স্বার্থই রাঙ্গাঞ্চল হবে।

**ঘসেটি
উমিচাঁদ**

 - : সিরাজ সম্বন্ধে উমিচাঁদের বড় বেশি আশঙ্কা।
 - : কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পুজারী। তা না হলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ।

(পকেট থেকে চিঠি বার করে ঘসেটি বেগমের হাতে দিল)

**ঘসেটি
উমিচাঁদ**

 - : (চিঠির নিচে স্বাক্ষর দেখে উল্লিখিত হয়ে) এ যে দ্রেক সাহেবের চিঠি!
 - : আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।
 - : (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তাহলে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যজাপ্ত হয়ে উঠবে।



- রাজবন্ধুত্ব** : আমাদের বক্তৃ সিপাহসালার মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সন্ধানহার করতে পারেন।
(হঠাতে বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচকিত। ঘসেটি বেগম কোলাহলের কারণ জানবার জন্যে যেতেই রাজবন্ধুত্ব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এল।)
- রাজবন্ধুত্ব** : আরম্ভ কর জলনি। (শুল্কের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় চুকলেন নবাব সিরাজউদ্দোলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ-বেগে দাঁড়ালো। নাচওয়ালিদের নাচ থেমে গেল।)
- ঘসেটি** : (ভীতিরুদ্ধ কর্ত্ত্ব) নবাব!
- সিরাজ** : কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড় ভারী জলসা বসিয়েছেন?
- ঘসেটি** : (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।
- সিরাজ** : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।
- ঘসেটি** : নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?
- সিরাজ** : নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা তো আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া শুরু করতে হতো।

(হঠাতে কষ্টস্বরে অবিচল তীব্রতা ঢেলে)

- রাজবন্ধুত্ব**, জগৎশেষ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিবিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙ্গে দিলাম। (ঘসেটি বেগমকে) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মার পক্ষে আসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।
- ঘসেটি** : (রোমে চিরকার করে) তুমি আমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছ? তোমার এতখানি স্পর্ধা?
- সিরাজ** : এতে দ্রুত হবার কি আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই আসাদে থাকবেন।
- ঘসেটি** : মতিবিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার আসাদে যাব? তোমার আসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)
- সিরাজ** : (অবিচলিত) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে যাব।
- ঘসেটি** : (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবন্ধুত্ব, জগৎশেষ, বিধবার ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?
- রাজবন্ধুত্ব** : (একটু ইতস্তত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই—
- সিরাজ** : (উত্তোলন প্রভৃতি প্রস্থানেদ্যত্ব) হ্যা, শুনুন রায়দুর্লভ, শক্তকর্তজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী মোষ্টগা করেছি। (রাজবন্ধুত্ব প্রভৃতি প্রস্থানেদ্যত্ব) তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরি থাকবেন। প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।
- রায়দুর্লভ** : হকুম, জাঁহাপনা। (তারা নিঞ্চান্ত হলো। ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।)
- সিরাজ** : মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে, খালাআম্মা। আপনার কোনো রকম অর্ঘ্যাদা হবে না।
- (বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)
- ঘসেটি** : তোমার ক্ষমতা ধৰ্স হবে, সিরাজ। নবাবি? নবাবি করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব-দেখব।

[দৃশ্যান্ত]



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ। স্থান : নবাবের দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্জে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— নকিব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, জগৎশেষ, রায়দুর্লভ,
উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী, ওয়াটস, মোহনলাল।]

(দরবারে উপস্থিত— মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেষ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি
ওয়াটস। মোহনলাল, মিরমর্দান, সাঁফ্রে অন্ত্রসজ্জিত বেগে দণ্ডয়মান। নকিবের কষ্টে দরবারে নবাবের আগমন
ঘোষিত হলো।)

নকিব : নবাব মনসুর-উল-মুলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খা মির্জা মুহম্মদ হায়বতজঙ্গ বাহাদুর।
বা-আদাব আগাহ বাশেদ।
(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব চুকলেন। সবাই নতশিরে শুদ্ধ
জানালো।)

সিরাজ : (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা
হয়েছে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ : বে-আদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরি বিষয়ের
মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন—

সিরাজ : গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি
হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মিরজাফর,
রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেষ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকবেন। আমার পথ
বিঘ্নসংকুল হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগভাজনদের কাছ থেকে আমি তাই
আশা করেছিলাম।

মিরজাফর : জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ
আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান
করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের
কাছে আমি বিচারপ্রাপ্তি।

জগৎশেষ : আপনার অপরাধ!

সিরাজ : পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজি? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে
প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল)

রায়দুর্লভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিঙ্কাশন)

সিরাজ : তরবারি কোমাবন্দ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বল শাসন।

উৎপীড়িত

ব্যক্তি : আমাকে শেষ করে দিয়েছে হজুর।

মিরজাফর : আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত

ব্যক্তি : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িয়ের জ্বালিয়ে দিয়েছে।



- সিরাজ** : (সিংহাসনের হাতলে শুধি মেরে) কেঁদোনা। শুকনো খট্খটে গলায় বলো আর কী হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিয়ের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।
- উৎপীড়িত**
- ব্যক্তি** : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়ির জ্বালিয়ে দিয়েছে। যগ্ন মঙ্গ পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে— ওহ হো হো (কান্না)— আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুজলেই— ওদের আর একজন আমার নথের ভেতরে খেজুরকাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হজুর। (কান্নায় ভেঙে পড়ল)
- সিরাজ** : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছে গিয়ে প্রবল কষ্টে) ওয়াটস!
- ওয়াটস** : (ভয়ে বিবর্ণ) ইওর এক্সিলেন্সি।
- সিরাজ** : আমার নিরীহ প্রজাটির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী?
- ওয়াটস** : হাউ ক্যান আই নো দ্যাট, ইওর এক্সিলেন্সি?
- সিরাজ** : তুমি কী করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌছায় না ভেবেছ? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।
- ওয়াটস** : আপনি আমায় অপমান করছেন ইওর এক্সিলেন্সি। দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি।
- সিরাজ** : তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছ? দুশ্চরিত্বতা এবং উচ্ছুলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ত দাও আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?
- ওয়াটস** : আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা ট্যাঙ্ক দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।
- সিরাজ** : ট্যাঙ্ক দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।
- (সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে)
- এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ দরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।
- মিরজাফর** : এ তো ডাকাতি।
- সিরাজ** : আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রয়াণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারি দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজি, বলুন রাজবন্ধু, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবৃদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশংস্য দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কি-না? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।
- (প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)
- রাজবন্ধু** : জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিপ্রতি পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।
- জগৎশেষ** : নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই—



- সিরাজ** : আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান, এই তো?
মিরজাফর : একথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে বড়বেঞ্জের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।
- সিরাজ** : বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কী রকম আচরণ করা বিধেয় তা-ও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। আপনি, জগৎশেষ, রাজবন্ধু, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ, কোনো দুর্বলতা নয়। শক্তির কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল!
- (মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)
- সিরাজ** : (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শাস্তিভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাস্ত্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।
- মিরজাফর** : আমাদের প্রতি নবাবের সন্দিক্ষ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকর্ষিত হয়ে উঠব।
- সিরাজ** : ওই একটি পথ সিপাহসালার-দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কি না?
- রাজবন্ধু**
- সিরাজ** : জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।
- সিরাজ** : আমার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিমগরের সঙ্গি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনী এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, হস্তক্ষেপ করবে।
- মিরজাফর**
- সিরাজ** : জাঁহাপনা, আমাদের হৃকুম করুন।
- সিরাজ** : আমি অন্তহীন সন্দেহ-বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি- আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্঵াস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।
- মিরজাফর**
- সিরাজ** : দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
- সিরাজ** : আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনো তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না।
- (সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরিফ দিল। সিরাজ দুহাতে সেটা নিয়ে চুম্ব খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মিরজাফর নতজানু হয়ে দুহাতে কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)
- মিরজাফর**
- সিরাজ** : আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
- (সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরিফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজলের পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবন্ধু, জগৎশেষ উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন।)
- রাজবন্ধু**
- সিরাজ** : আমি রাজবন্ধু, তামাতুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।
- রায়দুর্লভ**
- সিরাজ** : ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।



- উমিচাঁদ** : রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।
 (প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)
- সিরাজ** : (ওয়াটসকে) ওয়াটস।
ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি।
সিরাজ : আলিঙ্গরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুণ্ঠচরের কাজ করছ। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াটসকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেইমান নন্দকুমারকে ঘূষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই উদ্দ্বিত্তের শাস্তি তাদের যথাযোগ্য ভাবেই দেওয়া হবে।
- ওয়াটস** : ইওর এক্সিলেন্সি।
 (কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)
 [দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১৯এ মে। স্থান : মিরজাফরের আবাস।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— জগৎশেষ, মিরজাফর, রাজবংশত, রাইসুল, প্রহরী।]
 (মন্ত্রণাসভায় উপস্থিতি-মিরজাফর, রাজবংশত, রাজদুর্বল, জগৎশেষ)

- জগৎশেষ** : সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।
মিরজাফর : না শেঠজি, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিষ্ঠক হয়েছি অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষার আর অধিকারের লাভ টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘূণা আর বিদ্বের অসহ্য উভাপে। এবার আমি আঘাত হানবই।
- রাজবংশত** : শুধু অপমান! প্রাপের আশক্ষায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মতো সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।
- রায়দুর্লভ** : সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।
মিরজাফর : এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের শাস্তি দেবে না।
জগৎশেষ : তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দি করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে তো কথাই নেই।
- রাজবংশত** : আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিত হবার কিছুই নেই।
- জগৎশেষ** : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের ঘোফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে তো ছাড়ল না। তাকে কয়েদখানায় যেতে হলো। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।
- মিরজাফর** : আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘযুক্ত থাকবে না শেঠজি।



- রাজবন্ধুত্ব** : আমি ভাবছি তেমন দৃঢ়সময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা হলেও সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।
- জগৎশেষ** : ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাই তো ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মাসে মাসে অস্ত্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুক্ষণ থায়ের অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষ্টে হচ্ছে।
- মিরজাফর** : কাজেই আর কালঙ্কেগ নয়।
- রাজবন্ধুত্ব** : আমরা প্রস্তুত। কর্মপঞ্চা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।
- মিরজাফর** : আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলাসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।
- জগৎশেষ** : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।
- রায়দুর্গভ** : এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?
- (নেপথ্যে কঠিন)**
- নেপথ্য** : ওরে বাবা কতবার দেখতে হবে? দেউড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশব্দীর দেখিয়েছি। এই দেখ বাবা, আর একটিবার দেখ। হলো তো?
- (রাইসুল জুহালা কামরায় তুকল)
- কী গেরোরে বাবা।
- মিরজাফর** : কী হয়েছে?
- রাইস** : সালাম হজুর। ওই পাহারাওয়ালা হজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরি করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি, আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা-
- মিরজাফর** : (সন্তুষ্ট) নবাবের পাঞ্জা!
- রাইস** : আলবত হজুর। কেন নয়? (আবার কুর্নিশ করে) হজুরের নবাব হতে আর বাকি কি?
- মিরজাফর** : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক! খবর কি তাই বলো!
- রাইস** : প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দন সমেত—
- রাজবন্ধুত্ব** : (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছ রাইস মিয়া।
- রাইস** : (ক্ষুঢ়া) আবোল তাবোল কি হজুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রঞ্জে। তবু এই দেখুন (পকেট থেকে দ্বিখণ্ডিত মূলার নিয়াংশ বার করল)। একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়েই ঘূরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দুখও।
- জগৎশেষ** : এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?
- রাইস** : গেরো হজুর। কগালের গেরো। উমিচাঁদজির চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ভুঁর কামানের মতো গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো : আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়-তুঃ শুণ্ঠের? এমন এক অস্তুত উচ্চরণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুঢ়েচোর? চোর কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুঢ়েচোর? গামছা চোর, বদনা চোর,



জুতো চোর, গরু চোর, সিংখেল চোর, কাফল চোর আমাদের আপনাদের ভেতরে হজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসাব নেই। কিন্তু ঘুফুঁড়েচোর আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করেই হজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, -(মনু হাসি) একটু ইংরেজিও তো জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ। (হেসে উঠে) অহংকার করব না হজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটছে মূলোর মাথাটা।

- মিরজাফর** : কথা থামাবে রাইস মিয়া।
রাইস : হজুর।
মিরজাফর : এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?
রাইস : উমিচাঁদজির কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)
মিরজাফর : (পত্র পড়ে রাজবন্ধুর দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?
রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।
মিরজাফর : কারো নাম জানো না?
রাইস : সবতো বিদেশি নাম। এদেশি হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত- বেমোদত্তি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কলকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম: শাঁকচুলি, উলকামুর্দি, আঁষটেপেতি, কানি পিশাচী এই সব আর কি।
জগৎশেঠ : রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।
রাইস : রাত-বেরাতে চলাফেরা করি ভূত পেঁচীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হজুর। (চিঠিখানা রাজবন্ধু, জগৎশেঠ এবং রায়দুলভূতের হাত ঘুরে আবার মিরজাফরের হাতে এল)
মিরজাফর : একে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?
রাজবন্ধু : চিঠির জবাব দেবেন না?
মিরজাফর : চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো কে জানে কোথায় সিরাজের গুণ্ঠচর ওঁৎ পেতে বসে আছে।
জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের গুণ্ঠচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌছচ্ছে; কিন্তু একখালি করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের সোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।
রাইস : সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি মুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হজুর, গুণ্ঠচরাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।
জগৎশেঠ : কিছু মনে কোরো না। তোমার সমস্কে কোনো মন্তব্য করিনি।
মিরজাফর : তুমি তাহলে এখন এস। উমিচাঁদজিকে আমার এই সাংকেতিক মোহরটা দিও। তাহলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বোলো, দুইনম্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু সেখাপড়া হবে।
রাইস : হজুর। (সাংকেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)
মিরজাফর : রাইসুল জুহালা খুবই চালাক। সে উমিচাঁদের বিশ্বাসী লোক। ওর সামনে শেঠজির ওকথা বলা ঠিক হয়নি।
জগৎশেঠ : আমি শুধু বলেছি কি হতে পারে।
মিরজাফর : কত কিছুই হতে পারে শেঠজি। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মির মুসি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে। তাতেই তো ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবন্ধুর; কিন্তু ভাবুন তো কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মির মুসি।



- জগৎশেষ** : তা তো বটেই। গুণ্ঠরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।
- মিরজাফর** : অস্তিত্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কি-না?
- রাজবন্ধুভ** : তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোবে না। ওরা জানে সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।
- জগৎশেষ** : অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।
- রাজবন্ধুভ** : সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কি না তা তো বুবতে পারছিনে। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দুইকোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজউদ্দৌলার তহবিল থেকে কোনোক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে না।
- মিরজাফর** : আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবন্ধুভ। ও কথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দির আমলে, উদ্বৃত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মন্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা ঝুঁচ করে আমি বসতে পারতাম।

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন। স্থান : মিরনের আবাস।

[শিল্পীবৃন্দ : যথেষ্ট প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— নর্তকীগণ, বাদকগণ, মিরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেষ, রাজবন্ধুভ, মিরজাফর, ওয়াটস, ক্লাইভ, রঞ্জী, মোহনলাল।]

(ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন। পার্শ্বে উপবিষ্ট নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরত। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামন্ত মিরনের উল্লাসধনি।)

- মিরন** : সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।
 (নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মিরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিল মিরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত হলো মিরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্ট নর্তকী মিরনের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল।
 অল্প পরেই ছাঁবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)
- মিরন** : সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিন।

(নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)

- রায়দুর্লভ** : আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক বলেই ধরে নিয়েছেন।
- মিরন** : তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।
- রায়দুর্লভ** : দুদণ্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হতো। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্য থেকে জীবন বিস্তাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।



- মিরন : আমার এখানে না করে উপায় কী? মোহনলালের গুণ্ঠচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশশুল থাকতেই ভালোবাসি।
- রায়দুর্গভ : কে কে আসছেন এখানে?
- মিরন : প্রয়োজনীয় সবাই। তাছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি কেউ একজন।
- রায়দুর্গভ : কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?
- মিরন : তিনি আসবেন কাশিমবাজার থেকে।
- রায়দুর্গভ : সে যা হোক। আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কী কাজে নবাব তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না গেলে তখনি সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগেভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।
- মিরন : আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতল হলে আরো হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একেবারে নির্দিষ্ট।
- রায়দুর্গভ : আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চারিদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তাহলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?
- মিরন : (ঈষৎ বিশ্বিত) কী ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।
- রায়দুর্গভ : আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাত্ব হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

- পরিচারিকা : মেহমান।
- রায়দুর্গভ : আমি সরে পড়ি।
- মিরন : বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।
- রায়দুর্গভ : না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়। (প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মিরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। জগৎশেষ, রাজবল্লভ ও মিরজাফরের প্রবেশ। মিরন সমাদর করে তাদের বসাল।)

- মিরন : একটু আগে রায়দুর্গভ এসেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।
- জগৎশেষ : তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে হবে এই তো?
- রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে। তা না হলে রায়দুর্গভ মাসে মাসে আমার কাছ থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতেই তার স্বর্গ হাতে পাবার কথা।
- মিরজাফর : ও সব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবিই মানতে হবে। রায়দুর্গভ স্কুল শক্তিধর। তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসযাতকতার গুরুত্ব আছে বৈ কি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)



- পরিচারিকা** : জানানা সওয়ারি।
 (সবাই একটু বিশ্রত হয়ে পড়ল। মিরজাফর হঠাতে পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের
 করে তাতে মন দিলেন। মিরন লজিজত। হঠাতে আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)
- মিরন** : তাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।
 (পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)
- রাজবন্ধু** : (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এস। আত্মীয়রাই কেউ হবে হয়ত।
 (সুযোগটুকু পেয়ে মিরন তৎক্ষণাতে বেরিয়ে গেল। অভিবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশ্রেষ্ঠ
 নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)
- জগৎশ্রেষ্ঠ** : আজকের আলোচনায় উমিচান্দ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তো আর কোম্পানির সঙ্গে
 চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।
- মিরজাফর** : (হঠাতে যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেরেছেন) আরে বাপরে একেবারে কালকেউটে। তার
 দাবিই তো সকলের আগে। তা না হলে দশ না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌছে যাবে নবাবের
 দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে।
 (দুজন মহিলাসহ উল্লিখিত মিরন কামরায় চুকলো)
- মিরন** : এঁরাই জানানা সওয়ারি।
 (রমশীর ছন্দবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াট্স এবং ক্লাইভ। মিরন বেরিয়ে গেল)
- ওয়াট্স** : সরি টু ডিজাপয়েন্ট ইউ জেন্টেলমেন। আর ইউ সারপ্রাইজড?
 ইনি রবার্ট ক্লাইভ।
- মিরজাফর** : (সসম্পর্মে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?
- ক্লাইভ** : আর ইউ সারপ্রাইজড? অবাক হলেন?
- মিরজাফর** : অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।
- ক্লাইভ** : বিপদ? কার বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?
- মিরজাফর** : দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।
- ক্লাইভ** : আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?
- জগৎশ্রেষ্ঠ** : নবাবের শুশ্রেষ্ঠের হাতে তো পড়নি?
- ক্লাইভ** : নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।
- রাজবন্ধু** : কেন পারবে না! গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা
 এসেছ। তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি হলো-বেড়ালের মতো পানাপুরুরে দুচারটে চুবুনি দিতে
 বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?
- ক্লাইভ** : আই ডু নট আভারস্ট্যাভ ইওর হলো বিজনেস, বাট আই অ্যাম শিওর নবাব ক্যান কজ নো
 হার্ম টু আস।
- জগৎশ্রেষ্ঠ** : ভগবানের দিবি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা যাব
 খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয় এরি ভেতরে—
- ক্লাইভ** : দেখো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুক্ত
 হয়নি। যখন হবে তখন তোমরাই তার ফল দেখবে।



- রাজবল্লভ** : সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?
- ক্লাইভ** : এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসযাতক, যার খাজানি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আপনারা ইচ্ছ করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।
- রাজবল্লভ** : আমরা?
- ক্লাইভ** : হোয়াই নট? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-
- মিরজাফর** : এইসব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?
- ক্লাইভ** : সরি, মিস্টার জাফর আলি খান। হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ-যুগের সেরা বিশ্বাসযাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে! কলকাতা অ্যাটাক-এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা কমপেনসেট করতে চেয়েছেন। স্কাউন্টেলটা আবার এক নতুন অফাৰ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।
- মিরজাফর** : আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।
- ক্লাইভ** : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশন আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেবো না। কেন দেবো? হোয়াই? থার্টি লাক্স অফ রুপিস ইজ নো জোক।
- রাজবল্লভ** : কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু বড়্যব্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুণ্ঠ খবর তার জানা।
- ক্লাইভ** : ডেন্ট ওরি, রাজা! উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। বাট ক্লাইভ ইজ নো লেস। আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।
- মিরজাফর** : কী রকম?
- ক্লাইভ** : দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।
- রাজবল্লভ** : কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?
- ক্লাইভ** : আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকি থাকবে না যে, আপনারাই তা জানিয়েছেন।
- জগৎশেষ** : আমাদের সমক্ষে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।
- মিরজাফর** : দলিল সই করবে কে?
- ক্লাইভ** : কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেষ থাকবেন টাইটনেস। নকল দলিলটায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।
- মিরজাফর** : উমিচাঁদ মানবে কেন তাহলে?
- ক্লাইভ** : সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
- জগৎশেষ** : তাহলে আর দেরি কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।
- ক্লাইভ** : অফকোরস। দলিল দুটোই তৈরি আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।
- (দলিলের কপি মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)
- মিরজাফর** : একটু পড়ে দেখব না?
- ক্লাইভ** : ড্রাফ্ট তো আগেই পড়েছেন।



- রাজবন্ধুভ** : তাহলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।
- ক্লাইভ** : ইফ ইউ ওয়ান্ট গো অ্যাহেড। পড়ে দেখুন উমিঁদের মতো আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কি-না। (দলিলটা রাজবন্ধুভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ুন।
- রাজবন্ধুভ** : (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সন্তুষ্ণ লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবেন—
- মিরজাফর** : এগুলো দেখে আর লাভ কি?
- রাজবন্ধুভ** : এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।
- মিরজাফর** : বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।
- রাজবন্ধুভ** : এই দলিল অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানি।
- ক্লাইভ** : (বিরক্ত) ইউ আর থিথকিং লাইক এ ফুল। আমরা কেন রাজ্য চালাব। আমরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করবার প্রিভিলেজটুকু সিকিউরড করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।
- জগৎশেষ** : আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায়, আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়।
- ক্লাইভ** : (রীতিমতো ঝুঁক্দি) দেন হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু অ্যাবাউট ইট? দলিল দুটো তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে।
- মিরজাফর** : না না, সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানারকম শুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোনদিন সিরাজউদ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন, আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অথবা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
- (রাজবন্ধুভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্তত করে—)
- মিরজাফর** : বুকের তেতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও ঘরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজি? আমি যেন শুনলাম।
- ক্লাইভ** : (উচ্ছাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি, অথচ সো কাউয়ার্ড।
- রাজবন্ধুভ** : নানা প্রকারের দুর্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।
- মিরজাফর** : তাই হয়ত।
- (কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে শিয়ে আবার ইতস্তত করল)
- মিরজাফর** : কিন্তু রাজবন্ধুভ যেমন বললেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?
- ক্লাইভ** : শুভ হোয়াট ননসেস। আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে সত্যি। (মিরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব? আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই। ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যাভ নট দ্যা কান্ট্রি, দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।



- মিরজাফর :** আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।
 (দলিলে সই করল। নেপথ্যে কর্মণ সংগীত চলতে থাকবে। জগৎশেষ এবং রাজবঞ্চিতও
 সই করল।)
- ক্লাইভ :** দ্যাটস অল রাইট। (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস
 হবে। ইট হ্যাত ডান এ প্রেট থিৎ- এ প্রেট থিৎ। (ক্লাইভ এবং ওয়াটস আবার নারীর ছন্দবেশ
 নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেল। অন্যদিক দিয়ে মিরনের প্রবেশ।)
- মিরন :** হা হা হা। আর দেরি নেই।
 (হাততালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ) আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কী হবে?
 আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন। শাহজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব।
 (দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)
- রক্ষী :** ভজুর, সেনাপতি মোহনলাল।
- মিরন :** (আতঙ্কিত) মোহনলাল!
- (মোহনলালের প্রবেশ)
- মোহনলাল :** শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ
 নিতে এলাম।
- মিরন :** সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দৃঢ়সাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে
 আপনি প্রবেশ করেছেন?
- মোহনলাল :** প্রয়োজন মতো যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত
 ঘড়িযন্ত্র হচ্ছিল কি না?
- মিরন :** মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে
 আবাবার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল। নবাব তাঁকে বিশ্বাস করে সৈন্য
 পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ঘড়িযন্ত্রের অপবাদ
 নিয়ে। আমি এখুনি আবাবাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাব। (উঠে দাঁড়াল) এই অপমানের
 বিচার হওয়া দরকার।
- মোহনলাল :** প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না।
 সত্য বলুন, কী হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণাসভায়?
- মিরন :** মন্ত্রণাসভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিলে। ওসব বাজে
 জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বত্বাব নয়। (পরিচারিকাকে ডেকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করল)
 যখন না-ছোড় হয়েছেন তখন বেআদবি না করে আর উপায় কি?
- (নর্তকীর প্রবেশ)
- এখানে কী হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন?
 (একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেল।
 মোহনলাল তরবারির অঞ্চলগাঁ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয়
 আঘাতে শূন্যেই তা দিখিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)
- মিরন :** মৃত্যুমান বেরসিক হা হা হা ...

[দৃশ্যান্তর]



ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ

ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ

ସମୟ : ୧୯୫୭ ସାଲ, ୧୦ଇ ଜୁନ ଥିକେ ୨୧ଏ ଜୁନର ମଧ୍ୟେ ଯେକୋନୋ ଏକଦିନ । ସ୍ଥାନ : ଲୁଣ୍ଠନିସାର କକ୍ଷ ।

[ଶିଳ୍ପୀବୃଦ୍ଧ : ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶେର ପର୍ଯ୍ୟାଯ ଅନୁସାରେ—ଘସେଟି, ଲୁଣ୍ଠନ, ଆମିନା, ସିରାଜ, ପରିଚାରିକା]

(ନବାବ-ଜନନୀ ଆମିନା ବେଗମ ଓ ଲୁଣ୍ଠନିସା ଉପବିଷ୍ଟା । ଘସେଟି ବେଗମେର ପ୍ରବେଶ)

ଘସେଟି

: ବଡ଼ ସୁଖେ ଆହୁ ରାଜମାତା ଆମିନା ବେଗମ ।

ଲୁଣ୍ଠନ

: ଆସୁନ ଖାଲାଆମ୍ବା ।

(ସାଲାମ କରିଲ)

ଘସେଟି

: ବେଚେ ଥାକ । ସୁର୍ଖୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେ ଏମନ ଦୋଯା କରଲେ ସେଟା ଆମାର ପକ୍ଷେ ଅଭିଶାପ ହେଁ ଦାଁଡାବେ । ତାଇ ମେ ଦୋଯା କରତେ ପାରନ୍ତମ ନା ।

ଆମିନା

: ଛିଃ ବଡ଼ ଆପା । ଏସ, କାହେ ଏସେ ବସ ।

ଘସେଟି

: ବସତେ ଆସିନି । ଦେଖିତେ ଏଲାମ କତ ସୁଖେ ଆହୁ ତୁମି । ପୁତ୍ର ନବାବ, ପୁତ୍ରବଧୁ ନବାବ ବେଗମ, ପୌତ୍ରୀ ଶାହଜାଦି—

ଆମିନା

: ସିରାଜ ତୋମାରଙ୍ଗ ତୋ ପୁତ୍ର । ତୁମିଓ ତୋ କୋଲେ-ପିଠେ କରେ ମାନୁଷ କରଇଛ ।

ଘସେଟି

: ଅନୁଷ୍ଟର ପରିହାସ-ତାଇ ଭୁଲ କରେଛିଲାମ । ଯଦି ଜାନତାମ ବଡ଼ ହେଁ ମେ ଏକଦିନ ଆମାର ସୌଭାଗ୍ୟେର ଅନ୍ତରାୟ ହେଁ, ଯଦି ଜାନତାମ ଅହରହ ମେ ଆମାର ଦୁଷ୍ଟିକାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଁ ଦାଁଡାବେ, ଜୀବନେର ସମସ୍ତ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ମେ ପ୍ରାସ କରିବେ ରାହୁର ମତୋ, ତାଙ୍କେ ଦୁର୍ଧିର ଶିଶୁ ସିରାଜକେ ପ୍ରାସାଦ-ଚତୁରେ ଆହୁଡ଼େ ମେରେ ଫେଲିତେ କିଛିମାତ୍ର ଧିଧା କରତାମ ନା ।

ଲୁଣ୍ଠନ

: ଆପନାକେ ଆମରା ମାୟେର ମତୋ ଭାଲୋବାସି । ମାୟେର ମତୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ।

ଘସେଟି

: ଥାକ! ଯେ ମନ୍ତ୍ୟକାର ମା ତାର ମହଲେଇ ତୋ ଢାଂଦେର ହାଟ ବସିଯେଇ । ଆମାକେ ଆବାର ପରିହାସ କରା କେନ? ଦରିଦ୍ର ନାରୀ ଆମି । ନିଜେର ସାମାନ୍ୟ ବିଭେର ଅଧିକାରିଗୀ ହେଁ ଏକ କୋଣେ ପଡ଼େ ଥାକତେ ଚେଯେଛିଲାମ । କିନ୍ତୁ ମହାପରାକ୍ରମଶାଲୀ ନବାବ ମେ ଅଧିକାର୍ଟୁକୁ ଓ ଆମାକେ ଦିଲେନ ନା ।

ଆମିନା

: କି ହେଁବେ ତୋମାର? ପୁତ୍ରବଧୁର ସାମନେ ଏରକମ ଝାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରଇ କେନ?

ଘସେଟି

: କେ ପୁତ୍ର ଆର କେ ପୁତ୍ରବଧୁ? ସିରାଜ ଆମାର କେଉ ନା । ସିରାଜ ବାଂଲାର ନବାବ-ଆମି ତାର ପ୍ରଜା । କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରେ ଉନ୍ମୟ ନା ହେଁ ଆମାର ସମ୍ପଦିତେ ହଞ୍ଚିପ କରତେ ମେ ସାହସ କରତ ନା । ମତିବିଲ ଥେକେ ଆମାକେ ମେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିତେ ପାରତ ନା ।

ଲୁଣ୍ଠନ

: ଶୁଣେଇ ଆପନାର କାହୁ ଥେକେ କିଛି ଟାକା ତିନି ଧାର ନିଯେହେଲ । କଲକାତା ଅଭିଯାନେର ସମୟେ ଟାକାର ପ୍ରୋଜେନ ହେଁଛିଲ ତାଇ । କିନ୍ତୁ ଗୋଲମାଲ ମିଟେ ଗେଲେ ମେ ଟାକା ତୋ ଆବାର ଆପନି ଫେରତ ପାବେନ ।

ଘସେଟି

: ନବାବ ଟାକା ଫେରତ ଦେବେନ!

ଲୁଣ୍ଠନ

: କେନ ଦେବେନ ନା? ତା ଛାଡ଼ା ମେ ଟାକା ତୋ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୋଜେନେ ବ୍ୟୟ କରେନନି । ଦେଶେର ଜନ୍ୟେ-

ଘସେଟି

: ଥାମ । ଲୟା ଲୟା ବକ୍ତ୍ଵା କୋରୋ ନା । ସିରାଜେର ବକ୍ତ୍ଵା ତବୁ ସହ୍ୟ ହେଁ । ତାକେ ବୁକେ-ପିଠେ କରେ ମାନୁଷ କରେଛ । କିନ୍ତୁ ତୋମାର ମୁଖେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଲି ଶୁଲ୍ଲେ ଗାୟେ ଯେନ ଜ୍ଵାଳା ଧରେ ଯାଇ ।

ଆମିନା

: ସିରାଜ ତୋମାର କୋଣେ କ୍ଷତି କରେନି ବଡ଼ ଆପା ।

ଘସେଟି

: ତାର ନବାବ ହେଁବାଟାଇ ତୋ ଆମାର ମନ୍ତ୍ର କ୍ଷତି ।

ଆମିନା

: ନବାବି ମେ କାରୋ କାହୁ ଥେକେ କେଡ଼େ ନେଇନି । ଭୂତପୂର୍ବ ନବାବଇ ତାକେ ସିଂହାସନ ଦିଯେ ଗେଛେନ ।

ଘସେଟି

: ବୃଦ୍ଧ ନବାବକେ ଛଲନାୟ ଭୁଲିଯେ ତୋମରା ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରେଛ ।



- আমিনা : আমরা।
- স্বসেটি : তারছো যে বিশ্বিত হবার ভঙ্গি করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব—কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিলী নও।
- আমিনা : তুমি অনর্থক বিষ উদ্ধার করছ বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।
- স্বসেটি : বুঝবে। সে দিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না।
- (সিরাজের প্রবেশ)
- সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবি করেনি খালাআম্মা।
- স্বসেটি : এসেছ শয়তান। ধাওয়া করেছ আমার পিছু?
- সিরাজ : আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।
- স্বসেটি : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।
- সিরাজ : আমার প্রয়োজন আপনার সম্পত্তির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।
- স্বসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছ যে, তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।
- সিরাজ : খবর আগনার অজানা থাকার কথা নয়।
- স্বসেটি : অর্থাৎ?
- সিরাজ : অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে, সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রমণের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্নাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে আমাকে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।
- স্বসেটি : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?
- সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।
- স্বসেটি : তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।
- সিরাজ : আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকৃষ্টিত হবেন না খালাআম্মা। আগনার নিজের সম্পত্তি আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শক্রদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।
- স্বসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারছি না।
- সিরাজ : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।
- স্বসেটি : (ক্ষিণ্ণ) ওর অর্থ আমি বুঝি মহাআন্য নবাব। (দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) শুনলে তো রাজমাতা, আমাকে বন্দিনী করে রাখা হলো। এইবার বল তো আমি তার মা, সে আমার পুত্র—তাই না? হা হা হা।
- (অসহায় ক্ষোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)
- আমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা—
(বেরিয়ে গেলেন)
- লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমান বোধ করেছেন। ঊঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি।



- সিরাজ** : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।
- লুৎফা** : ও কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।
- সিরাজ** : তুমিও এঙ্গ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাব বল তো লুৎফা। দেখতে পাচ্ছ না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধৰংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।
- লুৎফা** : কিন্তু খালাআম্বা—
- সিরাজ** : আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্বা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।
- লুৎফা** : অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু—
- সিরাজ** : থামলে কেন? বল।
- লুৎফা** : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।
- সিরাজ** : বল।
- লুৎফা** : বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।
- সিরাজ** : লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। কর, আমি আপত্তি করব না। দাদু মরবার পর থেকে এই ক-মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবে না।
- লুৎফা** : জাঁহাপনা।
- সিরাজ** : মনে পড়ে লুৎফা, দাদুর মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি। তুমিও জান লুৎফা আমি তা করিনি।
- লুৎফা** : আমি ও-সব কোনো কথাই তুলছিনে জাঁহাপনা।
- সিরাজ** : আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার কর।
- লুৎফা** : আমি আপনার বিরক্তে অভিযোগ আনবার জন্যে কোনো কথা বলিনি, জাঁহাপনা। খালাআম্বা রাণে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই—
- সিরাজ** : তাই তোমার মনে হলো ওঁর টাকা-পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তুমি জান না, কতখানি, উৎসাহ নিয়ে উনি অজন্ম অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবির জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শঙ্কদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।
- লুৎফা** : আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে।
- সিরাজ** : লুৎফা, এত দেয়াল কেন বল তো?
- লুৎফা** : দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?
- সিরাজ** : আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজির, আমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্বা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।
- লুৎফা** : জাঁহাপনা!
- সিরাজ** : আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেঙে ফেলছি, কিন্তু তবু তো দেয়ালের শেষ হচ্ছে না, লুৎফা।
- লুৎফা** : আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।
- সিরাজ** : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিষ্ঠেজ হয়ে পড়েছে লুৎফা।

- লুৎফা : সমস্ত দুষ্পিত্ব বাদ দিয়ে আমার কাছে দুইএকদিন বিশ্রাম করুন।
- সিরাজ : কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাব তার ঠিক নেই। আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।
- লুৎফা : সে কি!
- সিরাজ : আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পূর্ণ। আমি এগিয়ে গিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।
- লুৎফা : ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল।
- সিরাজ : হ্যাঁ, আলিঙ্গনের সঙ্গি। কিন্তু সে সঙ্গির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।
- লুৎফা : কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্শ কী করে সম্ভব?
- সিরাজ : ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা। শুধু একটা জিনিস বুবো উঠতে পারিনি, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কী করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?
- লুৎফা : কোনো প্রতিকার করতে পারেননি জাঁহাপনা?
- সিরাজ : পারিনি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তরসা পাইনি। রাজবংশ, জগৎশেষকে কয়েদ করলে, মিরজাফরকে ফাঁসি দিলে হয়ত প্রতিকার হতো, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কিনা কে জানে?
- লুৎফা : থাক ওসব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।
- সিরাজ : আর কাল সকালেই দেশের পথে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েকশ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্বাম রাসলীলার কাহিনি।
- লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোনো অভাব নেই।
- সিরাজ : ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি তো জানোই, মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।
- লুৎফা : সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।
- সিরাজ : অনেক সময়ে সত্যিই তা ভেবেছি, লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বছদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট সাজানো সংস্কার আমরা পেতাম।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

- পরিচারিকা : বেগম সাহেবা।
- লুৎফা : (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন। যাও।
- পরিচারিকা : সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে। (পেছোতে লাগল)
- লুৎফা : না।
- (সিরাজ এগিয়ে আসতে আসতে) মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতেই দাও, লুৎফা।
- (লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)
- লুৎফা : (আবেগজড়িত কষ্টে) না।
(সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্লেহসিঞ্চ হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে—দুইফোটা অঙ্ক গড়িয়ে পড়ল ওর দুইগাল বেয়ে)

[দৃশ্যান্তর]



দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২২এ জুন। স্থান : পলাশিতে সিরাজের শিবির

[শিল্পীবৃন্দ : মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে—সিরাজ, মোহনলাল, মিরমর্দান, প্রহরী, বন্দি কমর]

(গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগতভাবে পায়চারি করছেন।

দূর থেকে শৃঙ্গালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)

সিরাজ : দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো। শুধু ঘূম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারি) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই—

(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সিরাজ : সত্য অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি। তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্বোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অন্ত ধরছে। আশ্চর্য!

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : হ্যাঁ, বলো মোহনলাল, কী খবর।

মোহনলাল : ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অন্ত চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চশটার বেশি।

সিরাজ : এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কি না।

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ তো? মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ ঝা নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রযুক্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

মোহনলাল : সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে।

(নবাবের হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন)

সিরাজ : বেইমান।

মোহনলাল : ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালারের জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ : সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা।

(মিরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল)

সিরাজ : বল মিরমর্দান।

মিরমর্দান : ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাণে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?



- মিরমর্দান :** (একটা প্রকাণ নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব শুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে। ছাউনির সামনে মোহনলাল, সাঁক্ষে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই টিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বন্দিআলি খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশের গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী। বাঁ দিক দিয়ে লক্ষ্যবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার, রায়দুর্গভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।
- সিরাজ :** (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন) কত বড় শক্তি, তবু কত তুচ্ছ মিরমর্দান।
- মিরমর্দান :** জাঁহাপনা!
- সিরাজ :** আমি কী দেখছি জান? কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধের পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।
- মিরমর্দান :** ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁক্ষে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।
- সিরাজ :** ঠিক তা নয়, মিরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে, এস তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।
- মোহনলাল :** জাঁহাপনা!
- সিরাজ :** মিরজাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষ্যবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যদে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দুর্দম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে ঘিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।
- মিরমর্দান :** কিন্তু আমরা হারব কেন?
- সিরাজ :** না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই শুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাক, শিবিরের কাছে ওদের কোজ রাখবার কথা আমরাও ভাবি না। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকলে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না।
- মোহনলাল :** ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়—
- সিরাজ :** এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করত।
- মিরমর্দান :** এত চিন্তিত হবার কারণ নেই, জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।
- সিরাজ :** আমি জানি, তাই আরও বেশি ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।
- মোহনলাল :** আমরা জয়ী হব, জাঁহাপনা!
- সিরাজ :** পরাজিত হবে, আমিই কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবাবের মতো খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হৃকুম দেবে মিরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত সিপাহসালারকে দিতেই হবে। ফল কি হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিলে, কিন্তু কেন যে পারছিলে আশা করি তোমরা বুবাছ।
- মিরমর্দান :** জাঁহাপনা!
- সিরাজ :** আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয়, মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা যুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্গ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।

(কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দূজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)



- প্রহরী** : হজুর, এই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল।
 (সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল। নবাব দুপা এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশে দাঁড়াল)
- বন্দি** : (সকাতর ঝন্দনে) আমি পলাশি গ্রামের লোক, হজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।
- মোহনলাল** : (প্রহরীকে) তল্লাশি কর।
 (প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না)
- কিষ্টি** একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না, জাঁহাপনা।
- মিরমর্দান** : (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় কর। (হঠাতে) দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মিরজাফরের শুঙ্গচর উমর বেগের ভাই। এও শুঙ্গচর।
- কমর** : (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।
- সিরাজ** : (কাছে এগিয়ে এসে) কি হয়েছে তোমার?
- কমর** : আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হৃকুমে খুন করা হয়েছে, হজুর।
- সিরাজ** : মোহনলাল!
- মোহনলাল** : শুঙ্গচর উমর বেগ জমাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।
 (সিরাজ অবিশ্বাসের দ্রষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দ্রষ্টে চেয়ে রইলেন)
- মোহনলাল** : (যেন দোষ ঢাকবার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।
- সিরাজ** : (মোহনলালের দিক থেকে দ্রষ্ট ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিত ভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কি না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই, মোহনলাল।
- কমর** : জাঁহাপনা মেহেরবান।
- সিরাজ** : (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।
- কমর** : (রূদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?
- সিরাজ** : আমি জানি, এখানে এ অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও। (কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।
 (বন্দিকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান। শৃগালের প্রহর ঘোষণা)
- সিরাজ** : তোমরাও এখন যেতে পার। আজ রাতে তোমাদের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।
 (মোহনলাল ও মিরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন। সোরাহি থেকে পানি ঢেলে থেলেন। কোথায় একটা পঁচাচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন। কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরিফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরিফ তুলে ওঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এল। সিরাজ কোরান শরিফ মুড়ে রাখলেন। ‘আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম’-এর পর মোনাজাত করলেন। আস্তে আস্তে পাথির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাত সুতীব্র ত্যন্দাদ স্তরুতা ভেঙ্গে খান খান করে দিল।)



তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৩এ জুন। স্থান : পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র

[শিল্পীবৃন্দ : মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁক্রে,
মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ]

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ, কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে আঘিরভাবে পায়চারি করছেন। সৈনিকের প্রবেশ)

সিরাজ : (উৎকর্ষিত) কী খবর সৈনিক?

সৈনিক : যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে।
সিপাহসালার, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

সিরাজ : মিরমর্দান, মোহনলাল?

সৈনিক : ওরা শক্রদের পিছু হাটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আচ্ছা, যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

দ্বিতীয় সৈনিক : দুষ্টসংবাদ, জঁহাপনা। সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন।

সিরাজ : (কঠোর স্বরে) যাও।

(প্রস্থান। একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

তৃতীয় সৈনিক : কিছুক্ষণ আগে যে বৃষ্টি হলো তাতে ভিজে আমাদের বারুদ অকেজো হয়েছে, জঁহাপনা।

সিরাজ : (ভীত স্বরে) বারুদ ভিজে গেছে?

তৃতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়াবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে
যাচ্ছেন।

সিরাজ : আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

তৃতীয় সৈনিক : শক্রদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মিরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে
এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ।)

প্রথম সৈনিক : সেনাপতি বদ্বিআলি খা নিহত, জঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ।

সিরাজ : না! যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্বিআলি ঘায়েল হলে। মিরমর্দান, মোহনলাল আছে।
কোনো ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্ত চিৎকারে পরিণত হলো।)

সিরাজ : কি হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা।)

(ফরাসি সেনাপতি সাঁক্রের প্রবেশ।)

সিরাজ : (দ্রুত এগিয়ে এসে) কি খবর সাঁক্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?

সাঁক্রে : (কুর্নিশ করে) এখনো হয়নি, ইওর একসেলেপি। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।

সিরাজ : শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হার হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও, সাঁক্রে।
জয়লাভ কর।



সাঁফ্রে : আমি তো ফ্রান্সের শক্রদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চূপ করে দাঁড়িয়ে আছে—স্ট্যান্ডিং লাইক পিলার্স।

সিরাজ : মিরজাফর, রায়দুর্গকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে। আমি জানি তোমরা জিতবেই।

সাঁফ্রে : আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিছিল। এমন সময়ে এল বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলি খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে টায়ার্ড সোলজারস যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করেছে। মিরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। অ্যান্ড দ্যাট ইং ডেনজারাস।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল।)

সিরাজ : কী সংবাদ?

(কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)

সিরাজ : (অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাকুনি দিয়ে) কী খবর, বল কী খবর?

দ্বিতীয় সৈনিক: সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে, জাহাপনা।

সাঁফ্রে : হোয়াট? মিরমর্দান কিলড?

সিরাজ : (যেন আচম্ভ) মিরমর্দান শহিদ হয়েছেন?

সাঁফ্রে : দি ব্রেভেস্ট সোলজার ইং ডেড।

আমি যাই, ইওর একসেলেন্সি। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে।

(প্রস্থান)

সিরাজ : ঠিক বলেছ সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। এখন তাহলে কি করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল—

দ্বিতীয় সৈনিক: সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে, জাহাপনা?

সিরাজ : মোহনলাল? না। নৌবে সিং, বদ্রিআলি, মিরমর্দান সবাই নিহত। এখন কী করতে হবে। (পায়চারি করতে করতে হঠাত) হ্যাঁ, আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমই তো ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় শুটিগুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে উদ্দেশ করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এস। আমি যুদ্ধে যাব। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল : না, জাহাপনা।

(সৈনিক বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : মোহনলাল!

মোহনলাল : পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জাহাপনা। এখন আর আত্মাভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।

সিরাজ : মিরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ত চাইব না?



- মোহনলাল :** মিরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জ়াহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।
- সিরাজ :** আমি একাই ফিরে যাব?
- মোহনলাল :** আমার শেষ যুক্ত পলাশিতেই। আমি যাই, জ়াহাপনা। সাঁক্ষে আর আমার যুক্ত এখনো শেষ হয়নি।
(নতুন হয়ে নবাবের পদস্পর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল)
- সিরাজ :** (আত্মগতভাবে) যাও, মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রইল না। শুধু আমি রহিলাম-নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল।
(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)
- সৈনিক :** দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত, জ়াহাপনা। আপনার হাতিও তৈরি।
- সিরাজ :** চল।
(যেতে যেতে কী যেন মনে করে দাঁড়ালেন)
- সিরাজ :** কে আছে এখানে?
(জনেক প্রহরীর প্রবেশ)
- সিরাজ :** সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও। কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মিরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপর্যুক্ত মর্যাদায় মিরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।
(বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। রাইসুল জুহালার প্রবেশ)
- রাইস :** জ়াহাপনা তাহলে চলে গেছেন? রক্ষা।
- প্রহরী :** আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।
- রাইস :** তার বোধহয় সময় হবে না। মিরজাফর-ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।
(বাইরে তুমুল কোলাহল)
- প্রহরী :** তা হলে আর দেরি নয়, চল সরে পড়া যাক।
(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশন্ত সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হলো। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এল ক্লাইভ, মিরজাফর, রাজবন্ধু, রায়দুর্লভ।)
- ক্লাইভ :** হি হ্যাজ ফ্রেড অ্যাওয়ে, আগেই পালিয়েছে। (বন্দিদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব?
(বন্দিরা নিরক্ষণ)
- ক্লাইভ :** (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? সে কুইকলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ। বাঁচতে হলে জলদি করে বল।
- রাইস :** (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হজুর?
- রাজবন্ধু :** যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?
- ক্লাইভ :** নো টাইম ফর ফান, কাম অন সে, হোয়ার ইজ সিরাজ?
(আবার লাথি মারল)
- রাইস :** নবাব সিরাজউদ্দোলা এখনো জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।
- রাজবন্ধু :** চিনেছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।
- ক্লাইভ :** হি মাস্ট বি এ স্পাই।
(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেলল)



- মিরজাফর** : নারান সিং। সিরাজউদ্দেলোর প্রধান গুপ্তচর।
- ক্লাইভ** : গুলি কর ওকে- হিয়ার অ্যান্ড নাউ।
(দুজন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগল।)
- ক্লাইভ** : (মিরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্ট করুন। বিশ্রাম করা চলবে না।
সিরাজউদ্দেলো যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।
(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজন নারান সিংকে গুলি করল। মিরজাফর, রাজবঢ়ান্ত, রায়দুর্গ, নিদারুণ শক্তি। ক্লাইভ অবিচল। গুলিবিন্দ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কঢ়ে বললো)
- ক্লাইভ** : গুপ্তচরকে এইভাবেই সাজা দিতে হয়।
- নারান** : (মৃত্যুস্তিমিত কঢ়ে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইয়ানির চেয়ে খারাপ? মোনাফেকির চেয়ে খারাপ? কিমিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু তয় নেই; সিরাজউদ্দেলো বেঁচে আছে।
- ক্লাইভ** : (গোরা সৈন্য দুটিকে) হাউ ডু ইউ কিল? ইডিয়টস। যখন মারবে শুট স্ট্রেইট ইন্টু হার্ট, এমন করে মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে।
- (পিণ্ডল বার করল)
- নারান** : তগবান সিরাজউদ্দেলোকে রক্ষা-
(ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো।)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৫এ জুন। স্থান : মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : যথেও প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, জনেক ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তা বাহক, জনতা ও লুৎফা।]

(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। স্তমিত আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

- সিরাজ** : পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে-কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু-
- ব্যক্তি** : প্রাণের ভয়ে কে না পালায় ছজ্জুর?
- সিরাজ** : আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি? (জনতা নীরব)
- সিরাজ** : না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাইনি। সেনাপ্তিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখিবার শেষ চেষ্টা করব বলে।
- ব্যক্তি** : কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা।



- সিরাজ** : আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনো আশা আছে। এখনো আমরা একত্রে রংখে দাঁড়াতে পারলে শক্ত মুশিদাবাদে ঢুকতে পারবে না।
- ব্যক্তি** : তা কী করে হবে হজুব? অত বড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।
- সিরাজ** : তারা যুদ্ধ করেনি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেব না।
- ব্যক্তি** : পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, জাহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুটত্বাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।
- সিরাজ** : আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শক্তসৈন্যদের হাতে পড়ার আগেই সাধারণ চোর-ভাকাত ওদের সর্বশ কেড়ে নেবে।
- ব্যক্তি** : কেউ শোনে না, হজুব। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।
- সিরাজ** : কোথায় পালাবে? পেছন থেকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বারবার করে বলছি। ঝাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুণ্ঠ হয়ে যাবে।
- ব্যক্তি** : জাহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয়-ব্যবস্থা।
- সিরাজ** : দু-এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য সহায় আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কী প্রয়োজন।
- সৈনিক** : ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাহাপনা। আমার অধীনে ২০০ সিপাই। আমরা হজুরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রস্তুত।
- সিরাজ** : বেশ, খাজানির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন। মুশিদাবাদে এই মুহূর্তে অস্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শক্তির মোকাবিলা করতে পারব।
- অপর সৈনিক :** আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিক হারে কাজ করি। আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাহাপনার হৃকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরেই খাড়া করতে পারি।
- সিরাজ** : এখনি চলে যান। খাজানির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন যত দরকার।
- (বার্তাবাহকের প্রবেশ)
- বার্তাবাহক** : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, জাহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এই মাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।
- সিরাজ** : (বিস্ময়ের বিমৃঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন! সিরাজউদ্দোলার শুশুর ইরিচ খাঁ?
- বার্তাবাহক** : জাহাপনা!
- সিরাজ** : আচর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।



- ব্যক্তি** : তাহলে আর আশা কোথায়?
সিরাজ : তাহলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

- দ্বিতীয় বার্তা** : জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।
সিরাজ : তাহলেও আশা! ভীরুৎ প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের ঘনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমার্দীন, মোহনলাল, বদ্বিআলি, নৌবে সিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শক্রের অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর যর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থাঙ্ক প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।

(জনতা নীরব। সিরাজের অঙ্গীর পদচারণা)

- সিরাজ** : সমস্ত দুর্বলতা বোঝে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অন্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অন্ত্র আমাদেরও আছে, কিন্তু তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এই অন্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।
ব্যক্তি : সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না, হজুর।
সিরাজ : তবু তাদের সংঘবন্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রংখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শক্রকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যে তাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবংশী, কায়স্ত রায়দুর্গ, জৈন মহাত্মা চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি প্রিষ্টান ওয়াটস ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজউদ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারণ, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের উপরে অবাধ লৃঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাতাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মিরজাফর-ক্লাইভের লুঁষ্টন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।
ব্যক্তি : কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই।
সিরাজ : আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাছাড়া আমি আছি। মরহুম আলিবর্দির আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরিক হইনি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করব আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)



- বার্তা : সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হয়েছেন, জাহাপনা।
- সিরাজ : (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দি হয়েছে?
- জনতা : তাহলে আর কোনো আশা নেই। কোনো আশা নেই।
 (জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগল)
- সিরাজ : মোহনলাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্ম-সংবরণ করে) তাহলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।
 (সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আখ্যাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়ে পালাতেই লাগল।)
- সিরাজ : আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শক্রকে অবশ্যই রুক্ষব।
 (সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দুইহাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ঢাকলেন)
- লুৎফা : নবাব।
- সিরাজ : (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন, লুৎফা?
- লুৎফা : অঙ্ককারের ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।
- সিরাজ : (রহস্য কঠে)। কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না, লুৎফা। দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।
- লুৎফা : (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙে পড়া চলবে না, জাহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্দুরা আছেন, সেখান থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।
- সিরাজ : যেখানে আমার বন্দুরা আছেন? হ্যাঁ আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।
- লুৎফা : তাহলে আর বিলম্ব নয়, জাহাপনা। এখনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।
- সিরাজ : হ্যাঁ, তাই যাই।
- লুৎফা : আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।
- সিরাজ : কী আর আয়োজন লুৎফা। দু তিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাক। আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।
- লুৎফা : না, আমি যাব আপনার সঙ্গে।
- সিরাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে-কষ্ট তুমি সহিতে পারবে না লুৎফা।
- লুৎফা : পারব। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাব আমি সঙ্গে যাব।

(কানায় ভেঙে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দুহাতে গ্রহণ করলেন।)

[দৃশ্যান্তর]



চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৯এ জুন। স্থান : মিরজাফরের দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে – রাজবন্ধু, জগৎশেষ, নকিব, মিরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াটস,

কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মিরন, মোহামাদি বেগ।]

(রাজবন্ধু, জগৎশেষ, রায়দুর্গসহ অন্যান্য আমির ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ-কোলাহলে মুখর যে সেটাকে রাজদরবারের পরিবর্তে নাচ-গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।)

- রাজবন্ধু : কই আসু জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?
- জগৎশেষ : ঢাল-তলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচেল খাঁ সাহেব, একটু দেরি তো হবেই। তাছাড়া চুলের নতুন খেজাব, ঢোকে সুর্মা, দাঢ়িতে আতর এ সব তাড়াছড়ার কাজ নয়।
- রাজবন্ধু : দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌছেছে কি না কে জানে।
- জগৎশেষ : না না, সে ভাবলা নেই। নবাব আলিবদী ইন্ডেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটি তৈরি। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কি না।
- রাজবন্ধু : তবেই হয়েছে। বে-শুয়ার হুর-গেলমানদের বিচ্ছিন্ন ওড়নার গোলকধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকিবের ঘোষণা)

- নকীব : সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন-দৌলত, জান-সালামতের জিম্মাদার মির মুহম্মদ জাফর আলি খান দরবারে তশরিফ আনছেন। হুশিয়ার... (মিরজাফরের প্রবেশ, সঙ্গে মিরন। সবাই সসন্ত্বরে উঠে দাঁড়াল)। মিরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর একগাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)
- রাজবন্ধু : (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসল গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।
- মিরজাফর : (চারিদিক তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।
- জগৎশেষ : কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানির পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে তো দরবারের নিয়ম।
- মিরজাফর : হ্যা, উনি এখনি আসবেন।
- রাজবন্ধু : (সৈর্বৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

(নকিবের ঘোষণা)

- নকীব : মহামান্য কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর, দরবার হুশিয়ার ... (ক্লাইভের প্রবেশ, সঙ্গে ওয়াটস কিলপ্যাট্রিক। গোটা দরবার সন্তুষ্ট। মিরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল।)
- ক্লাইভ : লং লিভ জাফর আলি খান। বাট হোয়াট ইজ দিস? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফরিদ?



- মিরজাফর** : (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবো না।
- ক্লাইভ** : (প্রচণ্ড বিশ্বায়ে) হোয়াট? দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক আই মাস্ট সে। আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ-আপনাকে নজরানা দেব।
- মিরজাফর** : মিরজাফর বেইমান নয়, কর্নেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে খণ্ডী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসব, তা না হলে নয়।
- ক্লাইভ** : (ওয়াটসকে নিচু স্বরে) নো ক্লাউন উইল এভার বিট হিম। (দরবারের উদ্দেশে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলি খান। আই এম কমপ্লিটলি ওভারহোয়েলম্যুড। বুবতে পারছিলে কী করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মিরজাফরের হাত ধরল। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে) জেন্টেলমেন, আই প্রেজেন্ট ইউ দ্যা নিউ নবাব, হিজ একসেলেন্সি জাফর আলি খান। আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। মে গড হেল্প হিম অ্যাভ হেল্প ইউ অ্যাজ ওয়েল।
- ওয়াটস ও
কিলপ্যাট্রিক** : হিপ হিপ হুরে।
- (মিরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল।)
- ক্লাইভ** : আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসল।
(কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখল)
- ক্লাইভ** : কোম্পানির তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।
- ওয়াটস ও
কিলপ্যাট্রিক** : লং লিভ নবাব জাফর আলি খান।
(একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগল। হঠাতে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দোড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে)
- উমিচাঁদ** : আমাকে খুন করে ফেলো— আমাকে খুন করে ফেলো। (ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।
- মিরজাফর** : কী হয়েছে? ব্যাপার কী?
- উমিচাঁদ** : ওহ সব বেইমান-বেইমান! না, আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সবলে চেপে ধরল। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগল। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)
- ক্লাইভ** : হ্যাত ইউ গন ম্যাড?
- উমিচাঁদ** : ম্যাড বানিয়েছ। এখন খুন করে ফেলো। দয়া করে খুন করো কর্নেল সাহেব।
- ক্লাইভ** : ডোস্ট বি সিলি। কী হয়েছে তা তো বলবে?
- উমিচাঁদ** : আমার টাকা কোথায়?
- ক্লাইভ** : কিসের টাকা?
- উমিচাঁদ** : দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।
- ক্লাইভ** : কোথায় সে দলিল?

- উমিচান্দ** : তোমরা জাল করেছ। (দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।
- ক্লাইভ** : আমি এর কিছুই জানিনে।
- উমিচান্দ** : তা জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাঁটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মতো কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে ...
- (ক্রমদল)
- ক্লাইভ** : (সবলে উমিচান্দের বাছ আকর্ষণ করে) ইউ আর ড্রিমিং ওমিচান্দ, তুমি খোয়াব দেখছ।
- উমিচান্দ** : খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষ টাকা পাব। তুমি নিজে সই করেছ।
- ক্লাইভ** : আমি সই করলে আমার মনে থাকত। তোমার বয়স হয়েছে—মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর—ইঞ্চুরকে ডাক। মন ভালো হবে। (উমিচান্দকে কিলপ্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। উমিচান্দ চিন্কার করতে লাগল: আমার টাকা, আমার টাকা।)
- ক্লাইভ** : উমিচান্দের মাথা খারাপ হয়েছে। ইওর এক্সিলেপি, মে ফরগিভ আস।
- জগৎশেষ** : এমন শুভ দিনটা থমথমে করে দিয়ে গেল।
- ক্লাইভ** : ভুলে যান। ও কিছু নয়। (নবাবের দিকে ফিরে) আমার মনে হয় আজ প্রথম দরবারে নবাবের কিছু বলা উচিত।
- রাজবন্ধুভ** : নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন করে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তা-ও মোটামুটি তাদেরকে জানানো দরকার।
- মিরজাফর** : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে-পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারি কাজ আরম্ভ করার আগে কর্ণেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আঙ্গরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চরিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।
- (ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সঙ্গে: হুরেন। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)
- মিরজাফর** : দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তারা নিঙ্কতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শান্তিতে আর কেনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।
- (প্রহরীর প্রবেশ)
- প্রহরী** : সেনাপতি মিরকাশেমের দৃত।
- মিরজাফর** : হাজির কর।
- (বসলেন। দুতের প্রবেশ। মিরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এল। মিরনের হাতে পত্র প্রদান। মিরন পত্র খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠল।)
- মিরন** : পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে। তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।
- (মিরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)
- ক্লাইভ** : তালো খবর। ইউ ক্যান ফিল রিয়েলি সেফ নাউ।



- মিরজাফর :** কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে কোনো জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলত।
- ক্লাইভ :** (রুখে উঠল) নো, ইওর অনার। এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে এভরি মোমেন্ট। কাজেই সিরাজউদ্দৌলা শিকল-বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলি খান। সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে সিম্প্যাথি দেখাবে সে ট্রেটার। আর আইনে ট্রেটারের শাস্তি মৃত্যু। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ মাস্ট রুল।
- মিরজাফর :** আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দি করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।
- ক্লাইভ :** ইয়েস। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে সোলজাররা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে অর্ডিনারি পাবলিক তার মুখে খুঁতু দেবে – দে মাস্ট স্পিট অন হিজ ফেস।
- মিরজাফর :** অতটা কেন?
- ক্লাইভ :** আমি জানি হি ইজ এ ডেড হর্স। কিন্তু এটা না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? পাবলিকের মনে টেরের জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।
(মিরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারে কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মধ্যের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেল; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অঙ্ককার। ধীরে ধীরে মধ্যে অনুজ্জ্বল আলো ঝল্লে উঠল। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মিরনের প্রবেশ।)
- ক্লাইভ :** আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে। এসব ব্যাপারে চাল নেওয়া চলে না।
- মিরন :** কিন্তু হ্রুম দেবে কে? আব্বা রাজি হলেন না।
- ক্লাইভ :** রাজবংশভকে বল।
- মিরন :** তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেল না।
- ক্লাইভ :** দেন?
- মিরন :** রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ থঁ— ওরাও রাজি হলেন না।
- ক্লাইভ :** তাহলে তোমাকে সেটা করতে হবে।
- মিরন :** প্রহরীরা আমার হ্রুম শুনবে কেন?
- ক্লাইভ :** তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে ইন ইওর ওউন্ ইন্টারেস্ট। সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত হোয়াট অ্যাবাউট দ্যা লাভলি প্রিসেস? লুৎফুলিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাজউদ্দৌলা জীবিত থাকতে?
- মিরন :** আমি একজন লোকের ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হ্রুম চাই।
- ক্লাইভ :** হোয়াট এ পিটি, হায়ার্ড কিলাররা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। এনি ওয়ে, ডাকো তাকে।
(মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদি বেগকে নিয়ে ফিরে এল।)
- ক্লাইভ :** এ কে?



- মিরন : মোহাম্মদি বেগ।
 ক্লাইভ : তুমি রাজি আছ?
 মোহাম্মদি
 বেগ : দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অঞ্চিত।
 ক্লাইভ : এফিড (মিরনকে)। ওকে টাকাটা এখনি দিয়ে দাও।
 (মিরন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরবার উপক্রম করল)
 ক্লাইভ : দেয়ার মে বিট্রোবল, অবস্থা বুঝে কাজ কর, বি কেয়ারফুল। কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও।
 (ওরা বেরিয়ে গেল। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আবাত করে বললো)
 ইট ইজ এ মাস্ট।

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : দোসরা জুলাই। স্থান : জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

[শিল্পীবৃন্দ : মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-কারা-প্রহরী, সিরাজ, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।]

- (প্রায়-অঙ্ককার কারাকক্ষে সিরাজউদ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া, অন্য প্রান্তে একটি সোরাহি এবং পাত্র। সিরাজ অস্ত্রিভাবে পায়চারি করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শান্তি। মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগের প্রবেশ। তার দুহাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটুখানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

- সিরাজ : (খাটিয়া উপবিষ্ট-আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এল।
 (খাটিয়া থেকে উঠে মধ্যের সামনে এগিয়ে এল। মধ্যের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগ।)

- সিরাজ : (মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে, লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুল্লাহ।

- মিরন : আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।

- সিরাজ : (চমকে উঠে) মিরন! তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুযোগ দেখাতে এসেছ, না পীড়ন করতে?

- মিরন : তোমার অপরাধের জন্য নবাবের দণ্ডজ্ঞা শোনাতে এসেছি।

- সিরাজ : নবাবের দণ্ডজ্ঞা?

- মিরন : বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে, দরবারের পদস্থ আমির ওমরাহদের মর্যাদাহানির জন্যে, বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইনসঙ্গত বাণিজ্যের অধিকার স্কুল করবার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলি খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।



সিরাজ : মৃত্যুদণ্ড? জাফর আলি খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।

মিরন : আসামির সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে) মোহাম্মদি বেগ।

মোহাম্মদি

বেগ : জনাব।

মিরন : নবাবের হকুম তামিল কর।

(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদি বেগ লাঠিটা ঝুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগল)

সিরাজ : প্রথমে মিরন, তারপর মোহাম্মদি বেগ। মিরন তবু মিরজাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি আসছ আমাকে খুন করতে?

(মোহাম্মদি বেগ তেমনি এগোতে লাগল। সিরাজ হঠাত তয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে।)

সিরাজ : আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি। কিন্তু তুমি এ কাজ কোরো না মোহাম্মদি বেগ।

(মোহাম্মদি বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)

সিরাজ : তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ। অভীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো। আমার আবা-আমা পুত্রসন্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে-স্নেহের ঝণ—আঃ ...

(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। সিরাজ লুটিয়ে পড়ল। মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)

সিরাজ : (শ্বলিত কষ্টে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া, এ পীড়ন তুমি দেখলে না।

(মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুঁঠিত দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার পিঠে পর পর কয়েকবার ছোরার আঘাত করল। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকৃষ্ণন। মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়াল)

সিরাজ : (ঈষৎ মাথা নাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু-নিষ্ঠেজ কষ্টে) লা ইলাহা ইল্লাহাহ ...

(মোহাম্মদি বেগ লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবন্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।)

মোহাম্মদি

বেগ : (উল্লাসের সঙ্গে) হা হা হা ...

টীকা ও চরিত্র-পরিচিতি

আলিবর্দি (মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ) : (১৬৭৬-১০.০৪.১৭৫৬ খ্রি)। অকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি। তিনি ১৭৪০ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। আলিবর্দি খাঁর বাবা ছিলেন আরব দেশীয় এবং মা তুর্কি। ইরানের (পারস্য) এই সামান্য সৈনিক ভাগ্যাস্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঢাকরির উদ্দেশে দিল্লিতে এসে সুবিধা করতে না পেরে তিনি বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের দরবারের পারিষদ ও পরে একটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হন। ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁর অগ্রজ হাজি আহমদের বুদ্ধিতে সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদে বসেন। খুশি হয়ে সুজাউদ্দিন তাঁকে ‘আলিবর্দি’ উপাধি দিয়ে রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর নবাব হন তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ। কিন্তু বিহারের সুবেদার আলিবর্দি খাঁ তখন অপরিসীম শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী। অমাত্যবর্গও তাঁর অনুগত। অবশেষে ১৭৪০ সালের ৯ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদের কাছে গিরিয়ার ঝুকে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করে আলিবর্দি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন।

আলিবর্দি খাঁ ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ শাসক। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে শুরুত্তপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। বর্গিদের অত্যাচারে দেশের মানুষ যখন অতিষ্ঠ তখন তিনি কঠিন হাতে তাদের দমন করেন। বর্গ প্রধান ভাস্কর পশ্চিমসহ তেইশজন নেতাকে তিনি কোশলে হত্যা করেন এবং বর্গিদের সঙ্গে সঞ্চ স্থাপন করেন। একইভাবে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনায় রেখে ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ না করে কোশলে তাদের দমিয়ে রাখেন। এভাবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আলিবর্দি খাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি কন্যা ঘসেটি বেগম (মেহেরেন্দ্রেসা), শাহ বেগম ও আমিনা বেগমকে তিনি তাঁর ভাই হাজি মুহম্মদের তিন পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। আশি বছর বয়সে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি ১০ই এপ্রিল ১৭৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দোলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন। সিরাজ ছিলেন আলিবর্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আলিবর্দির ইচ্ছা অনুযায়ী সিরাজ নবাব হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

মিরজাফর : মিরজাফর আলি খাঁন পারস্য (ইরান) থেকে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে আসেন। উচ্চ বংশীয় যুবক হওয়ায় নবাব আলিবর্দি খাঁন তাকে স্নেহ করতেন এবং বৈমাত্রেয় ভগী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দেন। আলিবর্দি তাকে সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কুটকোশল ও চার্তুর্রের মাধ্যমে নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন এবং সেনাপতি ও বকশির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার মেধা, বুদ্ধি ও কোশলের মূলে ছিল ক্ষমতালিঙ্গ। ফলে আলিবর্দিকে হত্যা করার ঘড়্যন্ত থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে একাধিক বার ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন নবাব। আবার বার বার ক্ষমা পাওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর যুবক সিরাজউদ্দোলা নবাব হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করলে চারদিকে ঘড়্যন্ত ঘনীভূত হয়ে উঠে। বিশেষ করে ইংরেজদের সীমান্তীন লোড ও স্বার্থপ্রতার ঘড়্যন্তে অনেক রাজ অমাত্যের সঙ্গে যুদ্ধ ভূমিকায় অবর্তীণ হন মিরজাফর। ইংরেজদের প্রলোভনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি তখন নীতি-নৈতিকতাহীন এক উন্নাদে পরিণত হন। তাই পলাশির যুদ্ধে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েও এবং পবিত্র কোরান ছুঁয়ে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করলেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতার পথ থেকে বিন্দুয়াত্র সরে আসেননি। বরং পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনের পর ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালের ২৯এ জুন ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে আরোহণ করেণ। কিন্তু ইংরেজদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় তাকে গদিচ্যুত করে তার জামাতা মিরকাসিমকে বাংলার মসনদে বসান। ১৭৬৪ সালে পুনরায় তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বার্থীনতা বিকিয়ে দেওয়া এই বিশ্বাসঘাতক মানুষটি কুঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ সালে মারা যান। বাংলার ইতিহাসে মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক, নিকৃষ্ট মানুষের প্রতীক। ফলে মিরজাফর ও বিশ্বাসঘাতক সমার্থক হয়ে উঠল।



ক্লাইভ : পিতা-মাতার অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সন্তান ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। তার দোরাত্ত্বে অস্থির হয়ে বাবা-মা তাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে তারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর। কোম্পানির ব্যবসার মাল ওজন আর কাপড় বাছাই করতে করতে বিরক্ত হয়ে ক্লাইভ দুইবার পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুলি চলেনি বলে বেঁচে যান ভাগ্যবান ক্লাইভ।

ফরাসিরা এদেশে বাণিজ্য বিভাগের ও রাজ্যজয়ের জন্য অস্ত্র হচ্ছিল। বাজার দখল ও রাজ্য জয়কে কেন্দ্র করে তখন ফরাসিদের বিরুদ্ধে চলছিল ইংরেজ বণিকদের যুদ্ধ। সেইসব ছোটখাটো যুদ্ধে সৈনিক ক্লাইভ একটার পর একটা ক্রিত্তি প্রদর্শন করেন। বোমাই এর মারাঠা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে কর্ণেল পদবি লাভ করেন এবং মাদ্রাজের ডেপুটি গভর্নর পদে অধিগ্রহিত হন।

সে সময় সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করে নেন। ইংরেজ পক্ষের গভর্নর দ্রেক পালিয়ে যান। কিন্তু কর্ণেল ক্লাইভ অধিক সংখ্যক সৈন্যসামগ্রি নিয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে দুর্গ দখল করে নেন।

তারপর চলল মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দরকার্য। ক্লাইভ ছিলেন যেমন ধূর্ত তেমনি সাহসী; আবার যেমন মিথ্যাবাদী তেমনি কৌশলী। চারদিক থেকে ষড়যজ্ঞের জাল বিস্তার করে তিনি তরঙ্গ নবাবকে বিআন্ত ও বিব্রত করার জন্য চেষ্টা করেন। নবাবের অধিকাংশ লোভী, শ্বার্থপূর, শর্ত ও বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও সেনাপতিদের উৎকোচ ও প্রলোভন দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। অবশেষে তার নেতৃত্বে চন্দননগরে ফরাসি কুঠি আক্রমণ করা হয়। ফরাসিরা পালিয়ে যান। এবার ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন পলাশি প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ শর্তভার ও বিশ্বাসঘাতকতার। সিরাজউদ্দৌলার অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে খুব সহজেই ক্লাইভের সৈন্য জয়লাভ করে।

ক্লাইভ বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান। কিন্তু অকৃত শাসনকর্তা হন তিনি নিজেই। মিরজাফর তার অনুযাহে নামেমাত্র রাজ্য পরিচালনা করতেন। ১৭৬০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মহাবিভূষণী, বিজয়ী ক্লাইভ দেশে ফিরে যান। এ সময় তার বার্ষিক আয় ৪ লক্ষ টাকা।

১৭৬৪ সালের জুন মাসে ক্লাইভ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অসীম ক্ষমতা নিয়ে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৭৬৭ সালের জুলাই মাসে যখন তিনি চির দিনের জন্য লভনে ফিরে যান তখন তিনি হতোদয়ম, অপমানিত ও লজ্জিত। ভারত মুঠেরে বিপুল অর্থ ব্রিটিশ কোষাগারে না-রেখে আত্মাসংক্রান্ত করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঢ়ি করানো হয়। তিনি লজ্জায় ও অপমানে বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৭৭৪ সালে ২২এ লভনের আত্মহত্যা করেন।

উমিচাঁদ : উমিচাঁদ লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি গোমস্তার কাজ করতেন। পরে ইংরেজদের ব্যবসার দালালি করতে শুরু করেন। মাল কেন্দ্র-বেচার জন্য দালালদের তখন বেশ প্রয়োজন ছিল। দালালি ব্যবসা করে উমিচাঁদ কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। কখনো কখনো নবাবের প্রয়োজনে উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়ে নবাবের দরবারে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে উমিচাঁদ দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ শুরু করেন। উমিচাঁদ বড় ধূরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে দু পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। গভর্নর রোজার দ্রেক তাকে একবার বন্দি করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রেখেছিলেন। উমিচাঁদ মিরজাফর প্রমুখদের নবাব বিরোধী চক্রান্ত ও শলাপরামর্শের সহযোগী ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে অন্যদের যে ১৫ দফা গোপন চুক্তি হয় তাতে উমিচাঁদ গো ধরে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, ইংরেজরা জয়ী হলে তাকে কৃতি লক্ষ টাকা দেবে। কিন্তু ক্লাইভ ছিলেন বিশ্বাসীর কৃতকৌশলী মানুষ। তিনি সাদা ও লাল দুইরকম দলিল করে জাল দলিলটা উমিচাঁদকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সাদা দলিলটা ছিল ক্লাইভের কাছে এবং তাতে উমিচাঁদের দাবির কথা উল্লেখ ছিল না।

যুদ্ধ জয়ের পরে উমিচাঁদ ক্লাইভের এই ভাঁতুত বুঝতে পেরে টাকার শোকে পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন এবং অকালে মারা গেছেন। এদেশে ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পেছনে উমিচাঁদের ষড়যজ্ঞ এবং বিশ্বাসঘাতকতা অনেকাংশে দায়ী।

ওয়াটাস: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাশিম বাজার কুঠির পরিচালক ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটাস। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রবেশাধিকার ছিল তার। নাদুসন্দুস মোটাসোটা এবং দেখতে



সহজ-সরল এই লোকটি ছিলেন আদর্শ ও নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ। সর্বপ্রকার মিথ্যার আশয় এহেণ্টে তার জুড়ি ছিল না। মিরজাফরসহ অন্যান্য বিশ্বাসযাতকদের সঙ্গে তিনি সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘড়বঞ্চের অন্যতম প্রধান সহায়ক ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। নারীর ছবিবেশে ঘড়বঞ্চের সভায় উপস্থিত হয়ে বিশ্বাসযাতক মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ প্রযুক্তদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। নবাব একবার তাকে বন্দি করেছিলেন আর একাধিকবার তাকে শুলে ঢাকিয়ে হত্যা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভদের পরামর্শে নবাব তাকে ক্ষমা করেন। হতোদয় ওয়াটস দেশে ফিরে যান এবং অকালে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ওয়াটসের স্ত্রী এদেশের অন্য একজন ইংরেজ যুবককে বিয়ে করে থেকে যান।

ওয়াটসন (অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন) : ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। ওয়াটসন ছিলেন ব্রিটিশ রাজের কর্মিণ পাওয়া অ্যাডমিরাল। ১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যসামন্তসহ পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি কলকাতার দিকে রওনা হন। কলকাতা তখন ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার দখলে। আর ইংরেজরা ফলতা অঞ্চলে পালিয়ে যান। ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হন ওয়াটসন। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইভ ও ওয়াটসনের সেনাবাহিনী কলকাতায় পৌছায়। নবাবের ফৌজদার মানিকচাঁদকে তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজরা কলকাতা দখল করেন। ওয়াটসন হলেন কোম্পানির সিলেষ্ট কমিটির মেম্বার। ওয়াটসন মনে মনে ক্লাইভের ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। উমিঁচাঁদকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যে জাল দলিলে ক্লাইভ ও মিরজাফর প্রযুক্তেরা সই করেছিলেন তাতে ওয়াটসন সই দেননি। তার সই নকল করা হয়েছিল। অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌবাহিনীর নেতৃত্বের জন্য ইংরেজরা অতি সহজে চন্দননগরের ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পলাশির যুদ্ধের দুরাস পরেই অসুস্থ হয়ে কলকাতায় মারা যান। সেন্ট জোস্ট গোরস্থানে তাঁর কবর আছে।

হলওয়েল : লন্ডনের গাইস হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পাস করে হলওয়েল কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। পাটনা ও ঢাকার অফিসে কিছুকাল চাকরি করে ১৭৩২ সালে তিনি সার্জন হয়ে কলকাতায় আসেন। তখন তার মাঝে ছিল পঞ্চাশ টাকা মাত্র। সুতরাং অবেধভাবে বিপুল অর্থ-ঐশ্বর্য লাভের আশায় তিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরি নেন। ১৭৫২ সালে তিনি চবিশ পরগনার জমিদারের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধের সময় তিনি ফোর্টের অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হন।

সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে কোম্পানির গভর্নর দ্রেক, সৈন্যাধ্যক্ষ মিনসিনসহ সবাই নৌকায় চড়ে পালিয়ে যান। তখন ডা. হলওয়েল কলকাতার সৈন্যাধ্যক্ষ ও গভর্নর হন। কিন্তু সিরাজের আক্রমণের কাছে টিকতে পারননি। সিরাজের বাহিনী হলওয়েলকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন।

মিথ্যা বলে অতিরিক্ত করে অসত্য ও অন্যায়ের আশয় নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এবং তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করা ছিল হলওয়েলের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে তিনি অঙ্গকূপ হত্যা কাহিনি (Black Hole Tragedy) বানিয়েছিলেন। তার বানানো গল্পটি হলো : নবাব দুর্গ জয় করে ১৮ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখেন—যে ঘরের চারদিক ছিল বন্ধ। সকালে দেখা গেল ১২৩ জন ইংরেজ মারা গেছেন। অর্থাত দুর্গে তখন ১৪৬ জন ইংরেজ ছিলেনই না। আর এমন ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন মানুষ কিছুতেই সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাত তার হিসাব-নিকাশ বোধ সম্পূর্ণ লুক্ষ হয়েছিল। আর এই মিথ্যাকে চিরস্মৃতী রূপ দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতায় ব্লাক হোল মনুমেন্ট নির্মাণ করেছিলেন। পরে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস এই মনুমেন্ট সরিয়ে দেন।

ঘসেটি বেগম : নবাব আলিবর্দি খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম তথ্য মেহেরানেসা। আলিবর্দি খানের বড় ভাই হাজি আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎ জঙ্গের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তিনি ছোট বোন আমিনা বেগমের ছেলে অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার ভাই একরামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল যে, একরামউদ্দৌলা নবাব হলে নবাব মাতা হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু একরামউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করলে ঘসেটি বেগম নৈরাশ্যে আক্রান্ত হন।

ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিস মোহাম্মদ ছিলেন ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও দুর্বল চিকিৎসের অধিকারী ব্যক্তি। তিনি নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তার সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁয়ের



সঙ্গে ঘসেটি বেগমের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়। ফলে আলিবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলা হোসেন কুলী থাকে হত্যা করেন। ঘসেটি বেগম এই হত্যাকাণ্ডকে কখনই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি সর্বদাই ছিলেন প্রতিশোধ-পরায়ণ।

বিক্রমপুরের অধিবাসী রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় নওয়াজেস যোহাম্মদের দেওয়ান ছিলেন। ঘসেটি বেগম রাজবল্লভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সিরাজকে সিংহসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান এবং ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। খালা ঘসেটি বেগমকে তিনি মুর্শিদাবাদের সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দি অবস্থায় রাখেন এবং তার সমস্ত টাকাকড়ি, গয়নাগাটি ও সোনাদানা বাজেয়াঙ্গ করেন। কিন্তু ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তিনি নানা কৌশলে নবাব সিরাজের বিশ্বাসঘাতক আয়ত্য ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ঘসেটি বেগম ও তার দলবলের বিজয় হলেও আর দশজন বিশ্বাসঘাতকের মতো তার পরিণতিও ছিল বেদনাবহ। প্রথমে তাকে ঢাকায় অন্তরীণ করা হয়। পরে মিরনের চক্রান্তে বৃড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্মার সঙ্গিসঙ্গে ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

ড্রেক : রোজার ড্রেক ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার গভর্নর। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। নবাবের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে প্রাণ ভয়ে সঙ্গী-সাথীদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ফেলে তিনি নৌকায় চড়ে কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে যান।

পুনরায় ক্লাইভ কলকাতা অধিকার করলে ড্রেক গভর্নর হিসেবে দায়িত্বার প্রহণ করেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর কোম্পানি ড্রেকের পরিবর্তে রবার্ট ক্লাইভকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করে। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পরে গভর্নর ড্রেককে মিরজাফর তার রাজকোষ থেকে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

মানিকচাঁদ : রাজা মানিকচাঁদ ছিলেন নবাবের অন্যতম সেনাপতি। তিনি বাঞ্ছিলি কায়স্ত, ঘোষ বৎশে তার জন্ম। নবাবের গোমন্তা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। পরে আলিবর্দির সুনজরে পড়ে মুর্শিদাবাদে সেরেন্টাদারি পেয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব কলকাতা শহরের আলি নগর নামকরণ করেন। আর মানিকচাঁদকে করেন কলকাতার গভর্নর।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ ইংরেজদের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ক্লাইভ মদ্রাজ থেকে কলকাতা পৌছে মানিকচাঁদকে পত্র লিখে তার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেন। এক সময় নবাব সিরাজ মানিকচাঁদকে কলকাতার সোনাদানা লুঠ করে কুক্ষিগত করার অপরাধে বন্দি করেন। অবশেষে রায়দুর্গের পরামর্শে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছিলেন। মানিকচাঁদ ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধ না-করে কলকাতা ছেড়ে হৃগলি পলায়ন করেছিলেন এবং পলাশির যুদ্ধের পূর্বে ক্লাইভকে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদের দিকে অঞ্চল হতে সাহায্য করেছিলেন।

জগৎশেষ্ঠ : জগৎশেষ্ঠ জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর পেশা ছিল ব্যবসায়। বহুকাল ধরে হিন্দু সমাজভূক্ত হয়ে এই সমাজেরই অংশ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তার প্রকৃত নাম ফতেহ চাঁদ। জগৎশেষ্ঠ তার উপাধি। এর অর্থ হলো জগতের টাকা আমদানিকারী বা বিপুল অর্থের অধিকারী কিংবা অর্থ লন্ধনের ব্যবসায়ী। নবাব সরফরাজ থাকে হচ্ছিয়ে আলিবর্দিকে সিংহসনে আরোহণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল। সুতরাং তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের বশীভূত থাকবেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দিবেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা সততা ও নিষ্ঠায় তিনি প্রকৃতির এক যুবক। তিনি কিছুতেই এদের অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বরং জগৎশেষ্ঠকে তার ষড়যন্ত্রের জন্য বিভিন্নভাবে লাক্ষ্যিত করেছেন। জগৎশেষ্ঠও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার পতনে নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আমিনা বেগম : নবাব আলিবর্দির কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগম। আলিবর্দির বড় ভাই হাজি আহমদের পুত্র জয়েন উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর তিনি সজ্জান। এরা হলেন মির্জা মুহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা, একরামউদ্দৌলা ও মির্জা হামদি। স্বামী জয়েনউদ্দিন ও পুত্র সিরাজউদ্দৌলার জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর জীবনও আঠেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। স্বামী জয়েনউদ্দিন প্রথমে উড়িষ্যার ও পরে বিহারের সুবেদার ছিলেন। ১৭৪৮ সালে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ দুররানি পাঞ্চাব আক্রমণ



କରଲେ ନବାବ ଆଲିବଦିର ଆଫଗାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୟେ ଓଠେନ ଏବଂ ପାଟନା ଅଧିକାର କରେନ । ବିଦ୍ରୋହିରା ନବାବେର ବଡ଼ ଭାଇ ହାଜି ଆହମଦ ଓ ଜାମାତା ଜୟେନ୍ଟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେନ ।

ଅତି ଅଞ୍ଚଳ ସିଯାମେ ବିଧବୀ ଆମିନା ବେଗମ ପୁତ୍ର ନବାବ ସିରାଜୁଡ଼ୌଲାର ମାତା ହିସେବେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରତେ ପାରେନନି । ଦେଶ-ବିଦେଶି ବିଶ୍ୱାସଘାତକଦେର ଚକ୍ରାତ୍ମକ ନବାବ ପରାଜିତ ଓ ନିହତ ହେ ଏବଂ ଏକଟି ହାତିର ପୃଷ୍ଠେ ତାଁର ମରଦେହ ନିଯେ ଏବେ ମା ଆମିନା ବେଗମ ଦିକବିଦିକ ଜାନଶୂନ୍ୟ ହୟେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରତେ ହେଲେକେ ଶେଷବାରେର ମତୋ ଦେଖିତେ ଛୁଟେ ଆସେନ । ଏ ସମୟ ମିରଜାଫରେର ରଙ୍ଗିରା ତାଁର ଉପର ଚଢାଓ ହୟ ଏବଂ ତାଁକେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କରେ ଅନ୍ଦର ମହଲେ ପାଠିଯେ ଦେଯ । ଆମିନାର ଏକ ପୁତ୍ର ଏକରାମୁଡ଼ୌଲା ପୁର୍ବେଇ ବସନ୍ତ ରୋଗେ ମାରା ଯାନ । ପଲାଶିର ଯୁଦ୍ଧେ ସିରାଜୁଡ଼ୌଲା ମିରଜାଫର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମାତ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାଯା ପରାଜିତ ଓ ନିହତ ହନ । କମିଟ୍ ପୁତ୍ର ମିର୍ଜା ହାମଦିକେଓ ମିରନେର ଆଦେଶେ ନିର୍ମଭାବେ ହତ୍ୟା କରା ହୟ । ଆର ଆମିନା ବେଗମକେ ହାତ-ପା ବେଂଧେ ମନୀତେ ଫେଲେ ଦିଯେ ନିରମର୍ଭାବେ ହତ୍ୟା କରା ହୟ ।

ମିରନ : ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମିରଜାଫରେର ତିନ ପୁତ୍ର । ତାରା ହଲେନ : ଜ୍ୟୋତି ମିରନ, ମେଜୋ ନାଜମୁଡ଼ୌଲା ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ସାଇଫ୍ମୁଡ଼ୌଲା । ମିରନ ପିତାର ମତଇ ଦୁଚ୍ଚରିତ, ବ୍ୟାଡିଚାରୀ, ନିଷ୍ଠିର ଏବଂ ସତ୍ୟଭ୍ରତିକାରୀ । ମିରଜାଫରେର ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ରାଜ-ଅମାତ୍ୟଦେର ଯୋଗାବୋଗେର କାଜ କରତେନ ମିରନ । ତାରଇ ସତ୍ୟବସ୍ତେ ଏବଂ ସତ୍ୟବସ୍ତ୍ଵାର ମୋହାମଦି ବେଗ ହତ୍ୟାଗ୍ୟ ନବାବ ସିରାଜୁଡ଼ୌଲାକେ ନିଷ୍ଠିରଭାବେ ହତ୍ୟା କରେନ । ମିରନ ସିରାଜୁଡ଼ୌଲାର ମଧ୍ୟମ ଭାତା ମୃତ ଏକରାମୁଡ଼ୌଲାର ପୁତ୍ର ମୁରାଦୁଡ଼ୌଲାକେଓ ନିଷ୍ଠିରଭାବେ ହତ୍ୟା କରେନ । ତିନି ସିରାଜେର ପ୍ରିୟତମା ଭାକେ ବିବାହ କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଲୁଣ୍ଫୁଲ୍ଲେଶାର ତୌର ବିରୋଧିତାର ଜନ୍ୟ ତାର ଏହି ଅଭିଲାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟନି । ମିରନେର ଅଗରାଧ ଓ ପାପେର ସୀମା ନାଇ । ବଜ୍ରାଧାତେ ଅକାଳେ ମାରା ଯାନ ଏହି କୁଣ୍ଡିତ ସ୍ଵଭାବେର ମାନୁଷଟି ।

ମିରମର୍ଦ୍ଦନ : ମିରମର୍ଦ୍ଦନ ନବାବ ସିରାଜୁଡ଼ୌଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେନାପତି ହିସେନ । ପଲାଶିର ଯୁଦ୍ଧେ ତିନି ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ରେର ପରିଚୟ ଦିଯେଛିଲେନ । ଏହି ଅଭୂତୋଭ୍ୟ ବୀର ଯୋଜା ଯୁଦ୍ଧ କରତେ କରତେ ଇଂରେଜ ଶିବିରେ ଦିକେ ଏଗିଯେ ଯାଓ୍ଯାର ସମୟ ତାର ଉରୁତେ ଗୋଲାର ଆଘାତ ଲାଗେ । ମୃତ୍ୟୁର କୋଲେ ଢଳେ ପଡ଼ାର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଯୁଦ୍ଧ କରେଛେ, ଅଥଚ ଅଧିକାଂଶ ସେନାପତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପରିଚୟ ଦିଯେଛେ ।

ମୋହାମଦି ବେଗ : ମୋହାମଦି ବେଗ ଏକଜନ ନୀଚାଶୟ ଓ କୃତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଖୁନି । ପଲାଶିର ଯୁଦ୍ଧେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜ୍ୟେର ପର ଝାଇ- କଲ୍ୟାନହ ପାଟନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଲ୍ଲିର ତଥା ମିରଜାଫରେର ଭାଇ ମିରଦାଉଦ ସପରିବାରେ ନବାବକେ ବନ୍ଦି କରେ ରାଜଧାନୀତି ନିଯେ ଆସେ । ଗପବିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶକ୍ତାଯା କ୍ଲାଇଭ ଦ୍ରୁତ ସିରାଜକେ ହତ୍ୟା କରତେ ଚାନ । ତଥାନ ମିରନେର ଆହାନେ ମୋହାମଦି ବେଗ ସିରାଜକେ ହତ୍ୟା କରତେ ରାଜି ହୟ । ଅଥଚ ସିରାଜେର ପିତା ମିର୍ଜା ଜୟନ୍ଦିନ ଅନାଥ ବାଲକ ମୋହାମଦି ବେଗକେ ଆଦର-ଯତ୍ନେ ମାନୁଷ କରେଛିଲେନ । ଅଥଚ ସେଇ ମୋହାମଦି ବେଗ ଅର୍ଥେର ଲୋଭେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠିରଭାବେ ପିଟିଯେ ଓ ଛୁରିକାଥାତେ ହତ୍ୟା କରେ ନବାବ ସିରାଜୁଡ଼ୌଲାକେ । ୨ରା ଜୁଲାଇ, ୧୭୫୭ ସାଲେ ବାହାର ଶେଷ ସ୍ଵାଧୀନ ନବାବ ସିରାଜୁଡ଼ୌଲା ଶହିଦ ହନ ।

ରାଜବଲ୍ଲାଭ : ରାଜା ରାଜବଲ୍ଲାଭ ବୈକ୍ରମପୁରେ ବାଜାଲି ବୈଦ୍ୟ ସମ୍ପଦାଯେର ଲୋକ ଛିଲେନ । ସିରାଜୁଡ଼ୌଲାର ଶାର୍ଥପର, ଅର୍ଥଲୋଜୁପ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅମାତ୍ୟଦେର ତିନି ଏକଜନ । ରାଜବଲ୍ଲାଭ ଢାକାଯ ନୌବାହିନୀ କେରାନିର କାଜ କରତେନ । ପରେ ଢାକାର ଗର୍ଭନର ଘସେଟି ବେଗମେର ସ୍ଵାମୀ ନୋଯାଜିଶ ଥାର ପେଶକାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନ କରେନ । ଫଳେ ଖୁବ ସାଭାବିକତାବେଇ ଘସେଟି ବେଗମେର ସଙ୍ଗେ ତାଁର ସଥ୍ୟ ଗଡ଼େ ଓଠେ ଏବଂ ତିନି ନବାବ ସିରାଜେର ବିରଳଦ୍ଵାରା ବଢ଼ୁଥିଲା ଲିଙ୍ଗ ହନ । ତିନି ରାଜା ଉପାଧି ଲାଭ କରେନ । ହୋସେନ କୁଳୀ ଥାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ରାଜବଲ୍ଲାଭ ଢାକାର ଦେଓୟାନ ନିୟନ୍ତ୍ର ହନ । ଏ ସମୟ ଗର୍ଭନ ନୋଯାଜିଶ ଥାର ଶାସନ ସବସ୍ତ୍ରାବାଦ ଦୁର୍ବଲତାର ସ୍ମୂଗେ ରାଜବଲ୍ଲାଭ ବିଶୁଲ ଅର୍ଥବିନ୍ଦେର ଅଧିକାରୀ ହନ । ଏହି ସଂବାଦ ଜେନେ ସିରାଜ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଥେକେ ରାଜବଲ୍ଲାଭକେ ବନ୍ଦି କରେନ । କିନ୍ତୁ ଆଲିବଦିର ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜବଲ୍ଲାଭ ମୁକ୍ତି ପାଇ । ରାଜବଲ୍ଲାଭର ଅବେଦ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜେଯାଙ୍କ କରାର ଜନ୍ୟ ସିରାଜ ଢାକାଯ ଲୋକ ପାଠାନ । କିନ୍ତୁ ଅତି ଧୂରନ୍ଧର ରାଜବଲ୍ଲାଭ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଦାସେର ମାଧ୍ୟମେ ନୋକାଭାର୍ତ୍ତ ଟାକାକଡ଼ି ଓ ସ୍ଵର୍ଗଲକ୍ଷକାର କଲକାତାଯ ପାଠିଯେ ଦେନ । କୃଷ୍ଣଦାସ ତୀର୍ଥ ସାତାର ନାମ କରେ ପୁରି ଯାଓ୍ଯାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କଲକାତାର ରୋଜାର ଡ୍ରେକକେ ଫୋର୍ଟ ଉଇଲିଯମ ଦୁର୍ଗେ ଗିଯେ ଆଶ୍ରଯ ନେନ । ନବାବ ଡ୍ରେକକେ ଚିଠି ଦିଯେ



কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণের জন্য বলেন। কিন্তু অর্থলিঙ্গ দ্রেক তাকে পাঠাননি। রাজবল্লভ ইংরেজদের শক্তি সংহত করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার জন্য শেষ পর্যন্ত নানাভাবে ঘড়যন্ত্র করে শিয়েছেন। **লুৎফুল্লেসা :** নবাব সিরাজউদ্দৌলার ত্রী লুৎফুল্লেসা। তিনি মির্জা ইরিচ খানের কন্যা। ১৭৪৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে মহাধূমধামে লুৎফুল্লেসার বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার জীবন কুসুমাঞ্চীর্ণ ছিল না। আসাদ রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না-থাকলেও তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছে সব কিছু। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুক্তে সিরাজের পরাজয়ে তিনি স্বামীর হাত ধরে অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শক্রুর হাতে ধরা পড়েন তারা। সিরাজ বন্দি হয়ে চলে যান মুর্শিদাবাদে আর লুৎফুল্লেসাকে নিয়ে বাওয়া হয় ঢাকায়। সুতরাং স্বামীকে হত্যার দৃশ্য তিনি দেখেননি। মৃতদেহের স্থানের পাশে তিনি ছিলেন না। পরে যখন তাঁকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনা হয় তখন তিনি নিঃস্ব, আপন বলে পৃথিবীতে তাঁর কেউ নেই। খোশবাগের গোরস্থানে স্বামীর সমাধিতে সক্ষ্যাপনীগ জ্বালিয়ে তার নিঃসঙ্গ জীবন কাটে। মিরন তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু লুৎফুল্লেসা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করেন। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

রায়দুর্লভ : নবাব আলিবর্দির বিশ্বস্ত অমাত্য রাজা জানকীরামের ছেলে রায়দুর্লভ। রায়দুর্লভ ছিলেন উড়িষ্যার পেশকার ও পরে দেওয়ানি লাভ করেন। রায়জি ভোসলা উড়িষ্যা আক্রমণ করে রায়দুর্লভকে বন্দি করেন। তৎক্ষণাৎ তাকে জারিমানা দিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদ চলে আসেন এবং রাজা রামনারায়ণের মুস্তকুদি পদে নিয়োজিত হন। তিনি নবাব আলিবর্দির আনুকূল্য লাভ করেন এবং নবাবের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হন। কিন্তু নবাব সিরাজের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল না। তাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাকে পদোন্নতি প্রদান করেননি। ফলে নবাবের বিরুদ্ধে নানামুখী ঘড়যন্ত্রে তিনি অংশহৃণ করেন। পলাশির যুক্তে মিরজাফর ও রায়দুর্লভ অন্যান্যভাবে নবাব সিরাজকে যুদ্ধ বক্ষ করার পরামর্শ দেন। তাদের কুপরামর্শে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। ফলে ক্লাইভের সৈন্যরা প্রায় বিনায়কে জয় লাভ করে। পলাশির যুক্তের পর এই বিশ্বাসঘাতক সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। বরং মিরন তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মাতের অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড হয়। ইংরেজরা তাকে রক্ষা করেন এবং তিনি কলকাতা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তত দিনে রায়দুর্লভ সর্বস্বাক্ষ ও নিঃস্ব।

ডাচ : হল্যান্ডের অধিবাসীগণ শুলন্দাজ বা ডাচ নামে পরিচিত। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আওতায় ডাচগণ ভারতবর্ষে ব্যবসা করার জন্য আসে ঘোড়শ শতকে। ২০এ মার্চ ১৬০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে এশিয়ায় ২১ বছর ব্যবসা ও উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি দেয় সে দেশের সরকার। ভারতবর্ষে এরা বহু দিন ব্যবসা করেছে, কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। তাদের আর উপনিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৬০২ সাল থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত এই কোম্পানি প্রায় দশ লক্ষ লোক ও ৪৭৮৫টি জাহাজ ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিল।

ফরাসি : ফ্রান্সের অধিবাসীগণ ফরাসি নামে পরিচিত। ফ্রাঙ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। মোগল শাসনামলে ফরাসি সরকারের নীতি অনুযায়ী এই কোম্পানি ব্যবসা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসিদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পঞ্চিচেরি ও চন্দননগরে ফরাসিদের একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই দুটি স্থানে তারা বসতি ও ব্যবসা চালিয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম : কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-কুঠি। ১৭০৬ সালে এই কুঠি নির্মিত হয়। পরে এই কুঠি দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের সম্মানে এই কুঠির নামকরণ করা হয়।

আলিঙ্গনের সক্ষি : ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং ভারতের ব্রিটিশ প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তখন কলকাতা নগরী ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা সেখানে দুর্গ স্থাপন এবং টাকশাল প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোহাম্মদ বেগ কত টাকার বিনিময়ে সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়েছিল?

ক. দশ হাজার

খ. আট হাজার

গ. ছয় হাজার

ঘ. পাঁচ হাজার

২. ‘স্বার্থাঙ্গ প্রতারকের কাপুরস্বতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. সাহসিকতা

খ. পলায়নপ্রতা

গ. ভীরুতা

ঘ. নির্দয়তা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির বাসায় জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিহত হলেন। যেসব বিপথগামী সেনাসদস্য এ কাজে নিয়োজিত ছিল তারা হাজার বহুরের শ্রেষ্ঠ মানুষকে মেরে ফেলল। বঙবন্ধু বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁকে কেউ মারতে পারে।

৩. উদ্দীপকের বিপথগামী সেনা সদস্যদের সঙ্গে ‘সিরাজউদ্দোলা’ নাটকের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?

ক. বদ্রিআলি

খ. মোহাম্মদ বেগ

গ. সাঁক্রে

ঘ. নারান

৪. উক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে—

i. নিষ্ঠুরতা

ii. কৃতঘনতা

iii. বিশ্বাসঘাতকতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহুমান

ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

ক. কোম্পানির দুষখোর ডাক্তার কে?

খ. ‘ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেমমূলক কীর্তি ‘সিরাজউদ্দোলা’ নাটকের সিরাজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ — ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘সিরাজউদ্দোলা’ নাটকের মূলভাবকে কীভাবে ধারণ করেছে তা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্তি



উপন্যাস

লালসালু
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির উপযোগী সংক্ষরণ



উপন্যাসিক-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। জীবন-সঙ্গানী ও সমাজসচেতন এ সাহিত্য-শিল্প চট্টগ্রাম জেলার শোলশহরে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এক সন্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পিতার কর্মসূলে ওয়ালীউল্লাহর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে নানাভাবে দেখার সুযোগ ঘটে তাঁর, যা তাঁর উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র-চিত্রণে প্রভৃতি সাহায্য করে। অঞ্চল বয়সে মাতৃহীন হওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু ডিপ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক ‘দি স্টেটস্ম্যান’-এর সাব-এডিটর নিযুক্ত হন এবং সাংবাদিকতার সুরে কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে উঠেন। তখন থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে করাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি কুটনৈতিক দায়িত্বে নয়াদিল্লি, ঢাকা, সিঙ্গাপুর, করাচি, জাকার্তা, বল, লক্ষন এবং প্যারিসে নানা পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কর্তৃত্ব ছিল প্যারিস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের ঢাকির থেকে অব্যাহতি নেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবরে তিনি প্যারিসে পরলোক গমন করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বাঙ্গি ও সমাজের ভেতর ও বাইরের সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্ঘাটনের বিরল কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে কুসংস্কার ও অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসে আচল্ল, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবন, অন্যদিকে তেমনি স্থান পেয়েছে মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, দীর্ঘ প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কেবল ইস্পূর্ণ কাহিনি পরিবেশন নয়, তাঁর অভিষ্ঠ ছিল মানবজীবনের মৌলিক সমস্যার রহস্য উন্মোচন।

‘নয়নচারা’ (১৯৪৬) এবং ‘দুই তৌর ও অন্যান্য গল্প’ (১৯৬৫) তাঁর গল্পগুলি এবং ‘লালসালু’ (১৯৪৮), ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪) ও কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিরীক্ষামূলক চারটি নাটকও লিখেছেন। সেগুলো হলো: ‘বহিপীর’, ‘তরঙ্গজ’, ‘উজানে মৃত্যু’ ও ‘সুড়ঙ্গ’।

সাহিত্যের রূপশৈলি : উপন্যাস

উপন্যাস আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। উপন্যাসের আকরিক অর্থ হলো উপযুক্ত বা বিশেষ রাপে আপন। অর্থাৎ উপন্যাস হচ্ছে কাহিনি-রূপ একটি উপাদানকে বিবৃত করার বিশেষ কৌশল, পদ্ধতি বা রীতি। ‘উপন্যাস’ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ novel-এর আভিধানিক অর্থ হলো : a fictitious prose narrative or tale presenting picture of real life of the men and women portrayed। অর্থাৎ উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত এমন এক বিবরণ বা কাহিনি যার ভেতর দিয়ে মানব-মানবীর জীবন্যাপনের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এভাবে বৃত্তিগত এবং আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাদান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষ বিন্যাসসহ গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় তাই উপন্যাস। যেহেতু উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য মানুষের জীবন তাই উপন্যাসের কাহিনি হয় বিশ্লেষণাত্মক, দীর্ঘ ও সম্প্রতাসঙ্গানী। বিখ্যাত ইংরেজ উপন্যাসিক E. M. Forster-এর মতে, কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ দিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত।

বিখ্যাত উপন্যাস বিশ্লেষকগণ একটি সার্থক উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. প্রট বা আখ্যান;
২. চরিত্র;
৩. সংলাপ;
৪. পরিবেশ বর্ণনা;
৫. লিখনশৈলী বা স্টাইল;
৬. লেখকের সামগ্রিক জীবন-দর্শন।



১. প্লট বা আখ্যান : উপন্যাসের ভিত্তি একটি দীর্ঘ কাহিনি। যেখানে মানব-মানবীর তথা ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শপ্ট ও শপ্টভঙ্গ, ঘৃণা-ভালোবাসা ইত্যাদি ঘটনা প্রাথম্য লাভ করে। উপন্যাসের প্লট বা আখ্যান হয় সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। প্লটের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের ত্রিয়াকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তা বাস্তব জীবনকে প্রতিফলিত করে এবং কাহিনিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তবোচিত করে তোলে।

২. চরিত্র : ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সমাজসম্পর্ক। এই সম্পর্কজাত বাস্তব ঘটনাবলি নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়। আর, ব্যক্তির আচরণ, ভাবনা এবং ত্রিয়াকাণ্ডই হয়ে উঠে উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। উপন্যাসের এই ব্যক্তিই চরিত্র বা character। অনেকে মনে করেন, উপন্যাসে ঘটনাই মুখ্য, চরিত্র সৃষ্টি গোপ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ঘটনা ও চরিত্র পরম্পরার নিরপেক্ষ নয়, একটি অন্যটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহৎ উপন্যাসিক এমনভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেন যে, তারা হয়ে উঠে পাঠকের চেনা জগতের বাসিন্দা বা অতি পরিচিতজন। উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে একজন লেখকের অধিষ্ঠিত হয় দ্বন্দ্বময় মানুষ। ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সুনীতি-দুরীতি প্রভৃতির দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাসেই একজন মানুষ সমগ্রতা অর্জন করে এবং এ ধরনের মানুষই চরিত্র হিসেবে সার্ধক বলে বিবেচিত হয়।

৩. সংলাপ : উপন্যাসের ঘটনা প্রাণ পায় চরিত্রগুলোর পারম্পরিক সংলাপে। যে কারণে উপন্যাসিক সচেষ্ট থাকেন স্থান-কাল অনুযায়ী চরিত্রের মুখে ভাষা দিতে। অনেক সময় বর্ণনার চেয়ে চরিত্রের নিজের মুখের একটি সংলাপ তার চরিত্র উপলক্ষ্যে জন্য বহুল পরিমাণে শক্তিশালী ও অব্যর্থ হয়। সংলাপের দ্বারা ঘটনাস্তোত্র উপস্থাপন করে লেখক নির্লিপ্ত থাকতে পারেন এবং পাঠকের বিচার-বুদ্ধির প্রকাশ ঘটাতে পারেন। সংলাপ চরিত্রের বৈচিত্র্যময় মনস্তুকে প্রকাশ করে এবং উপন্যাসের বাস্তবতাকে নিশ্চিত করে তোলে।

৪. পরিবেশ বর্ণনা : উপন্যাসের কাহিনিকে হতে হয় বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাসযোগ্য। উপন্যাসিক উপন্যাসের দেশ-কালগত সত্যকে পরিস্কৃতিত করার অভিপ্রায়ে পরিবেশকে নির্মাণ করেন। পরিবেশ বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রের জীবনযাত্রার ছবিও কাহিনিতে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই পরিবেশ মানে কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়; স্থান-কালের স্বাভাবিকতা, সামাজিকতা, প্রচীনত্ব ও ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক জীবন-পরিবেশ। দেশ-কাল ও সমাজের রীতি-নীতি, আচার থ্রু ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠে উপন্যাসের প্রাণময় পরিবেশ।

৫. শৈলী বা স্টাইল : শৈলী বা স্টাইল হচ্ছে উপন্যাসের ভাষাগত অবয়ব সংস্থানের ভিত্তি। লেখকের জীবনসূচি ও জীবনসূচির সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাসের বর্ণনা, পরিচর্যা, পটভূমিকা উপস্থাপন ও চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে অনিবার্য ভাষাশৈলীর প্রয়োগই যেকোনো উপন্যাসিকের কাম্য। উপজীব্য বিষয় ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই উপন্যাস হয়ে উঠে সমগ্র, যথার্থ ও সার্ধক আবেদনযোগ্য। উপন্যাসের লিখনশৈলী বা স্টাইল নিঃসন্দেহে যেকোনো লেখকের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

৬. লেখকের সামগ্রিক জীবন-দর্শন : মানবজীবনসংক্রান্ত যে সত্যের উদ্ঘাটন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পরিস্কৃত হয় তাই লেখকের জীবনদর্শন। আমরা একটি উপন্যাসের মধ্যে একই সঙ্গে জীবনের চিত্র ও জীবনের দর্শন— এই দুইকেই খুঁজি। এর ফলে সার্ধক উপন্যাস পাঠ করলে পাঠক মানবজীবনসংক্রান্ত কোনো সত্যকে গভীরভাবে উপলক্ষ্য করতে পারেন। উপন্যাসে জীবনদর্শনের অনিবার্যতা তাই স্বীকৃত।

উপন্যাসের উত্তর

গল্প শোনার আছহ মানুষের সুস্থাচীন। প্রাচীনতিহাসিক কাল থেকে মানুষের এই আগ্রহের ফলেই কাহিনির উত্তর। তখন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে মুখে মুখে প্রচলিত গল্প-কাহিনির বিষয় হয়ে উঠে দেব-দেবী, পুরোহিত, গোষ্ঠীপতি ও রাজাদের কীর্তিকাণ্ড। লিপিপির উত্তরাবল, ব্যবহার ও মুদ্রণযন্ত্রের আবিক্ষার হতে বহু শতক পেরিয়ে যায়। ততদিনে মানবসমাজে সর্বময় কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয় সন্তাট, পুরোহিত ও ভূষামীদের। ফলে দেবতা ও রাজ-রাজড়ার কাহিনিই লিপিবন্ধ হতে থাকে ছদ্ম ও অলংকারমণ্ডিত ভাষায়। এভাবেই ত্রয়ে কাব্য, মহাকাব্য ও নাটকের সৃষ্টি।

দৈনন্দিন জীবনযাপনের ভাষায় তথা গদ্যে কাহিনি লেখার উত্তর ঘটে ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে। মুখে মুখে রচিত কাহিনি যেমন রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, জাতকের গল্প ইত্যাদি পরে গদ্যে লিপিবন্ধ হলেও মানুষ এবং মানুষের জীবন ওইসব কাহিনির প্রধান বিষয় হতে পারেন। কাব্য তখনো সমাজে ব্যক্তি মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়নি, গড়ে উঠেনি তার ব্যক্তিত্ব; ফলে কাহিনিতে ব্যক্তির প্রাথম্য লাভের উপায়ও ছিল অসম্ভব।

ইউরোপে যখন বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ শুরু হয় তখন থীরে মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটতে থাকে। প্রিষ্ঠীয় চৌলো-মোলো শতকে ইউরোপীয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভরতা, ইহজাগতিকতা এবং মানবতাবাদ। ক্রমে যা হয়ে ওঠে শিক্ষিত সমাজের সচেতন জীবন্যাপনের অঙ্গ। রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিছিন্ন করে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠিত হলে বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতি বাধাধীন হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হলে সমাজে বণিক শ্রেণির শুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং রাজা, সামন্ত-ভূষামী এবং পুরোহিতদের সামাজিক শুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভাগ্যনির্ভরতা পরিহার করে মানুষ হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী, অধিকার-সচেতন এবং আত্ম প্রতিষ্ঠায় উন্নুৎ। এভাবে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র চর্চার পথ খুলে দেয়। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে শুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিমানুষ এবং ব্যক্তির জীবনই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এভাবেই ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ পরিবর্তনের পটভূমিকাতেই উত্তোলন ও বিকাশ ঘটে উপন্যাসের।

অবশ্য এর পূর্ববর্তী কয়েক শতকেও পৃথিবীর নানা দেশে রাচিত হয়েছে বিভিন্ন কাহিনিগুহ, যাতে ব্যক্তির জীবন, তার অভিজ্ঞতা, তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, তার আশা-হাতাশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো—‘আলিফ লায়লা ওয়া লায়লানে’, ‘ডেকামেরন’, ‘ডন কুইকজোট’ ইত্যাদি।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উনিশ শতক খুবই ভাগ্যবহু। এ সময়ে লেখা হয়েছে পৃথিবীর বেশ কিছু শৈলী উপন্যাস। যেমন: ফ্রান্সের স্তানালের ‘ক্ষারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক’, এমিল জোলার ‘দি জারমিনাল’; ব্রিটেনের হেনরি ফিল্ডিং-এর ‘টম জোনস’, চার্লস ডিকেন্সের ‘এ টেল অফ টু সিটিজ’, রাশিয়ার লিও তলস্তয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’, ফিলোদের দন্তয়াভক্ষির ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’ ইত্যাদি। উপন্যাস-শিল্পকে বিকাশের শীর্ষ ত্রয়ে পৌঁছে দেয়া এসব মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে যুক্ত করে বৃহৎ জগৎ ও জীবনের সঙ্গে।

উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

উপন্যাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কখনও তা কাহিনি-নির্ভর, কখনও চরিত্র-নির্ভর; কখনও মনস্তান্ত্রিক, কখনও বজ্জব্যধর্মী। বিষয়, চরিত্র, প্রবণতা এবং গঠনগত সৌর্কর্যের ভিত্তিতে উপন্যাসকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন: সামাজিক উপন্যাস : যে উপন্যাসে সামাজিক বিষয়, গীতি-নীতি, ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়। বক্ষিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকাণ্ডের উইল’, রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’, শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’, নজিরের রহমানের ‘আনোয়ারা’, কাজী ইমদাদুল হকের ‘আবদুল্লাহ’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসের উদাহরণ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : জাতীয় জীবনের শুরুত্বপূর্ণ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের আশ্রয়ে যখন কোনো উপন্যাস রচিত হয় তখন তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক নতুন নতুন ঘটনা বা চরিত্র সূজন করে কাহিনিতে গতিময়তা ও প্রাণসংঘর্ষ করতে পারেন কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। বক্ষিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধৰ্মপাল’, মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদ-সিঙ্গু’, সত্যেন সেনের ‘অভিশঙ্ক নগরী’ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে বিবেচিত। রূপ ভাষায় লিখিত তলস্তয়ের কালজয়ী গুহ ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’, ভাসিলি ইয়ানের ‘চেঙ্গিস খান’ বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মনস্তান্ত্রিক উপন্যাস : মনস্তান্ত্রিক উপন্যাসের প্রধান আশ্রয় পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের ঘাত-সংঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। চরিত্রের অন্তর্জগতের জটিল রহস্য উদ্ঘাটনই উপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য। আবার সামাজিক উপন্যাস ও মনস্তান্ত্রিক উপন্যাসে নৈকট্যও লক্ষ করা যায়। সামাজিক উপন্যাসে যেমন মনস্তান্ত্রিক ঘাত-প্রতিঘাত থাকতে পারে, তেমনি মনস্তান্ত্রিক উপন্যাসেও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত থাকতে পারে। মনস্তান্ত্রিক উপন্যাসে কাহিনি অবলম্বন মাত্র, প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে মানবননের জটিল দিকগুলো সার্থক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। বিশ্বসাহিত্যে ফরাসি লেখক শুন্তান্ত্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র ‘চাঁদের অমাবস্যা’ ও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ মনস্তান্ত্রিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ।



রাজনৈতিক উপন্যাস : সমাজ-বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি যে রাজনৈতিক ঘটনাবলি, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং রাজনীতি-সংগঠনে চারিদের কর্মকাণ্ড যে উপন্যাসে প্রাথম্য লাভ করে তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে। এ ধরনের উপন্যাসে রাজনৈতিক ক্ষেত্র-বিক্ষেপ, আন্দোলন-সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপুল পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’, শরৎচন্দ্রের ‘পথের দারী’, গোপাল হালদারের ‘অয়ী’ উপন্যাস—‘একদা’, ‘অন্যদিন’, ‘আর একদিন’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বড় ও বারাপাতা’, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ ও ‘চোড়াই চরিতমানস’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিহ্ন’, শহীদুল্লা কার্যসারের ‘সংশঙ্ক’, জহির রায়হানের ‘আরেক ফাল্লুন’, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’, আহমদ ছফার ‘ওক্কার’ প্রভৃতি।

আঞ্চলিক উপন্যাস : অঞ্চল বিশেষের মানুষ ও তাদের যাপিত জীবন এবং স্থানিক রং ও স্থানিক পরিবেশবিশ্বেতো জীবনাচরণ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা হয় তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’, আবৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, শামসুদ্দীন আবুল কালামের ‘কাঁশবলের কল্যা’ ও ‘সমুদ্রবাসর’ প্রভৃতি নাম একেত্রে স্মরণীয়।

রহস্যোপন্যাস : রহস্যোপন্যাসে ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য রহস্যময়তা সৃষ্টি এবং উপন্যাসের উপাত্ত পর্যবেক্ষণ তা ধরে রাখা। এ জাতীয় উপন্যাসে রহস্য উদঘাটনের জন্য পাঠক রূপস্বাস অপেক্ষায় থাকে। দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, নীহাররঞ্জন গুণ্ঠ, কাজী আনোয়ার হোসেন প্রমুখ লেখক বাংলা ভাষায় বহু রহস্যোপন্যাস লিখেছেন। ফেলুদা সিরিজ, কিরীটী অমনিবাস, মাসুদ রানা সিরিজ, কুয়াশা সিরিজ প্রভৃতি এ জাতীয় উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস : মানুষের মনোলোকে বর্তমানের অভিজ্ঞতা, অভীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা এক সঙ্গে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের ভাষিক বর্ণনা দিয়ে চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস গঠিত হয়। আইরিশ লেখক জেমস জ্যোসের ‘ইউলিসিস’ এমনই একটি পৰিখ্যাত উপন্যাস। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস হিসেবে পরিচিত।

আত্মজৈবনিক উপন্যাস : ঔপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাট-প্রতিঘাতকে যখন আন্তরিক শিল্পকুশলতায় উপন্যাসে রূপদান করেন তখন তাকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলে। এ ধরনের উপন্যাসে লেখকের ঔপন্যাসিক কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাঁর ব্যক্তি জীবনের নানা অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘটনাসূত্র। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ এ ধরনের উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

রূপক উপন্যাস : সাহিত্যের রূপকাণ্ডয় কোনো ব্যক্তিগত কোনো বিশেষ ব্যক্তিক্রমধর্মী রূপকাণ্ডয়ী বক্তব্যের সাহায্যে উপন্যাসের শিল্পরূপ প্রদান করেন। এ ধরনের উপন্যাসকে রূপক উপন্যাস বলা হয়। প্রথ্যাত ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েলের রূপক উপন্যাস ‘অ্যানিমেল ফার্ম’— যেখানে পাত্রপাত্রী মানুষ নয় জন্ম-জনোয়ার। রূপক উপন্যাস সৃষ্টিতে শক্তিকুণ্ডলী পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর ‘ক্রীতদাসের হাসি’, ‘সমাগম’, ‘রাজা উপাধ্যান’, ‘পতঙ্গ পিঞ্জর’ রূপক উপন্যাসের সার্থক দৃষ্টান্ত।

বাংলা উপন্যাসের উত্তর ও বিকাশ

বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার সূচনা ঘটে উনিশ শতকে। টেকচাঁদ ঠাকুর ছহনামে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরে দুলাল’ নামের কাহিনিপঞ্চ। আধুনিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ, যেমন— জীবনযাপনের বাস্তবতা, ব্যক্তিচরিত্বের বিকাশ এবং মানবিক কাহিনি ইত্যাদি এ উপন্যাসে ফুটে ওঠে এবং একই সঙ্গে কিছু সীমাবদ্ধতাও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছরে এ দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা উপন্যাস পাঠের উপযোগী জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের আগমনকে ক্রমশ অনিবার্য করে তোলে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখেন বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫)। কাহিনি বিন্যাস এবং চরিত্রিক্রিয়াসহ উপন্যাস রচনার শৈলীক কৌশল সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনিই প্রথম জীবনের গভীর দর্শন-পরিস্রূত ব্যক্তি-মানুষের কাহিনি উপস্থাপন করেন।

বকিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই অতীচারী কল্পনার প্রাধান্য এবং সমকালীন জীবনের স্বল্প উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কেবল ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাস দুটিতে সমকালীন জীবন ও বাস্তবতা মোটামুটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের জটিল সমস্যা ও তীব্র সংকটের কাহিনি তিনি ওই দুই উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গ থাকা সত্ত্বেও বকিমচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসের বিকাশের পথ উন্মোচন করেছেন।

বকিম-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রধান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি সামাজিক, পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিজীবনের সংকটমুখ্য কাহিনি রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘চোখের বালি’, ‘গোরা’, ‘যোগযোগ’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘শেষের কবিতা’। তিনিই প্রথম ক্লাপায়ণ করেন প্রকৃত নাগরিক জীবন। উদার মানবতাবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কার নয়—মানব জীবন অনেক বেশি মূল্যবান—এই বিবেচনা তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিতি। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ‘গোরা’, ‘চার অধ্যায়’ প্রভৃতি উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি বৃহৎ জীবনের ধারাতীয় প্রসঙ্গই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে বাংলা উপন্যাস তুমুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আর জনপ্রিয়তম উপন্যাসিক হয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসের বিষয় বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু সমাজের গ্রামীণ ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। তাঁর অন্তরঙ্গ ভাষা এবং অনবদ্য বর্ণনা-কোশল বাংলা সাহিত্যে বিরল। সামাজিক সংস্কারের পীড়নে নারীর অসহায়তার কর্মণ ত্রিত অঙ্কনে তিনি অবিতীয়। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সামাজিক বাস্তবতার পাশাপাশি মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছাসংজ্ঞাত মানব মনের জটিলতা পূর্খানুপূর্খভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ‘গৃহদাহ’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘চরিত্রাদীন’ প্রভৃতি উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সময়ে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বাস্তবতা দ্রুত বদলে যায়। মানুষের পারিবারিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক সংকট। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্বাচক প্রভাব এবং অন্যদিকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেরণা সাধারণ মানুষকে যেমন করে তোলে অস্ত্র তেমনি তাকে করে তোলে অধিকার-সচেতন। এই নতুন সামাজিক বাস্তবতায় নতুন দিগন্ত সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে ঝুঁক হন নতুন ধারার কয়েকজন লেখক। এঁরা মানুষের মনোভাবের জটিল রহস্য সন্ধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের কাছে সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে সমাজের দরিদ্র এবং অবজ্ঞাত মানুষের জীবন। এঁরা হলেন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনি লেখক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রধান উপন্যাসিক হিসেবে বিবেচিত হন। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’-‘অপরাজিত’, তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’-‘পঞ্চগ্রাম’, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মনাভীর মাঝি’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এক ঐতিহাসিক পটভূমিতেই বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, মোজাফেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, নজিরের রহমান প্রযুক্ত লেখকের আবির্ভাব ঘটে। বিশ শতকের প্রথমার্দের মধ্যে আবির্ভূত হন কাজী আবদুল গুদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হৃষায়ন কবীর প্রযুক্ত। ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। নতুন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এখানে সাহিত্য সাধনা নতুন মাত্রা লাভ করে। সূচনায় বাংলাদেশের উপন্যাস, আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার অনুসারী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শক্তিক ওসমান, আবু রফিদু প্রযুক্ত লেখকের হাত ধরে এগিয়ে চলে। উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় ব্যক্তি, সমাজ ও সমস্যা জীবনের বিশ্লেষণমূলক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলটি ছিল পাকিস্তানের এক ধরনের উপনিবেশ। ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবন বিকশিত হলেও গ্রামীণ জীবন ছিল পশ্চাত্পদ। অঙ্গ কুসংস্কার, ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব, দারিদ্র্যসহ নানা সমস্যায় বিপন্ন ও বিপর্যস্ত ছিল মানুষের জীবন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ও বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যন্তরের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় নতুন উদ্দীপনা। নাগরিক জীবনে যেমন লাগে আধুনিকতার ছেঁয়া তেমনি শেকড়-সঙ্কান্তি গ্রামীণ জীবনেও সৃষ্টি হয় নবতর উদ্দীপনা। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উপন্যাসিকগণ রচনা করেন নানা ধরনের উপন্যাস। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের নাম দেয়া হলো :



ଆବୁଳ ଫଜଲେର ‘ରାଜୀ ପ୍ରଭାତ’, ସତ୍ୟନ ସେନେର ‘ଅଭିଶଙ୍କୁ ନଗରୀ’, ଆବୁ ଜାଫର ଶାମସୁଦ୍ଦୀନେର ‘ପଦ୍ମା ମେଘନା ସମୁନା’, ଶ୍ଵେତକତ ଓ ସମାନେର ‘ଜନନୀ’ ଓ ‘କ୍ରୀଡାଦେର ହାସି’, ସୈୟଦ ଓୟାଲୀଉଟ୍ରାହ୍ର ‘ଲାଲସାଲୁ’, ‘ଚାଦେର ଅମାବସ୍ୟ’ ଓ ‘କାନ୍ଦୋ ନନ୍ଦୀ କାନ୍ଦୋ’, ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ କାଯାସାରେର ‘ସଂଶଙ୍କକ’ ଓ ‘ସାରେଂ ବଡ଼’, ସରଦାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠନ୍ଦୀନେର ‘ଅମେକ ସୂର୍ଯେର ଆଶା’, ଶାମସୁଦ୍ଦୀନ ଆବୁଳ କାଲାମେର ‘କାଶବନେର କନ୍ୟା’, ରଣ୍ଧିନୀ କରିମେର ‘ଉତ୍ତମ ପ୍ରକର୍ଷ’, ଜହିର ରାଯାହାନେର ‘ହାଜାର ବହର ଧରେ’, ଆନୋଯାର ପାଶର ‘ରାଇଫେଲ ରୋଟି ଆପରାତ’, ଆବୁ ଇସହାକେର ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଦୀଘଲ ବାଡ଼ି’, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଆଲ ଆଜାଦେର ‘କରଣଫୁଲୀ’ ଓ ‘ତେଇଶ ନୟର ତୈଳଚିତ୍ର’, ସୈୟଦ ଶାମସୁଲ ହକେର ‘ବୃକ୍ଷ ଓ ବିଦ୍ୟେହିଗପ’, ଶ୍ଵେତକତ ଆଲୀର ‘ପ୍ରଦୋଷେ ଥାକୁତଜନ’, ଆହମଦ ଛକାର ‘ଓକ୍କାର’, ହାସାନ ଆଜିଜୁଲ ହକେର ‘ଆଶୁନପାର୍ଥି’, ମାହ୍ୟୁଦୁଲ ହକେର ‘ଜୀବନ ଆମାର ବୋନ’, ରିଜିଯା ରହମାନେର ‘ବେଂ ଥେକେ ବାଞ୍ଗା’, ଆଖତାରଙ୍ଗଜାମାନ ଇଲିଆସେର ‘ଚିଲେକୋଠାର ସେପାଇ’ ଓ ‘ଖୋଯାବନାମ’, ସେଲିନା ହେସେନେର ‘ପୋକାମାକଡ଼େର ଘରବସତି’ ଓ ‘ହାଙ୍ଗର ନନ୍ଦୀ ପ୍ରେନେଡ’, ହୃମୟନ ଆହମେଦେର ‘ନନ୍ଦିତ ନରକେ’ ଓ ‘ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ଜନନୀର ଗଲ୍ଲ’ ଏବଂ ଶହୀଦୁଲ ଜହିରେର ‘ଜୀବନ ଓ ରାଜନୈତିକ ବାନ୍ଧବତା’ ଇତ୍ୟାଦି ।

‘ଲାଲସାଲୁ’-ର ପ୍ରକାଶତଥ୍ୟ

‘ଲାଲସାଲୁ’ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ ୧୯୪୮ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ । ଢାକା-ର କମରେଡ ପାବଲିଶାର୍ସ ଏଟି ପ୍ରକାଶ କରେ । ପ୍ରକାଶକ ମୁହାମ୍ମଦ ଆତାଉଲ୍ଲାହ । ୧୯୬୦ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଢାକାର କଥାବିତାନ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥେକେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ । ଏରପର ୧୯୬୦ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ମଧ୍ୟେଇ ଉପନ୍ୟାସଟିର ସର୍ବ ସଂକ୍ରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ । ୧୯୮୧ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ମଧ୍ୟେଇ ଉପନ୍ୟାସଟିର ଦଶମ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

୧୯୬୦ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସେର ଉତ୍ତର ଅନୁବାଦ କରାଚି ଥେକେ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ ‘Lal Shalu’ ନାମେ । ଅନୁବାଦକ ଛିଲେନ କଲିମୁଲ୍ଲାହ ।

୧୯୬୧ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ ‘ଲାଲସାଲୁ’ର ଫରାସି ଅନୁବାଦ । L’arbre sans racines ନାମେ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରହିତ ଅନୁବାଦ କରେନ ସୈୟଦ ଓୟାଲୀଉଲ୍ଲାହ -ର ସହସମୀକ୍ଷା ଅୟାନ-ମାରି-ଥିବୋ । ପ୍ଯାରିସ ଥେକେ ଏ ଅନୁବାଦଟି ପ୍ରକାଶ କରେ Editions du Seuil ପ୍ରକାଶନୀ । ୧୯୬୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଏ ଅନୁବାଦଟିର ପରିମାର୍ଜିତ ଓ ପରିବର୍ଧିତ ସଂକ୍ରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ ।

୧୯୬୭ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ ‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସେର ଇଂରେଜି ଅନୁବାଦ । ‘Tree without Roots’ ନାମେ ଲଭନେର Chatto and Windus Ltd. ଏଟି ପ୍ରକାଶ କରେନ । ଉପନ୍ୟାସିକ ସୈୟଦ ଓୟାଲୀଉଲ୍ଲାହ ନିଜେଇ ଏହି ଇଂରେଜି ଅନୁବାଦ କରେନ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସଟି ଜାର୍ମାନ ଓ ଚେକ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଯ ଅନ୍ତିମ ଅନୁବାଦ ହେବାର ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ।

ସୈୟଦ ଓୟାଲୀଉଲ୍ଲାହର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ‘ଲାଲସାଲୁ’ । ରଚନାଟିକେ ଏକଜନ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲେଖକେର ଦୁଃଖାହସୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସାର୍ଥକ ଫସଲ ବଲେ ବିବେଳା କରା ହୟ । ଢାକା ଓ କଲକାତାର ମଧ୍ୟବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ଜୀବନ ତଥା ନାନା ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତେ ଅଛିର ଓ ଚନ୍ଦଳ । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ତେତାଣ୍ଟିଶେର ମସତର, ସାମ୍ପନ୍ଦାଯିକ ଦାଙ୍ଗା, ଦେଶବିଭାଗ, ଉଦ୍ଧାର ସମସ୍ୟା, ଆବାର ନତୁନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଗଢ଼େ ତୋଳାର ଉଦ୍ଦିପନା ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ରକମ ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ତଥା ବିଚିତ୍ରମୁଖୀ ଜିଲ୍ଲାତାଯ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଉଜ୍ଜୀବିତ । ନବୀନ ଲେଖକ ସୈୟଦ ଓୟାଲୀଉଲ୍ଲାହ, ଏହି ଚେନା ଜଗତକେ ବାଦ ଦିୟେ ତାଁର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସେର ଜନ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପଟ୍ଟଭୂମି ଓ ସମାଜ-ପରିବେଶ ବେହେ ନିଲେନ । ଆମାଦେର ଦେଶ ଓ ସମାଜ ମୂଳତ ଗ୍ରାମପ୍ରଧାନ । ଏଦେଶର ବେଶିର ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନଗୋଟୀର ଜୀବନ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରେ ଅଭିବାହିତ ହେବେ ନାନା ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତଥାକୁତି ଅନାଧୁନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକେ ଆଶ୍ରୟ କରେ । ଏହି ସମାଜ ଥେବେଇ ସୈୟଦ ଓୟାଲୀଉଲ୍ଲାହ ବେହେ ନିଲେନ ତାଁର ଉପନ୍ୟାସର ପଟ୍ଟଭୂମି ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ; ବିଷୟ ସାମାଜିକ ବୀତି-ଜୀବି, ଓ ପ୍ରାଚିଲିତ ଧାରଣା ବିଶ୍ୱାସ; ଚରିତ୍ରମୂହ୍ୟ ଏକଦିକେ କୁସଂକ୍ରାତାଚିନ୍ତା ଧର୍ମଭିର, ଶୋଷିତ, ଦରିଦ୍ର ଧ୍ରାମବାସୀ, ଅନ୍ୟଦିକେ ଶତ, ପ୍ରାତାରକ, ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଶୋଷକ-ଭୂଷାୟୀ ।

‘ଲାଲସାଲୁ’ ଏକଟି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ । ଏର ବିଷୟ : ଯୁଗ-ଯୁଗ ଧରେ ଶେକଡ଼ଗାଡ଼ା କୁସଂକ୍ରାତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭୌତିକ ସଜେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକାଙ୍କାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ଵ । ଗ୍ରାମବାସୀର ସରଲତା ଓ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସେର ସୁଯୋଗ ନିଯେ ଭଣ୍ଡ ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀ ମଜିଦ ପ୍ରତାରଣାଜାଲ ବିଷ୍ଟାରେ ମାଧ୍ୟମେ କୀଭାବେ ନିଜେର ଶାସନ ଓ ଶୋଷଣେ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ତାରଇ ବିବରଣେ ସମ୍ବନ୍ଧ ‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସ । କାହିନିଟି ଛୋଟ, ସାଧାରଣ ଓ ସାମାନ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରହନ ଓ ବିନ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ । ଲେଖକ ସାଧାରଣ ଏକଟି ଘଟନାକେ ଅସାମାନ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱସାୟୀ ଆଲୋ ଫେଲେ ତାତ୍ପର୍ୟ-ମଣିତ କରେ ତୁଳେଛେ ।



শ্রাবণের শেষে নিরাক পড়া এক মধ্যাহ্নে মহবতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের নাটকীয় দৃশ্যটির মধ্যেই রয়েছে তার ভঙ্গামি ও প্রতারণার পরিচয়। মাছ শিকারের সময় তাহের ও কান্দের দেখে যে, মতিগঞ্জ সড়কের ওপর একটি অপরিচিত লোক মোনাজারের ভঙ্গিতে পাথরের মূর্তির মতোন দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখা যায়, ওই লোকটিই গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সমবেত গ্রামের মানুষকে তিরক্ষার করছে, ‘আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হু। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?’ লালৌকিকতার অবতারণা করে মজিদ নামের ওই ব্যক্তি জানায় যে, পিরের স্থানে মাজার তদারকির জন্যে তার এ গ্রামে আগমন। তার তিরক্ষার ও স্থানের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শুভায় এমন বিগলিত হয় যে তার প্রতিতি হুকুম তারা পালন করে গভীর আঘাতে। গ্রামপ্রান্তের বাঁশবাড়সংলয় কবরটি দ্রুত পরিচ্ছন্ন করা হয়। বালরওয়ালা লালসালুতে ঢেকে দেওয়া হয় কবর। তারপর আর পিছু ফেরার অবকাশ থাকে না। কবরটি অচিরেই মাজারে এবং মজিদের শক্তির উৎসে পরিষত হয়। যথারীতি সেখানে আগরবাতি, মোবাতি জুলে; ভক্ত আর কৃপাত্মার্থীরা সেখানে টাকা পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন। কবরটিকে মোদাচ্ছের পিরের বলে শনাক্তকরণের মধ্যেও থাকে মজিদের সুগভীর চার্তুর্য। মোদাচ্ছের কথাটির অর্থ নাম-না-জানা। মজিদের স্বগত সংহ্লাপ থেকে জানা যায়, শস্যহীন নিজ অঞ্চল থেকে ভাগ্যাবেষণে বেরিয়ে-পড়া মজিদ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এমন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসলে এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের আধিগত্য কিন্তুরের ঘটনা এ দেশের গ্রামাঞ্চলে বহুকাল ধরে বিদ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামীণ সমাজের একটি শুল্কত্বপূর্ণ দিক যথাযথভাবেই এখানে তুলে ধরেছেন।

মাজারের আয় দিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মজিদ ঘরবাড়ি ও জমিজমার মালিক হয়ে বসে এবং তার মনোভূমির এক অনিবার্য আকাঙ্ক্ষার শক্তি-সমর্থ লম্বা চাওড়া একটি পিধুবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে। আসলে স্ত্রী রহিমা ঠাণ্ডা ভীত মানুষ। তাকে অনুগত করে রাখতে কোনো বেগ পেতে হয় না মজিদের। কারণ, রহিমার মনেও রয়েছে গ্রামবাসীর মতো তীব্র খোদাভীতি। স্বামী যা বলে, রহিমা তাই মনেঝাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। রহিমার বিশ্বাস তার স্বামী লালৌকিক শক্তির অধিকারী। প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে সাথে মজিদ ধর্মকর্মের পাশাপাশি সমাজেরও কর্তা-ব্যক্তি হয়ে ওঠে। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপদেশ দেয়- গ্রাম্য বিচার-সালিশিতে সে-ই হয়ে ওঠে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রধান ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে মাতব্বর খালেক ব্যাপারীই তার সহায়ক শক্তি। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবনেও নাক গলাতে থাকে সে। তাহেরের বাপ-মার মধ্যেকার একান্ত পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে তাহেরের বাপের কর্তৃত্ব নিয়েও সে প্রশংস তোলে। নিজ মেয়ের গায়ে হাত তোলার অপরাধে হুকুম করে মেয়ের কাছে মাফ চাওয়ার এবং সেই সঙ্গে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্ধি দেয়ার। অপমান সহ্য করতে না পেরে তাহেরের বাপ শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হয়। খালেক ব্যাপারীর নিঃস্তান প্রথম স্ত্রী আমেনা সজ্ঞান কামনায় অধীর হয়ে মজিদের প্রতিদৰ্শী পিরের প্রতি আস্তাশীল হলে মজিদ তাকেও শাস্তি দিতে পিছপা হয় না। আমেনা চরিত্রে কলক আরোপ করে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করে মজিদ। কিন্তু তবু মাজার এবং মাজারের পরিচালক ব্যক্তিটির প্রতি আমেনা বা তার স্বামী কারুরই কোনো অভিযোগ উঠাপিত হয় না।

গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মজিদের মাজারকেন্দ্রিক পশ্চাত্পদ জীবন ধারা থেকে সরে যেতে না পারে, সে জন্য সে শিক্ষিত যুবক আকাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে আকাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। মজিদ এমনই কুট-কৌশল প্রয়োগ করে যে আকাস গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক গ্রাম, সমাজ ও মানুষের বাস্তব-চিত্র ‘লালসালু’ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘লালসালু’র প্রধান উপাদান সমাজ-বাস্তবতা। গ্রামীণ সমাজ এখানে অঙ্ককারাচ্ছন্ন স্থবির, যুগ্মযুগ ধরে এখানে সক্রিয় এই অদ্যশ্য শৃঙ্খল। এখানকার মানুষ ভাগ্য ও অলৌকিকত্ব গভীরভাবে বিশ্বাস করে। দৈবশক্তির লীলা দেখে নিরাকৃণ ভয় পেয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখে নয়তো ভঙ্গিতে আপুত হয়। কাহিনির উন্মোচন-মুহূর্তেই দেখা যায়, শস্যের চেয়ে টুপি বেশি। যেখানে ন্যাংটো ধাকতেই বাচ্চাদের আমসিপারা শেখানো হয়। শস্য যা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সুতরাং ওই গ্রাম থেকে ভাগ্যের সঙ্গানে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে-গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে চায় সেই গ্রামেও একইভাবে কুসংস্কার আর অঙ্কবিশ্বাসের জয়-জয়কার। এ এমনই এক সমাজ যার রঞ্জে রঞ্জে কেবলই শোষণ আর শোষণ—কখনো ধর্মীয়, কখনো অর্থনৈতিক। প্রতারণা, শর্তাত আর শাসনের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শেকড় জীবনের শেষপ্রাপ্ত পর্যন্ত পরতে পরতে ছড়ানো। আর ওই সব শেকড় দিয়ে প্রতিনিয়ত শোষণ করা হয় জীবনের প্রাণরস। আনন্দ, প্রেম, প্রতিবাদ, সততা— এই সব বোধ এবং বুদ্ধি ওই অদ্যশ্য দেয়ালে ঘেরা সমাজের তেতরে প্রায়শ ঢাকা পড়ে থাকে। এই কাজে ভূস্বামী, জোতদার এবং ধর্মব্যবসায়ী একজন আর একজনের সহযোগী।



কারণ স্বার্থের ব্যাপারে তারা একটা- পথ তাদের এক। একজনের আছে মাজার, অন্যজনের আছে জমিজোত প্রভাব প্রতিপন্থি। দেখা যায়, অন্য কোথাও নয় আমাদের চারপাশেই রয়েছে এরূপ সমাজের অবস্থান। বাংলাদেশের যে-কোনো প্রান্তের গ্রামাঞ্চলে সমাজের ভেতর ও বাইরের চেহারা যেন এরূপ একই রকম।

আবার এই বদ্ধ, শৃঙ্খলিত ও স্থবির সামাজিক অবস্থার একটি বিপরীত দিকের চিত্রও আছে। তা হলো, মানুষের প্রাণধর্মের উপস্থিতি। মানুষ ভালোবাসে, স্নেহ করে; কামনা-বাসনা এবং আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়। নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বাসনার কারণে সে নিজেকে আলোকিত ও বিকশিত করতে চায়। সংক্ষার, অক্ষবিশ্বাস ও ডয়ের বাধা ছিন্ন করে সহজ প্রাণধর্মের প্রেরণায় আত্মসংক্ষির জাগরণ ঘটাতে চায়। কোনো ক্ষেত্রে যদি সাফল্য ধরা না-ও দেয় তবু কিন্তু স্থপ্ত ও আকাঙ্ক্ষা বেঁচে থাকে। প্রজন্ম পরম্পরায় চলতে থাকে তার চাওয়া ও না-পাওয়ার সাংঘর্ষিক রক্ষণয় হৃদয়ার্তি। এটা অব্যাহত থাকে মানব সম্পর্কের মধ্যে, দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে, এমনকি ব্যক্তি ও সমষ্টির মনোলোকেও।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মানবতাবাদী লেখক। মানব-মুক্তির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রে সক্রিয়। এ দেশের মানুষের সুসংগত ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অন্তরায়গুলিকে তিনি তাঁর রচিত সাহিত্যের পরিমণ্ডলেই চিহ্নিত করেছেন; দেখিয়েছেন কুসংস্কারের শক্তি আর অঙ্গবিশ্বাসের দাপট। স্বার্থীষ্বেষী ব্যক্তি ও সমাজ সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে বিজ্ঞাপ্ত ও ভীতির মধ্যে রেখে শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখে তার অনুপুর্জ্ঞ বিবরণ তিনি দিয়েছেন ‘লালসালু’ উপন্যাসে। ধর্মবিশ্বাস বিষ্ণু তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য নয়— তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ধর্ম-ব্যবসায় এবং ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, গোঢ়ায়ি ও অঙ্গাতৃ। তিনি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেন যেখানে ‘শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাহা বেশি’। তিনি মনে করেন, ধর্ম মানুষকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, পারস্পারিক মমতার পথে নিয়ে এসেছে; কিন্তু ধর্মের মূল ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে দিয়েছে কুসংস্কার এবং অঙ্গবিশ্বাস। এ কারণে মানুষের মন আলোড়িত, জাগ্রত ও বিকশিত তো হয়েইনি বরং দিন দিন হয়েছে দুর্বল, সংকীর্ণ এবং ভীত। স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণির লোক যে কুসংস্কার ও অঙ্গবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান ভঙ্গায়ি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আঘাত তার বিকান্দে। লেখক সামাজিক এই বাস্তবতার চিত্রটিই এঁকেছেন ‘লালসালু’ উপন্যাসে; উন্নোচন করেছেন প্রতারণার মুখোশ।

অত্যন্ত যত্ন নিয়ে রচিত একটি সার্থক শিল্পকর্ম ‘লালসালু’ উপন্যাস। এর বিষয় নির্বাচন, কাহিনি ও ঘটনাবিন্যাস গতানুগতিক নয়। এতে প্রাধান্য নেই প্রেমের ঘটনার, নেই এবল প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বসংঘাতের উভেজনাকর ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে চমক সৃষ্টির চেষ্টা। অথচ মানবজীবনের প্রকৃত রূপ আঁকতে চান তিনি। মানুষেরই অর্তময় কাহিনি বর্ণনা করাই লক্ষ্য তাঁর। ফলে চরিত্র ও ঘটনার গৃঢ় রহস্য, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁকে দেখাতে হয়েছে যা জীবনকে তার অভর্ণত শক্তিতে উজ্জীবিত ও উদ্বৃষ্ট করে। যে ঘটনা বাইরে ঘটে তার অধিকাংশেই উৎস মানুষের মনের লোভ, ঈর্ষা, লালসা, বিশ্বাস, ভয়, প্রভৃতি কামনাসহ নানারূপ প্রবৃত্তি। বাসনাবেগ ও প্রবৃত্তি মানুষের মনে সুষ্ঠ থাকে বলেই বাইরের বিচ্ছিন্ন সব ঘটনা ঘটাতে তাকে প্ররোচিত করে। ধর্ম-ব্যবসায়ীকে মানুষ ব্যবসায়ী হিসেবে শনাক্ত করতে না পেরে ভয় পায়। কারণ, তাদের বিশ্বাস লোকটির পেছনে সজ্জিয় রয়েছে রহস্যময় অতিলৌকিক কোনো দৈবশক্তি। আবার ধর্ম-ব্যবসায়ী ভঙ্গ ব্যক্তি যে নিষিদ্ধ ও নিরাপদ বোধ করে তা নয়, তার মনেও থাকে সদা ভয়, হয়ত কোনো মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণা ও বৃদ্ধির মাধ্যমে তার গড়ে তোলা প্রতিপন্থির ভিত্তিটাকে ধসিয়ে দেবে। নরনারীর অবচেতন ও সচেতন মনের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই এভাবে লেখকের বিষয় হয়ে উঠেছে ‘লালসালু’ উপন্যাসে।

চরিত্র-সৃষ্টি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যে অসাধারণ কুশলী শিল্পী তা তাঁর ‘লালসালু’ উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। ‘লালসালু’ উপন্যাসের শৈলীক সার্থকতার প্রয়ে সুসংগত কাহিনিবিন্যাসের চাইতে চরিত্র নির্মাণের কুশলতার দিকটি ভূমিকা রেখেছে অনেক বেশি। ‘লালসালু’ একদিক দিয়ে চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। শীর্ষদেহের এই মানুষটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশ্বী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য, ভয় ও শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও বাসনা-সবই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আর সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই চরিত্রকেই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন; বারবার অনুসরণ করেছেন এবং তার ওপরই আলো ফেলে পাঠকের মনোযোগ নিয়ে রেখেছেন। উপন্যাসের সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক মজিদ। তাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আর তাই মজিদের প্রবল উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়ে মহবতনগর প্রামের সামাজিক পারিবারিক সকল কর্মকাণ্ডে।



মজিদ একটি প্রতীকী চরিত্র— কুসংস্কার, শর্তা, প্রতারণা এবং অঙ্গবিশ্বাসের প্রতীক সে। প্রচলিত বিশ্বাসের কাঠামো ও প্রথাবদ্ধ জীবনধারাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়, ওই জীবনধারার সে প্রভু হতে চায়, চায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে। এজন্য সে যে-কোনো কাজ করতেই প্রস্তুত, তা যতই নীতিহীন বা অমানবিক হোক। একান্ত পারিবারিক ঘটনার রেশ ধরে সে প্রথমেই বৃদ্ধ তাহেরের বাবাকে এমন এক বিপাকে ফেলে যে সে নিরামদেশ হতে বাধ্য হয়। নিজের মাজারকেন্দ্রিক শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ অনুভব করে সে আওয়ালপুরের পির সাহেবকে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে সে বাধ্য করে। সে খালেক ব্যাপারীকে বাধ্য করে তার সন্তান-আকাশক্ষী প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে। আর আক্ষাস নামের এক নবীন যুবকের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্পন্সরে আঙুরেই বিনষ্ট করে দেয়। এ ভাবেই মজিদ তার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাকে নিরক্ষুণ করে তোলে।

মহব্বতলগরে মজিদ তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করলেও এর ওপর যে আঘাত আসতে পারে সে বিষয়ে মজিদ অত্যন্ত সজাগ। সে জানে, স্বাভাবিক প্রাপ্যধর্মই তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং শোষণের অদৃশ্য বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। ফলে ফসল ওঠার সময় যখন গ্রামবাসীরা আনন্দে গান গেয়ে ওঠে তখন সেই গান তাকে বিচলিত করে। ওই গান সে বক্ষ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। রহিমার স্বচ্ছদ চলাফেরায় সে বাধ্য দেয়। আক্ষাস আলিকে সর্বসমক্ষে লাঙ্গিত অপমানিত করে। যিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের জাগতিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তিকে মজবুত করার জন্যে এ সবই আসলে তার হিসেবি বৃদ্ধির কাজ। সে দৈশ্বরে বিশ্বাসী, তার বিশ্বাস সুদৃঢ় কিন্তু প্রতারণা বা তঙ্গামির মাধ্যমে যেভাবেই হোক সে তার মাজারকে টিকিয়ে রাখতে চায়। এরপরও মাঝে মাঝে তার মধ্যে হতাশা ভর করে। মজিদ কখনো কখনো তার প্রতি মানুষের অনাঙ্গা অবলোকন করে নিজের উপর স্কুল হয়ে ওঠে। একেকবার আত্মাভাবী হওয়ার কথা ভাবে। মাজার প্রতিষ্ঠার জন্য যিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে কূট-কৌশল অবলম্বন করেছে তার সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবে।

প্রতিষ্ঠাকামী মজিদ স্বার্থপরতা, প্রতিপত্তি আর শোষণের প্রতিভূ। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিঃসন্তান জীবনে সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একপ্রকার শূন্যতা উপলব্ধি করে। এই শূন্যতা পূরণের অভিযানে অল্পবয়সী এক যেয়েকে বিয়ে করে সে। প্রথম স্ত্রী রহিমার মতো দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা ধর্মের ভয়ে ভীত নয়। এমনকি, মাজারভীতি কিংবা মাজারের অধিকর্তা মজিদ সম্পর্কেও সে কোনো ভীতি বোধ করে না। তারকণ্যের স্বত্বাধর্ম অনুযায়ী তার মধ্যে জীবনের চক্ষুতা ও উচ্ছলতা অব্যাহত থাকে। মজিদ তাকে ধর্মভীতি দিয়ে আয়ন্ত করতে ব্যর্থ হয়। জমিলা তার মুখে থুথু দিলে ভয়ানক ভুদ্ধি মজিদ তাকে কঠিন শাস্তি দেয়। তার মানবিক অভ্যর্থনা তৈরি না হয়ে তার ক্ষমতাবান সন্তান নিষ্ঠুর শাসনের মধ্যেই পরিতৃপ্তি হোজে। রহিমা যখন পরম মমতায় মাজার ঘর থেকে জমিলাকে এনে শুধুমা আরঞ্জ করে তখন মজিদের হস্তে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ন। মজিদের মনে হয়, ‘মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেনো ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম হয়’। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হয়। নবজন্ম হয় না তার। মজিদ শেষ পর্যন্ত থেকে যায় জীবনবিরোধী শোষক এবং প্রতারকের ভূমিকায়।

মজিদ একটি নিঃসঙ্গ চরিত্র। উপন্যাসেও একাধিকবার তার ভয়ানক নৈসঙ্গ্যবোধের কথা বলা হয়েছে। তার কোনো আপনজন নেই যার সঙ্গে সে তার মনের একান্তভাব বিনিময় করতে পারে। কারণ, তাঁর সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক কেবলই বাইরের- কখনো প্রভাব বিস্তারের বা নিরক্ষুণ কর্তৃত আরোপের— কখনোই অন্তরের বা আবেগের নয়। সে কখনোই আবেগী হতে পারে না। কারণ তার জানা আছে আন্তরিকতা ও আবেগময়তা তার পতনের সূচনা করবে। আর তাতেই ধরে পড়তে পারে তিলতিল করে গড়ে তোলা তার যিথ্যার সাম্রাজ্য।

এসব সঙ্গেও মজিদ যে আসলেই দুর্বল এবং নিঃসঙ্গ— এই সত্যটি ধরা পড়ে রহিমার কাছে। পড়ের রাতে জমিলাকে শাসনে ব্যর্থ হয়ে মজিদ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কীভাবে তরণী বধু জমিলাকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখবে সেই চিন্তায় একেবারে দিশেহারা বোধ করে। এরপে অনিষ্ট্যাতার মধ্যেই জীবনে প্রথম হয়ত তার মধ্যে আত্মপ্রভাবের সৃষ্টি হয়। নিজের শাসক-সন্তান কথা ভুলে গিয়ে রহিমার সামনে যেলে ধরে ব্যর্থতার আত্মবিশ্লেষণমূলক স্বরূপ : “কও বিবি কী করলাম? আমার বৃদ্ধিতে জানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, ভূমি কও?” ওই ঘটনাতেই রহিমা বুঝতে পারে তার স্বামীর দুর্বলতা কোথায় এবং তখন স্বয়ং শ্রদ্ধা এবং ভক্তির মানুষটি তার কাছে পরিণত হয় করুণার পাত্রে।

খালেক ব্যাপারী ‘লালসালু’ উপন্যাসের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। ভূ-স্বামী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ায় তাঁর কাঁধেই রয়েছে মহব্বতলগরের সামাজিক নেতৃত্ব। উৎসব-ব্রত, ধর্মকর্ম, বিচার-সামিশ্রসহ এমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই যেখানে তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত নয়। নিরাক-গড়া এক মধ্যাক্ষে গ্রামে আগত ভগু মজিদ তার বাড়িতেই আশ্রয় প্রদণ করে। একসময় যখন সমাজে মজিদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খালেক ব্যাপারী ও মজিদ পরম্পর বজায় রেখেছে তাদের অলিখিত যোগসাজশ।



ଅବଶ୍ୟ ନିଯମରେ ତାଇ । ଭୂ-ସ୍ଥାମୀ ଓ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମୀୟ ମୋହାତ୍ରା-ପୁରୋହିତଦେର ମଧ୍ୟେ ସ ଶ୍ଵ ପ୍ରଯୋଜନେ ଅନିବାର୍ୟଭାବେ ଗଡ଼େ ଓଠେ ନିବିଡ଼ ସଥ୍ୟ । କାରଣ ଦୁନଳେର ଭୂମିକାରେ ଯେ ଶୋଷକେର । ଆସଲେ ମଜିଦ ଓ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଦୁଜନେଇ ଜାନେ : ‘ଆଜାନେ ଅନିଚ୍ଛାୟାଓ ଦୁଜନେର ପକ୍ଷେ ଉଲ୍ଟା ପଥେ ଯାଓୟା ସମ୍ଭବ ନନ୍ଦ । ଏକଜନେର ଆଛେ ମାଜାର, ଆରେକଜନେର ଜ୍ଞାମ-ଜୋତେର ପ୍ରତିପଣ୍ଡିତ । ସଜ୍ଜନେ ନା ଜାନଲେବେ ତାରା ଏକଟା, ପଥ ତାଦେର ଏକ । ହାଜାର ବହର ଧରେଇ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣିର ଅପକର୍ମେର ଚିରସାଧୀ ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀରା । ତାରା ସମ୍ମିଲିତ ଉଦ୍ୟୋଗେ ସମାଜେ ଟିକିଯେ ରାଖେ ଅଜନନ୍ତା ଓ କୁସଂକ୍ଷାରେର ଅନ୍ଦକାର । ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋ, ମୁକ୍ତବୁଦ୍ଧିର ଚର୍ଚା ଓ ଅଧିକାରବୋଧ ସୃଷ୍ଟିର ପଥେ ତୈରି କରେ ପାହାଡ଼ସମ ବାଧା- ସାତେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ସହିତ ଥାକେ ବିକଶିତ ମାନବ ଚେତନା ଥେକେ । ଏହି ଫଳେ ସଫଳ ହୁଯ ଶୋଷକ । ଶୁଦ୍ଧ ଭୂମିକା ଶୋଷକ କେଳ, ଯେ କୋଣୋ ଧରନେର ଶୋଷକେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଥା ସତ୍ୟ । ତାରା ଶୋଷନେର ବ୍ୟାଧି ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀଦେର ସଙ୍ଗେ ଜୋଟିବନ୍ଦ ହୁଯ । ଏକାରଣେଇ ମଜିଦେର ସକଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନିଃଶ୍ଵର ସମର୍ଥନ ଜାନିଯେଇ ଥାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ । ଏମନିକି ମଜିଦେର ଅଭାବ ପ୍ରତିପଣ୍ଡିତ ମେନେ ନିଯେଇ ଅବନତ ମନ୍ତକେ; ଯାର ଉତ୍ତରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଜେର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ଆମେନା ବିବିକେ ତାଲାକ ଦେଯା ।

‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସେର ପ୍ରଥମ ଥେକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀର ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ ଥାକଲେବେ ସେ କଥନୋଇ ଆଭାର୍ୟାଦାଶିଲ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଯ ଉଠିତେ ପାରେନି । ଆମରା ଜାନି ଯେ, ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିସେବେ ଜାହିର କରେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ଉପର ପ୍ରଭୃତି କରେ । ଫଳେ ଶୋଷକରାତ୍ର ତାଦେର ଅଧିନ ହୁଯ ଯାଯ । କିନ୍ତୁ ଶୋଷକଦେର ହାତେ ଯେହେତୁ ଥାକେ ଅର୍ଥ ଦେବେତୁ ତାରା ଓ ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀଦେର ଅର୍ଥେର ଶକ୍ତିତେ ଅଧିନ କରେ ଫେଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ଥାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀର ଚରିତ୍ରେ ଆମରା ସେ ଦୃଢ଼ତା କଥନୋଇ ଲଙ୍ଘ କରି ନା । ବରଂ ପ୍ରାୟ ସବ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ମଜିଦେର କଥାର ସୁରେ ତାକେ ସୁର ମେଲାତେ ଦେଖା ଯାଯ । ଫଳେ ମଜିଦ ଚରିତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଥନେ ଦ୍ୱାରେ ଲିଙ୍ଗ ହୁଯନି । ତାର ଅର୍ଥେର ଶକ୍ତି ସବସମୟ ମାଜାର-ଶକ୍ତିର ଅଧିନତା ଶ୍ରୀକାର କରେଛେ । ତାଁ ଏହି ଚାରିତ୍ରିକ ଦୌର୍ବଳ୍ୟ ଇତିହାସେର ଧାରା ଥେକେବେ ବ୍ୟାତକ୍ରମୀ ।

ମଜିଦେର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ରାହିମା ‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର । ଲୋହ ଚତୁର୍ଦ୍ଵାରା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିତ୍ସମ୍ପନ୍ନା ଏହି ନାରୀ ପୁରୋ ଉପନ୍ୟାସ ଜୁଡ଼େ ସ୍ଥାମୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବେ କାହେ ଅଶାଯ ହୁଯେ ଥାକଲେବେ ତାର ଚରିତ୍ରେର ଏକଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଆହେ । ଲେଖକ ନିଜେଇ ତାର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରକେ ବାଇରେ ଖୋଲ୍ସ ବଲେଛେ, ତାକେ ଠାଣ୍ଡ ଭୀତୁ ମାନୁଷ ବଲେ ପରିଚିତି ଦିଯେଛେନ । ତାର ଏହି ଭୀତି-ବିହୁଳ, ନରମ କୋମଳ ଶାନ୍ତ ରାପେର ପେଛେରେ ସତ୍ରିଯ ରାଯେଇ ଈଶ୍ୱର-ବିଶ୍ୱାସ, ମାଜାର-ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାଜାରେର ପ୍ରତିନିଧି ହିସେବେ ସ୍ଥାମୀର ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି । ଧର୍ମଭିକୁ ମାନୁଷେରା ଈଶ୍ୱରେର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟରେର କାରଣେ ଯେ କୋମଳ ସଭାବସମ୍ପନ୍ନ ହୁଯ ରାହିମା ତାରଇ ଏକଟି ଉତ୍କଳ ଉଦାହରଣ । ସମ୍ମର୍ହ ମହବୁତନଗରେର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନୁଷଦେଇ ସେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି । ସ୍ଥାମୀ ସମ୍ପର୍କେ ମାଜାର ସମ୍ପର୍କେ ତାର ମନେ କୋଣୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଦୟ ହୁଯ ନା, ସେ ସର୍ବଦାଇ ନିର୍ବିର୍ଦ୍ଧୀୟ ମେନେ ନେଇ ସ୍ଥାମୀର ମୁଖ ଥେକେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧର୍ମର ସକଳ ବିଧାନ । ମାଜାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସକଳ କାଜକର୍ମେର ପରିବାରର ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ତାର ନିଜେର ସକଳ ଗାହିଷ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ସବ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ସେ ଏକାନ୍ତଭାବେ ସେ ଏବଂ ନିଯମନିଷ୍ଠ । ମାଜାର ନିଯେ ଯେମନ ରାଯେଇ ତାର ଭୀତି ଓ ଭକ୍ତି, ତେମନି ଏହି ମାଜାରେର ପ୍ରତିନିଧିର ଶ୍ରୀ ହିସେବେ ରାଯେଇ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ । ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ ଥେକେଇ ସେ ପ୍ରାମେର ମାଜାର ଓ ମାଜାରେର ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କେ ଶୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ତାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଳେ ଧରେ ଏବଂ ଏଭାବେ ସେ ନିଜେକେ ଓ ଶୁଣକୁର୍ପର୍ଣ୍ଣ କରେ ତୋଲେ । ହାସୁନିର ଯାଯେର ସମସ୍ୟା ଯଥନ ମେ ତାର ସ୍ଥାମୀର କାହେ ଜାନାଯ କିମ୍ବା ଆମେନା ବିବିର ସଂକଟ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ତାର ପାଶେ ଗିଯେ ଅବସ୍ଥାନ ନେଇ ତଥନ ତାର ମଧ୍ୟେ ମାଜାର-ପ୍ରତିନିଧିର ଶ୍ରୀ ହିସେବେ ଗର୍ବବୋଧ କାଜ କରେ । ଏ ଗର୍ବବୋଧ ଛାଡ଼ାଓ ଏଥାନେ ସତ୍ରିଯ ଥାକେ ନାରୀର ପ୍ରତି ତାର ଏକଟି ସହାନୁଭୂତିଶିଳ ମନ । ରାହିମାର ମନଟି ସ୍ଥାମୀ ମଜିଦେର ତୁଳନାଯ ଏକେବାରେଇ ବିପରୀତମୁଖୀ ।

ମଜିଦେର କର୍ତ୍ତୃତ୍ସାରାଯଣତା, ମାନୁଷେର ଧର୍ମଭିରୁତାକେ କାଜେ ଲାଗିଯେ ନିଜେର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗେର ଦୁରଭିସନ୍ଧି ପ୍ରଭୃତିର ବିପରୀତେ ରାହିମାର ମଧ୍ୟେ ସତ୍ରିଯ ଥାକେ କୋମଳ ହୁଦରେର ଏକ ମାତ୍ରମୟୀ ନାରୀ । ସେଟି ଜମିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଲଙ୍ଘ କରା ଯାଯ । ତାଦେର ସନ୍ତାନହିଁନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ-ଜୀବନେ ମଜିଦ ସଥନ ବିତ୍ତୀ ବିଯରେ ପ୍ରତାବନ କରେ ତଥନ ରାହିମାର ମଧ୍ୟେ କୋଣୋ ବିରାପ ପ୍ରତିକିରାରେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ ନା । ଏର ମୂଳେ ସତ୍ରିଯ ତାର ସ୍ଥାମୀର ପ୍ରତି ଅଟଲ ଭକ୍ତି, ପୁରୁଷତାଙ୍କିର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧବତାର ପ୍ରତି ନିଃଶ୍ଵର ଆଭାସମର୍ପଣ ଏବଂ ସରଳ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା । କିନ୍ତୁ ଜମିଲା ସଥନ ତାର ସତୀନ ହିସେବେ ସଂସାରେ ଆସେ ତଥନ ଓ ସାମାଜିକ ଗାହିଷ୍ୟ ବାନ୍ଧବତାର କାରଣେ ଯେତୁକୁ ଈର୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧରିତ ହୁଏୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଛିଲ ତାଓ ଅନୁପସିତ ଥାକେ ତାର ଓଇ ହୁଦରୁଥିବେଦୀ ମାତ୍ରମନେର କାରଣେ । ଜମିଲା ତାର କାହେ ସପନ୍ତୀ ହିସେବେ ବିବେଚିତ ହୁଯ ନା ରବଂ ତାର ମାତୃହୁଦରେର କାହେ ସନ୍ତାନତୁଳ୍ୟ ବଲେ ବିବେଚିତ ହୁଯ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜମିଲାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ତାର ମାତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରେ ସଥନ ମଜିଦ ଜମିଲାର ପ୍ରତି ଶାସନେର ଖୂବ ତୁଳେ ଧରେ ।

ସ୍ଥାମୀର ସକଳ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ ସେ ଯେତାବେ ପାଲନ କରେଛେ ସେଇଭାବେ ଜମିଲାଓ ପାଲନ କରିବ କେବଳ ସେଟି ସେଇ ଚାଯ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଲନେର ବ୍ୟାପାରେ ସ୍ଥାମୀର ଜ୍ଞାର-ଜ୍ଞାନଦର୍ଶିକେ ସେ ପଛଦ କରେ ନା । ସ୍ଥାମୀର ପ୍ରତି ତାର ଦୀର୍ଘଦିନେର ସେ ଅଟଲ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ତାତେ ଫାଟିଲ ଧରେ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ଧର୍ମଭିରୁତାକେ ଅତିକ୍ରମ କରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଁ ଓଇ ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀର ପ୍ରତି ତାର ମାତୃହୁଦରେର ସହାନୁଭୂତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପାତଦର୍ଶିତେ ଯାକେ ମନେ ହେଁଲିବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟେଇ ଛିଲ ଯାର



জীবনের সার্থকতা, সেই নারীই উপন্যাসের শেষে এসে তার মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠে। রহিমা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখানেই লেখকের সার্থকতা।

নিঃসন্তান মজিদের সন্তান-কামনাসুত্রে তার দ্বিতীয় স্তোরণে আগমন ঘটে জমিলার। শুধু সন্তান-কামনাই তার মধ্যে একমাত্র ছিল কিনা, নাকি তরুণী স্তী-প্রত্যাশাও তার মাঝে সত্ত্বিয় ছিল তা লেখক স্পষ্ট করেননি। কিন্তু বাস্তবে আমরা লক্ষ করি তার গৃহে দ্বিতীয় স্তী হিসেবে যার আগমন ঘটে সে তার কন্যার বয়সী এক কিশোরী। জমিলার চরিত্রে কৈশোরক চপলতাই প্রধান। এই চপলতার কারণেই দাম্পত্য সম্পর্কের গাঢ়ীর্য তাকে স্পর্শ করে না। এমনকি তার সপ্তদ্঵ী রহিমাও তার কাছে কখনো জৰ্দার বিষয় হয়ে ওঠে না। রহিমা তার কাছে মাতৃসম বড়বোন হিসেবেই বিবেচিত হয় এবং তার কাছ থেকে সে অদ্বপ স্নেহ আদর পেয়ে অভিমান-কাতর থাকে। রহিমার সামান্য শাসনেও তার চোখে জল আসে। তার ধর্মকর্ম পালন কিংবা মাজার-প্রতিনিধির স্তী হিসেবে তার যেরূপ গাঢ়ীর্য রক্ষা করা প্রয়োজন সে-ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো সচেতনতাই লক্ষ করা যায় না শুই কৈশোরক চপলতার কারণে। প্রথম দর্শনে স্বামীকে তার যে তাবী শুভুর বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, বিয়ের পরেও সেটি তার কাছে হাস্যকর বিষয় হয়ে থাকে ওই কৈশোরক অনুভূতির কারণেই। ধর্মপালন কিংবা স্বামীর নির্দেশ পালন উভয় ক্ষেত্রেই তার মধ্যে যে দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার অভাব তার মূলে রয়েছে এই বয়সোচিত অপরিপক্ততা। মাজার সম্পর্কে রহিমার মতো সে ভৌতিকিহীন নয় কিংবা মাজারের পরিব্রাতা সম্পর্কেও নয় সচেতন এবং এই একই কারণে মাজারে সংঘটিত জিকির অনুষ্ঠান দেখার জন্য তার ভিতরে কৌতুহল মেটাতে কোথায় তার অন্যায় ঘটে তা উপলব্ধির ক্ষমতাও তার হয় না। সুতরাং স্বামী মজিদ যখন এসবের শুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তার অনুচিত কর্ম সম্পর্কে তাকে সচেতন করে, তখন সেসবের কিছু তার কাছে কোনো শুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং তাকে শাসনের ব্যাপারে মজিদের সকল উদ্যোগই তার কাছে অত্যাচার কিংবা নিপীড়ন বলে মনে হয় এবং এই পীড়ন থেকে মুক্তি লাভের জন্য মজিদের মুখে যে সে শুধু নিঙ্কেপ করে সেটাও তার মানসিক অপরিপক্ততারই ফল। এমনকি মাজারে যখন তাকে বন্দি করে রেখে আসে মজিদ তখন সেই অঙ্ককারের নির্জনে বাড়ের মধ্যে ছোট মেয়েটি ভয়ে যাবার যেতে পারে বলে রহিমা যখন আতঙ্কে স্বামীর ওপর ক্ষুঁক হয়ে ওঠে তখনও জমিলাকে তয় পাওয়ার পরিবর্তে নিশ্চিতে ঘূর্মাতে দেখা যায়। এরূপ আচরণের মূলেও সত্ত্বিয় থাকে তার স্বল্প বয়সোচিত ছেলেমানুষি, অপরিপক্ততা। অর্থাৎ এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ‘লালসালু’ উপন্যাসে একটি প্রাগময় সন্তান উপস্থিতি পটিয়েছেন। শাস্ত্রীয় ধর্মীয় আদেশ নির্দেশের প্রাবল্যে পুরো মহবতনগর গ্রামে যে প্রাগময়তা ছিল রূপ্তা, জমিলা যেন সেখানে এক মুক্তির সুবাতাস। রূপ্তার নায়ক যে মজিদ, উপন্যাসিক সেই মজিদের গৃহেই এই প্রাগময় সন্তান বিকাশ ঘটিয়েছেন। একদিকে সে নারী অন্য দিকে সে বয়সে তরুণী— এই দুটিই তার প্রাণধর্মের এক প্রতীকী উষ্টাসন। এ উপন্যাসে মজিদের মধ্য দিয়ে এবং ধর্মতত্ত্বের বিস্তার ঘটেছে তার পেছনে পুরুষতত্ত্বও সত্ত্বিয়। সুতরাং নিজীব ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে সজীব প্রাণধর্মের জাগরণের ক্ষেত্রে এ নারীকে যথাযথভাবেই আশ্রয় করা হয়েছে। জমিলা হয়ে উঠেছে নারীধর্ম, হৃদয়ধর্ম বা সজীবতারই এক যোগ্য প্রতিনিধি।

‘লালসালু’ উপন্যাসে মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর পরিবার ছাড়া আরেকটি পরিবারের কাহিনি শুরুত্ব লাভ করেছে। সেটি তাহের-কাদের ও হাসুনির মাঝের পরিবার। এদের পিতামাতার কলহ এবং তাই নিয়ে মজিদের বিচারকার্যের মধ্য দিয়ে তাহের-কাদেরের পিতা চরিত্রাটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। উপন্যাসে এটিই একমাত্র চরিত্র যে মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণ করেছে, বিচার সভায় প্রদর্শন করেছে অনমনীয় দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব। তার নিঞ্চিত মুক্তিপূর্ণ ও উন্নত-শির অবস্থান নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিক্রমধর্মী। সে মজিদের বিচারের রায় অনুযায়ী নিজ মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ঠিকই কিন্তু তা মজিদের প্রতি শ্রদ্ধা বা আনুগত্যবশত নয়। যানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই সে এ কাজ করেছে। তবে এর পরপরই তার নিরুদ্দেশ গমনের ঘটনায় এই চরিত্রের প্রবল ব্যক্তিত্বপ্রায়ণতা ও আত্মর্যাদাবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। এই আচরণের মধ্য দিয়ে মজিদের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদও ব্যক্ত হয়েছে।

‘লালসালু’ উপন্যাসের কাহিনি অত্যন্ত সুসংহত ও সুবিন্যস্ত। কাহিনি-ঐতৃনাম লেখক অসামান্য পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনির বিভিন্ন পর্যায়ে নাট্যিক সংবেদনা সৃষ্টিতে লেখক প্রদর্শন করেছেন অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য। বাংলাদেশের প্রাচীণ জীবনের বাস্তবতা, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবোধের দৰ্দ, ধর্মতত্ত্ব-আশ্রয়ী ব্যবস্থাপূর্ণ ও ব্যক্তির মূলীভূত হওয়ার প্রতারণাপূর্ণ প্রয়াস, অর্থনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য নাড়ির যোগ প্রভৃতি বিষয়কে লেখক এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাষায় কল্পায়ণ করেছেন। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শেকড়হীন বৃক্ষপ্রতিম মজিদ, ধর্মকে আশ্রয় করে মহবতনগরে প্রতিষ্ঠা-অর্জনে প্রয়াসী হলেও তার মধ্যে সর্বদাই কার্যকর থাকে অস্তিত্বের এক সুস্ক্ষমতর সংকট। এরূপ সংকটের একটি মানবীয় ছদ্মবয় রূপ সৃষ্টিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সার্থকতা বিশ্বাসী।



শ্রী স্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়ার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। আগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মন্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে-প্রদেশেরও; হয়ত-বা আরও দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিক্রিক প্রথরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিন-মান-ক্ষণের সবুর ফঁসির শামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন বিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌছেয় এ-দেশে তখন হঠাত আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে বাঁকুনি লাগে, বন্ধন করে ওঠে লোহালকড়। রাতের অঙ্ককারে লক্ষন জ্বালানো ঘূমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে ইখানে নিদ্রাছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুক্কাটা হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্তা আগনের হস্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিণ্ডলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতুহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অঙ্ককারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চিত্কার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে ঢ়লে কপাল ফাটবে—তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে আজীয়-স্বজন, জামপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারও জামা হেঁড়ে, কারও টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারও-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা—যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না—কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়—এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের খোকাটা ছাড়া দেহে বিস্মুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ বন্ধন করে লোহালকড়ের ঝংকারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাত ওঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি থায়। পানি থায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশ্চিত রাতে যে-দেশে এসে পৌছেছে সে-দেশ এখন অঙ্ককারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরান মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যত্সামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মজবুতে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতাঁলার বিশেষ দেশ। ন্যাটো ছেলেও আমসিপাড়া পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবির বয়ক গলাকে ডুবিয়ে সমন্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গেঁফ উঠতেই না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যত্সামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে। শীর্ণ চিরুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাঢ়ি অসংযত দৌরবল্যে ঝুলে থাকে

তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরও আশা নিয়ে আলিয়া মদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মন্ত মন্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো-এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান শ্রেতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব, কেতাবগুলোর বিচির অক্ষরগুলো দুরাত্ম কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতালার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যাই অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবপূর্ণ ব্যক্তিসূখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরও ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্টার ওপর বসে শীতল পানিতে অজ্ঞ বানায়, টুপিটা খুলে তার গহৰে ঝুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে থেকে খাবি খায়, দিগন্তে বালসানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেলারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ—এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দুরদূরাত্ম চলে যায়। হয়ত বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে—যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-গড়া শুক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল—সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়ত একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যান। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডল মস্ণি। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কঠের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়। পরে মৌলিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসন্দত্তার বন্য শূন্যতা।

—আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

—আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলিবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে। শিকারি পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাতে মৌলিবির মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এখারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরস্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। কৃচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেয়ে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-সাতবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে—মৌলিবির গলা। বুনো ভারী হাওয়ায় তার হাঙ্কা ক-গাছি দাঢ়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়ত চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।



କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶିକାରିର କଲ୍ପନା । ଆନ୍ତାନାୟ ଫିରେ ଏସେ ବନ୍ଦୁକେର ନଳ ସାଫ୍ କରତେ କରତେ ଶିକାରି କଲ୍ପନା କରେ ସେ-କଥା । ତବେ ନୃତ୍ତନ ଏକ ଆଲୋର ଝଲକେ ମୌଳବିର ଚୋଖ ଯେ ଦୀଙ୍ଗ ହୟେ ଓଠେ ସେ କଥା ଜାଣେ ନା; ତାବତେଓ ପାରେ ନା ହୟତ ।

ଏକଦିନ ଶ୍ରାବଗେର ଶୈଶାଶ୍ଵର ନିରାକ ପଡ଼େଛେ । ହାଓୟାଶ୍ଵନ୍ୟ ସ୍ତର୍କତାୟ— ମାଠ୍ପ୍ରାନ୍ତର ଆର ବିନ୍ଦୁତ ଧାନକ୍ଷେତ ନିଥର, କୋଥାଓ ଏକଟୁ କମ୍ପନ ନେଇ । ଆକାଶେ ମେଘ ନେଇ । ତାମାଟେ ନୀଳାଭ ରଂ ଦିଗନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂର ହୟେ ଆଛେ ।

ଏମନି ଦିନେ ଲୋକେରା ଧାନକ୍ଷେତେ ନୌକା ନିଯେ ବେରୋଯ । ଡିନିତେ ଦୁ-ଦୁଜନ କରେ, ସଙ୍ଗେ କୌଚ-ଜୁତି । ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଧାନ-କ୍ଷେତେ ଥ୍ରଗାଡ଼ ନିଷ୍ଟଳଦତ୍ତା । କୋଥାଓ ଏକଟା କାକ ଆରନାଦ କରେ ଉଠିଲେ ମନେ ହୟ ଆକାଶଟା ବୁବି ଚଟେର ମତୋ ଚିରେ ଗେଲ । ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣେ ଧାନେର ଫାଁକେ ଫାଁକେ ତାରା ନୌକା ଚାଲାଯ; ଢେଟ ହୟ ନା, ଶଦ ହୟ ନା । ଗଲୁଇ-ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକେ ଏକଜନ— ଚୋଥେ ଧାରାଲୋ ଦୃଷ୍ଟି । ଧାନେର ଫାଁକେ ଫାଁକେ ସାପେର ସର୍ପିଲ ସୂଜ୍ଜଗତିତେ ସେ-ଦୃଷ୍ଟି ଏଁକେବେକେ ଚଲେ ।

ବିନ୍ଦୁତ ଧାନକ୍ଷେତର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତେ ତାହେର-କାଦେରଓ ଆଛେ । ତାହେର ଦାଁଡ଼ିଯେ ସାମନେ— ଚୋଥେ ତାର ତେମନି ଶିକାରିର ସୂଚାର ଏକାଘତା । ପେଛନେ ତେମନି ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ବସେ କାଦେର ଭାଇୟେର ଇଶାରାର ଅପେକ୍ଷାଯ ଥାକେ । ଦାଁଡ଼ ବାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମନ କୌଶଳେ ଯେ, ମନେ ହୟ ନିଚେ ପାନି ନଯ, ତୁଲୋ ।

ହଠାତ୍ ତାହେର ଦୟଃ କେଂପେ ଓଠେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶକ୍ତ ହୟେ ଯାଯ । ସାମନେର ପାନେ ଚେଯେ ଥେକେଇ ପେଛନେ ଆଞ୍ଚଳ ଦିଯେ ଇଶାରା କରେ । ସାମନେ, ବାଁଯେ । ଏକଟୁ ବାଁଯେ କ-ଟା ଶିଷ ନଡ଼ିଛେ—ନିରାକପଡ଼ା ବିନ୍ଦୁତ ଧାନକ୍ଷେତେ କେମନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯ ସେ-ନଭା । ଆରଓ ବାଁଯେ । ସାବଧାନ, ଆନ୍ତେ । ତାହେରେର ଆଞ୍ଚଳ ଅଛୁତ କ୍ଷିପ୍ରତାୟ ଏସବ ନିର୍ଦେଶଇ ଦେଯ ।

ତତକ୍ଷଣେ ସେ ପାଶ ଥେକେ ଆଲଗୋହେ କୌଚଟା ତୁଲେ ନିଯେଛେ । ନିତେ ଏକଟୁଓ ଶଦ ହୟନି । ହୟନି ତାର ପ୍ରମାଣ, ଧାନେର ଶିଷ ଏଥିନେ ଓଖାନେ ନଡ଼ିଛେ । ତାରପର କରେକଟା ନିଷ୍ଠାସରକ୍ଷ କରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଦୂରେ ଯେ-କଟା ନୌକା ଧାନ-କ୍ଷେତର ଫାଁକେ ଫାଁକେ ଏମନି ନିଷ୍ଠାଦେ ଭାସଛିଲ, ସେଙ୍ଗଲୋ ଥେମେ ଯାଯ । ଲୋକେରା ହିଂସିତ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକେ ଧନୁକେର ମତୋ ଟାନ-ହୟେ-ଓଠେ ତାହେରେର କାଳୋ ଦେହଟିର ପାନେ । ତାରପର ଦେଖେ, ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଚମକେର ମତୋ ସେଇ କାଳୋ ଦେହେର ଉର୍ଧ୍ଵାଂଶ କେଂପେ ଉଠିଲ, ତୀରେର ମତୋ ବେରିଯେ ଗେଲ ଏକଟା କୌଚ । ସା-ଝାକ ।

ଏକଟୁ ପରେ ଏକଟା ବୃହତ୍ ଝାଇ ମୁଖ ହା-କରେ ଭେସେ ଓଠେ ।

ଆବାର ନୌକା ଚଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ, ସନ୍ତର୍ପଣେ ।

ଏକସମୟ ସୁରତେ ତାହେରଦେର ନୌକା ମତିଗଞ୍ଜେର ସଡ଼କଟାର କାହେ ଏସେ ପଡ଼େ । କାଦେର ପେଛନେ ବସେ ତେମନି ନିଷ୍ପଳକ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଚେଯେ ଆହେ ତାହେରେର ପାନେ ତାର ଆଞ୍ଚଳେର ଇଶାରାର ଜଳ୍ୟ । ହଠାତ୍ ଏକ ସମୟ ଦେଖେ, ତାହେର ସଡ଼କେର ପାନେ ଚେଯେ କୀ ଦେଖିଛେ, ଚୋଥେ ବିନ୍ଦୁଯେର ଭାବ । ସେଓ ସେଦିକେ ତାକାଯ । ଦେଖେ, ମତିଗଞ୍ଜେର ସଡ଼କେର ଓପରେଇ ଏକଟି ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଆକାଶେର ପାନେ ହାତ ତୁଲେ ମୋନାଜାତେର ଭଙ୍ଗିତେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆହେ, ଶୀର୍ଷ ମୁଖେ କ-ଗାଛି ଦାଡ଼ି, ଚୋଖ ନିମ୍ନାଲିତ । ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟେ, ଲୋକଟିର ଚେତନା ନେଇ । ନିରାକପଡ଼ା ଆକାଶ ଯେନ ତାକେ ପାଥରେର ମୂର୍ତ୍ତିତେ ବୃପ୍ତାନ୍ତରିତ କରେଛେ ।

କାଦେର ଆର ତାହେର ଅବାକ ହୟେ ଚେଯେ ଚେଯେ ଦେଖେ । ମାଛକେ ସତର୍କ କରେ ଦେବାର ଭୟେ କଥା ହୟ ନା, କିନ୍ତୁ ପାଶେଇ ଏକବାର ଧାନେର ଶିଷ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ନଡ଼େ ଓଠେ, ଦୟଃ ଆଓୟାଜାଗ୍ରହ ହୟ-ସେଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ।



একসময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে বাট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহবতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা-নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন ঢোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিম্নলিখিত সেই চোখে একটুও কম্পন নেই।

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহবতনগর গ্রাম। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে চুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বথ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এই জন্যে যে, তার আগমন, মুহূর্তে সমস্ত গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীর নির্মাণিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ষ লোকটি চিন্কার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতবর রেহান আলি ছিল। জোয়ান মন্দ কালু মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁটে। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

—আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়ুহ। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশবাড়ি। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশবাড়ির ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্ধিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছেট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, মুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়ত। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পিরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃন্দ সলেমনের বাপও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

—আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ।

—মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গুরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভুইয়ে সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাজা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসূলের ডাক একবার দিলে পোঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্ঘম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিয়েমের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক ঘনেছে সে-কথা, তবু আবার উত্কর্ণ হয়ে ওঠে।

—উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত স্কুল চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।



ଗ୍ରାମେର ଲୋକଶୁଣି ହିଦାନୀୟ ଅବସ୍ଥାପତ୍ର ହୟେ ଉଠେଛେ । ଜୋତଜୟ କରେଛେ, ବାଡ଼ି-ଘର କରେ ଗରୁଛାଗଳ ଆର ମେଯେମାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଷ୍ଟ ଚଢ଼ାଇ-ଉତ୍ତରାଇ ତାବ ଛେତ୍ର ଧୀରଙ୍ଗିର ହୟେ ଉଠେଛେ, ଯୁଧେ ଚିକଳାଇ ହୟେଛେ । କିନ୍ତୁ ଖୋଦାର ଦିକେ ତାଦେର ନଜର କମ । ଏଥାନେ ଧାନକ୍ଷେତ୍ରେ ହାଓଯା ଗାନ ତୋଳେ ବଟେ କିନ୍ତୁ ମୁସଲିନ୍ଦେର ଗଲା ଆକାଶେ ଭାସେ ନା । ଗ୍ରାମେର ପ୍ରାନ୍ତେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲେର ଘର୍ଯ୍ୟେ କବରେର ପାଶେ ଦାଢ଼ିଯେ ବୁକେ ବୋଲାନୋ ତାମାର ଦାଁତ-ଖିଲାଲ ଦିଯେ ଦାଁତେର ଗହର ଖୋଚାତେ ଖାଜିଦ ମେଦିନ ସେ-କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଛିଲ । ସଜେ ସଜେ ଏକଥାଓ ବୁଝେଛିଲ ଯେ, ଦୁନିଆୟ ସଚଳଭାବେ ଦୁ-ବେଳା ଖେଯେ ବାଁଚବାର ଜନ୍ୟେ ଯେ-ଖେଳା ଖେଲତେ ଯାଚେ ସେ-ଖେଳା ସାଂଘାତିକ । ମନେ ସନ୍ଦେହ ଛିଲ, ଭୟଓ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଜମାଯେତେର ଆଧୋବଦନ ଚେହାରା ଦେଖେ ପରିକାର ହୟେ ଗିଯେଛିଲ ଅନ୍ତର । ହାପାନି-ରୋଗଘନ୍ତ ଅଶୀତିଗର ବୃଦ୍ଧର ଚୋଥେର ପାନେ ଚେଯେଓ ତାତେ ଲଞ୍ଜା ଛାଡ଼ା କିଛି ଦେଖେନି ।

ଜଙ୍ଗଲ ସାଫ ହୟେ ଗେଲ । ଇଟ-ସୁରକ୍ଷି ନିଯେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ କବର ସଦ୍ୟମୃତ କୋନୋ ମାନୁଷେର କବରେର ମତୋ ନତୁନ ଦେହ ଧାରଣ କରଲ । ବାଲରୁଗ୍ରାମାଲା ସାଲୁ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହଲୋ ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ସେ କବର । ଆଗରବାତି ଗଙ୍ଗା ଛାଡ଼ାତେ ଲାଗଲ, ମୋମବାତି ଜ୍ବଳତେ ଲାଗଲ ରାତଦିନ । ଗାହପାଲାୟ ଢାକା ସ୍ଥାନଟି ଆଗେ ସ୍ୟାତସେଂତେ ଛିଲ, ଏଥିନ ରୋଦ ପଡ଼େ ଖଟଖଟେ ହୟେ ଉଠିଲ; ହାଓଯାରାଓ ଭ୍ୟାପ୍ସା ଗନ୍ଧ ଖଡ଼େର ମତୋ ଶୁକ୍ଳ ହୟେ ଉଠିଲ ।

ଏ-ଗ୍ରାମ ସେ-ଗ୍ରାମ ଥେକେ ଲୋକରା ଆସତେ ଲାଗଲ । ତାଦେର ମର୍ମଞ୍ଜଦ କାନ୍ଦା, ଅଶ୍ରୁସଜଳ କୃତଜ୍ଞତା, ଆଶାର କଥା, ବ୍ୟର୍ଥତାର କଥା—ସାଲୁତେ ଆବୃତ ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ଅଞ୍ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ କବରେର କୋଲେ ବ୍ୟକ୍ତ ହତେ ଲାଗଲ ଦିନେର ପର ଦିନ । ତାର ସଙ୍ଗେ ପଯସା— ବାକବାକେ ପଯସା, ଘରା ପଯସା, ସିକି-ଦୂରାନି-ଆଶୁଲି, ସାତ୍ତା ଟାକା, ନକଳ ଟାକା ଛାଡ଼ାଇଛି ଯେତେ ଲାଗଲ ।

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମଜିଦେର ଘରବାଡ଼ି ଉଠିଲ । ବାହିର ଘର, ଅନ୍ଦର ଘର, ଗୋରାଲ ଘର, ଆଓଲା ଘର । ଜମି ହଲୋ, ଗୃହସାଲି ହଲୋ । ନିରାକପଡ଼ା ଶ୍ରାବନେର ସେଇ ହାଓଯା-ଶୂନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଦିନେ ତାର ଜୀବନେର ସେ ନତୁନ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁରୁ ହୈଯେଛିଲ, ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ସାଲୁ କାପଢେ ଆବୃତ ନଥର ଜୀବନେର ପ୍ରତୀକଟିର ପାଶେ ସେ ଜୀବନ ପଦେ ପଦେ ଏଗିଯେ ଚଲିଲୋ । ହୟତ ସାମନେର ଦିକେ, ହୟତ କୋଥାଓ ନନ୍ଦ । ସେ-କଥା ଭେବେ ଦେଖିବାର ଲୋକ ସେ ନନ୍ଦ । ବତୋର ଦିନେ ମଗରା-ମଗରା ଧାନ ଆସେ ଘରେ, ତାଇ ସଥେଷ୍ଟ । ତଥାକଥିତ ମାଜାରେର ପାନେ ଚେଯେ କୁଟିଏ କଥନେ ସେ ସେ ଭାବିତ ନା ହୟ ତା ନନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ତାରଙ୍ଗେ ସେ ବାଁଚବାର ଅଧିକାର ଆଛେ ସେଇ କଥାଟାଇ ସେ ସାମରିକ ଚିନ୍ତାର ଘର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରଥାନ ହୟେ ଓଠେ । ତାବେ, ଖୋଦାର ବାନ୍ଦା ସେ ନିର୍ବୋଧ ଓ ଜୀବନେର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ଧ । ତାର ଭୁଲଭ୍ରାନ୍ତି ତିନି ମାଫ କରେ ଦେବେନ । ତାର କରଣ୍ଗ ଅପାର, ସୀମାଇନ ।

ଏକଦିନ ମଜିଦ ବିଯେଓ କରେ । ଅନେକ ଦିନ ଥେକେ ଆଲି-ବାଲି ଏକଟି ଚନ୍ଦା ବେଓଯା ମେଯେକେ ଦେଖେଛିଲ ।

ଶେଷେ ସେଇ ମେଯେଲୋକଟିଇ ବିବି ହୟେ ତାର ଘରେ ଏଲ । ନାମ ତାର ରହିମା । ସତି ସେ ଲଥା-ଚନ୍ଦା ମାନୁଷ! ହାଡ଼-ଚନ୍ଦା ମାଂସଲ ଦେହ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଦେଖା ଗେଲ, ତାର ଶକ୍ତିଓ କମ ନନ୍ଦ । ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇଁ ସେ ଅନାୟାସେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥେକେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ତୁଲେ ନିଯେ ଯାଏ, ଗୋଯାର ଧାମଡା ଗାଇକେଓ ସଚନ୍ଦେହ ଗୋଯାଲ ଥେକେ ଟେନେ ବେର କରେ ନିଯେ ଆସେ । ହାଟେ ସଥନ, ମାଟିତେ ଆଓଯାଜ ହୟ, କଥା କର ସଥନ, ମାଠ ଥେକେ ଶୋନା ଯାଏ ଗଲା ।

ତବେ ତାର ଶକ୍ତି, ତାର ଚନ୍ଦା ଦେହ ବାହିରେର ଖୋଲସ ମାତ୍ର । ଆସିଲେ ସେ ଠାଣା, ଭିତ୍ତ ମାନୁଷ । ଦଶ କଥାଯ ରା ନେଇ, ରଙ୍ଗେ ରାଗ ନେଇ । ମଜିଦେର ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭୟ । ଶୀର୍ଘ ମାନୁଷଟିର ପେହନେ ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ମାଜାରଟିର ବୃହଂ ଛାୟା ଦେଖେ ।

ଓ ସଥନ ଉଠାନେ ହାଟେ ତଥନ ମଜିଦ ଚେଯେ ଚେଯେ ଦେଖେ । ତାରପର ମଧୁର ହେସେ ଆନ୍ତେ ମାଥା ନେଡ଼େ ବଲେ,
—ଅମନ କରି ହାଟିତେ ନାଇ ।

ଥମକେ ଗିଯେ ରହିମା ତାର ଦିକେ ତାକାଯ ।



মজিদ বলে,

—অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোষ্ঠা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা-থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন শুনাহু।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরুবিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহিমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

—অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমন্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াত শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্পাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে বিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, শ্বাসী মজিদকে ভয় পায়।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংক্রণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিলে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মর্যাদার ভুয়ো ঝাঙা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবার রক্ষ দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়ত দুনিয়ার দূরিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের চাহিতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা ঝুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটলধরা জ্যেষ্ঠের জমি-সব জমি একান্ত আগন; কোনটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুহ মুর্মু বা জরাজর্জের আত্মীয় জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়ত কাঠফাটা রোদ, হয়ত মুষলধারে বৃষ্টি-তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলা মাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ তুকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে-তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সবত্ত্বে, সন্ন্যেহে সাফ করে যত জঞ্জল। কিন্তু জঞ্জলের আবার শেষ নেই। কার্তিকে পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে-জমিকে জঞ্জলমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, বিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা-ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়ত চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নয়তায় নীল হয়ে



জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে-ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দিখা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্শ আকাশের তলে কচি নধর ধান দেখে শক্তি হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর থা থা করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে-মন-কে মন।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সঙ্গে আসে ঝাড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়ত না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধূংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিন্দি হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তপুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরাতি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়ত তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়ত করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়র চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্নরে শুঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরেতো এদেরই রক্ষ, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাঁটাশোটা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখিছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, যিলমিল করতে থাকা ধানের শিমে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাহসের শামিল খেয়াল করে না। শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্য চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জ্মায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময়, চিরনীর মাজারের পাশে তারা স্বন্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা শুনাগার। জ্মায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কর না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীর সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখ্যমাত্র হিসেবে তার কথা সাঁথে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা-এ-কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদ আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিএঁকে প্রশ্ন করে,

—কলমা জানো মিএঁ?

ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিএঁ। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে ওঠে মজিদ বলে,

—হাসিও না মিএঁ!

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিএঁ।



সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে। চোখ কিন্তু তার পিটিপিট করে। বলে,

—আমি গরিব মুরগুক মানুষ।

খোদাকে হয়ত সে জানে। কিন্তু জ্ঞালন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাঞ্চ হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে—গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,

—কলমা জানস্ন না ব্যাটো?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মক্ষব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি-যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান—সেখানে একদা এক মক্ষবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত।

অবশ্যে মজিদ আদেশ দেয়।

—ব্যাপারীর মক্ষবে তুমি কল্মা শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

—গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়ত মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

—হইছে হইছে, ভাগ্ম।

সে-রাতে দোয়া-দরুন সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চৃপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে-মাঠ দূরে আবহাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রাম নিষ্ঠক। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্রা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহববতনগর গ্রামে সে-শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপন্থিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ এই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক, প্রতিপন্থির ভয়ে তারা মুখে রা না-করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ওই সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহিমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহিমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত-সবার মনে সে-ছবি স্পষ্ট। প্রথম



ବିଯେର ସମୟ ତାରା ତାକେ ଦେଖେଛେ, ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ପରା ତାକେ ଦେଖେଛେ । କିନ୍ତୁ ଓରାଇ ଆଜ ଏକେ ଚେଳେ ନା । କଥା କଥ ଅନ୍ୟଭାବେ, ଗଲା ନରମ କରେ ସୁପାରିଶେର ଜନ୍ୟେ ଧରେ । ଖିଡ଼କିର ଦରଜା ଦିଯେ ଆସେ ତାରା, ଏସେ ସନ୍ତର୍ପଣେ କଥା କଥ । କାନ୍ଦଲେଓ ଚେପେ ଚେପେ କାଂଦେ । ବାହିରେ ମାଜାର ଯେମନ ରହସ୍ୟମୟ ତାଦେର କାହେ, ମଜିଦଙ୍କ ତେମନି ରହସ୍ୟମୟ । ମଜିଦ ଧରା-ଛୋଇର ବାହିରେ । ଯୋଗସ୍ତ୍ର ହଞ୍ଚେ ରହିମା ।

ରହିମା ଶୋନେ ତାଦେର କଥା । କଥନୋ ହୃଦୟ ଗଲେ ଆସେ ଅପରେର ଦୁଃଖେର କଥା ଶୁଣେ, କଥନୋ ଛଲଛଲ କରେ ଓଠେ ଚୋଥ । ଗଭୀର ରାତେ କଥନୋ ମାଜାରେ ଧାରେ ଗିଯେ ଦାଁଡିଯେ ନିର୍ମିୟେ ଚୋଥେ ତାକିଯେ ଥାକେ ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ତ୍ରକ, ବିଚିତ୍ର ସେଇ ମାଜାରେ ପାଲେ । ମାଥାଯ କପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋମଟା ଟାନା, ଦେହ ନିଶ୍ଚଳ । ତାକିଯେ ଥାକତେ ଥାକତେ ଘୋର ଲାଗେ, ଚୋଥ ଅବଶ ହୁୟେ ଆସେ, ମହାଶକ୍ତିର କାହେ ପାଛେ କୋନୋ ବେଯାଦବି କରେ ବସେ ସେ-ଭୟେ ବୁକ କେଂପେ ଓଠେ କଥନୋ । ତବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ଦାଁଡିଯେ ଥାକେ । ଭାବେ, କୋନ ମାରଫକ ଓଖାନେ ଘୁମିଯେ ଆହେନ-ଯୀର ରହ ଏଥନୋ ମାନୁଷେର ଦୁଃଖ ସାତନାୟ କାଂଦେ, ତାଦେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟେ ଆକୁଳ ହୁୟେ ଥାକେ ସଦାସର୍ବଦା?

କଥନୋ କଥନୋ ଅତି ସଜ୍ଜେପନେ ରହିମା ଏକଟା ଆର୍ଜି ଜାନାଯ । ବଲେ, ତାର ସନ୍ତାନ ନେଇ; ସନ୍ତାନଶୂନ୍ୟ କୋଲଟି ଖା-ଖା କରେ । ତିନି ତାକେ ଯେନ ଏକଟି ସନ୍ତାନ ଦେନ । ଆର୍ଜି ଜାନାଯ ଚୋଥେର ଆକୁଳତାଯ, ଏଦିକେ ଟୌଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଂପେ ନା । ଅତି ଗୋପନ ମନେର କଥା ଶିଶୁ ରସଲଭାୟ, ସାଲୁକାପଡ଼େ ଢାକା ରହସ୍ୟମୟ ମାଜାରେ ପାଲେ ଚେଯେ ବଲେ-ନା-ହୟ ଲଜ୍ଜା, ନା-ହୟ ବିଧା । ଏକଦିନ ହଠାତ ଏହି ସମୟ ଦମକା ହାଓୟା ଛୋଟେ, ଜଙ୍ଗଲେର ସେ-କଟା ଗାଛ ଆଜୋ ଅକର୍ତ୍ତିତ ଅବଭାୟ ବିରାଜମାନ ତାତେ ଆଚମକା ଗୋଙ୍ଗାନି ଧରେ । ହାଓୟା ଏସେ ଏଥାନେ ସାଲୁକାପଡ଼େର ପ୍ରାନ୍ତ ନାଡ଼େ; କେଂପେ-ଓଠେ ମୋମବାତିର ଆଲୋଯ ଝଲମଲ କରେ ଓଠେ ବୁପାଲି ଝାଲର । ରହିମାଓ କେଂପେ ଓଠେ, କୀ ଏକଟା ମହାଭୟ ତାର ରଙ୍ଗ ଶୀତଳ କରେ ଦେଯ । ମନେ ହୁୟ, କେ ଯେନ କଥା କହିବେ, ଆକାଶେର ମହା-ତମସାର ବୁକ ଥେକେ ବିଚିତ୍ର ଏକ କର୍ତ୍ତ ସହସା ଜେଗେ ଉଠିବେ । ଆବାର ହିର ହୁୟେ ଯାଯ, ମୋମବାତିର ଶିଖାଓ ନିକଷମ୍ପ, ହିର ହୁୟେ ଓଠେ । ଓପରେ ଆକାଶଭରା ତାରା ତେମନି ନୀରବ ।

କୋନୋଦିନ ରହିମା ସାରା ମାନବଜାତିର ଜନ୍ୟେ ଦୋଯା କରେ । ଓ-ପାଡ଼ାର ଛୁନୁର ବାପ ମରଗରୋଗ ଯତ୍ରଣା ପାଛେ, ତାକେ ଶାନ୍ତି ଦାଓ । ଖେତାନିର ମା ପକ୍ଷାଘାତେ କଟି ପାଛେ-ତାର ଓପର କରଣା କର, ରହମତ କର । ଚାର ଗ୍ରାମ ପରେ ବଡ଼ ନଦୀ । କ-ଦିନ ଆଗେ ସେ-ନଦୀତେ ଝାଡ଼େର ମୁଖେ ଭୁବେ ମାରା ଗେଛେ କ-ଟି ଲୋକ । ତାଦେର କଥା ସ୍ମରଣ କରେ ବଲେ, ଘରେ ତ୍ରୀ-ପୁତ୍ର ରେଖେ ନୌକା ନିଯେ ଯାରା ନଦୀତେ ଯାଯ ତାଦେର ଓପର ଯେନ ତୋମାର ରହମତ ହୁୟ ।

ଅନେକ ସମୟ ଅତ୍ୱତ ଆର୍ଜି ନିଯେ ମେଯେଲୋକେରା ଆସେ ରହିମାର କାହେ । ଯେମନ ଆସେ ଧାନ-ଭାନୁନି ହାସୁନିର ମା । ବହୁଦିନ ଆଗେ ନିରାକ ପଡ଼ା ଏକ ଶ୍ରାବନେର ଦୁପୁରେ ମାଛ ଧରତେ ମତିଗଞ୍ଜେର ସଡ଼କେର ଓପର ଯାରା ପ୍ରଥମ ମଜିଦକେ ଦେଖେଛିଲ, ସେଇ ତାହେର ଆର କାଦେରେର ବୋନ ହାସୁନିର ମା । ସେ ଏସେ ବଲେ,

-ଆମାର ଏକ ଆର୍ଜି ।

ଏମନ ଏକ ଭଜିତେ ବଲେ ଯେ ରହିମାର ହାସି ପାଯ । କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେଇ ହାସେ, ଗଭୀର ହୁୟେ ଥାକେ ବାହିରେ । ହାସୁନିର ମା ବଲେ,

-ଆମାର ଆର୍ଜି— ଓନାରେ କହିବେନ, ଆମାର ଯେନ ମାତ୍ର ହୁୟ ।

ଏବାର ଈଷଣ ହେସେ ରହିମା ବଲେ;

-କ୍ୟାନ ଗୋ ବିଟି?

-ଜ୍ଞାଲା ଆର ସହିଯ ହୁୟ ନା ବୁବୁ । ଆଲ୍ଲାଯ ଯେନ ଆମାରେ ସତ୍ତର ଦୁନିଆ ଥିକା ଲାଇୟା ଯାଯ ।

ସକୋତୁକେ ରହିମା ଥଣ୍ଡ କରେ,

-ତୋମାର ହାସୁନିର କୀ ହିବ ତୁମି ମରଲେ?



সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর জোগায় মুখে।

—তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হয়।

রহিমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

—আমার এক আর্জি বুবু।

—কও?

ওনারে কইবেন— বুড়াবুড়ি দুইগারে জানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতালা। কৃত্রিম বিশ্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহিমা প্রশ্ন করে,

—ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

—হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা স্লোকটি তেড়ে আসে বারবার, মুণ্ড ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাকিয়ে-ঝাকিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়।

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে—আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চূপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

—হনছস্ কথা, হনছস?

ছেলেরা সমস্তেরে বলে,

—ঠ্যাঙ্গা বেটিরে, ঠ্যাঙ্গা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

—থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উত্তর শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহিমাকে এসে বলে কথাটা।

—হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক-নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার।

হঠাৎ সমবেদনায় রহিমার চোখ ছলছল করে ওঠে। বলে,

—তুমি দৃঢ় করিও না বিটি। আমি কমুনে।



মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুষ্টা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিনি তিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহিমা বলে,

—শুভরবাড়িতে যাওনা ক্যান?

—আরা মনুষ্যি না।

—নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুরু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রং ধরে। বতোর দিলে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ঝাঁক্তি নেই। মুখে বরফও চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

—শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁচির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

—খানকির বেটি নিকা করবো বইলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাথে না। হেসে বলে,—গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিও একবার দেখিয়ে দিত।

দূরে ধানক্ষেত্রে বাঢ় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অঙ্ক হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত চেউ। ধানক্ষেত্রের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়; নিকা করবি মাণি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেত্রে যেন চেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে,—তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধম্কে ওঠে।

—কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

—তা হজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যামনে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারী গলায় বলে,

—আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মর্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?



দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অঙ্ককার দেখে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়ত সে শেষই হয়ে যেত-যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

—বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান—

আবার কতকঙ্গ নীরব থেকে মজিদ বলে,

—বিবিবে কইয়া দিয়ো, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবত হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

—হজুর, কোথিকা হনলেন বেটির কথা?

—তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো—কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বললো কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি-সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মালা-মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃশ্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি-যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুইচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়ত তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিল সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মতো কথা ফুটতো মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্য নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহে। তবে কী হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে-কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোবে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না—তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তা ছাড়া, কথাটায় যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে! এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিল, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হত কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে বাগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জন্মাব উঠেছিল।

একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কাণ্টা নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙ্গানি খেয়েও কথাটা যখন শীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে চুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড়চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অঙ্ককার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর



শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা-ওরে ভাতার-খাইকা জারনি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার ঘেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছাড়িয়ে তৌক্ষকর্ত্তে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরঞ্চে, আর সে ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফুরন দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ স্টান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহিমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। প্রথমে কিছু বোৰা গেল না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এইটুকু বোৰা গেল যে, সে রহিমাকে বলছে : ওনারে কন্তু, আমার মণ্ডতের জন্য জানি দোয়া করে।

মজিদ হাঁকা টানে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। ত্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে—এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাতে কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার ঘেয়েকে ঘেরেছে। ঘেরেছে এই জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ শুম হয়ে থেকে মজিদ গভীর কর্ত্তে রহিমাকে বলে,

—আরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহিমা বলে,

—ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুটিছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতৃহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গভীর কর্ত্তে বলে,—থাক তাইলে এইখানে।

অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। চেঙ্গা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাস্বা; অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শান্তি বিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারী বাজাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

—তোমার বিবি কী বলে?



মুখ না তুলে বুড়ো বলে,
 –হেই কথা আপনারা ব্যাকই জানেন।
 কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিএঁ।
 বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও তাকায় না।
 খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,
 –এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?
 কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো—এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,
 –এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগি বুটমুট একখান কথা কয়—তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিয়ু?
 ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উভর শুনে তারও চোখ
 জলে ধিকিধিকি।
 লোকটির উভরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুভৱের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধরকে ওঠে বলে,
 –কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?
 জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে,—কথা ঠিক কইরা কও মিএঁ, কথা ঠিক কইরা কও।
 বৈঠক শান্ত হলে খালের ব্যাপারী আবার বলে,
 –তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান?
 –আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি!—লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উভর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই
 ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্ষেত্রের আগুন
 জ্বলছে—বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক না কেন।
 ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়।
 ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুবিয়ে বলেছিল সে, এবং ভেবেছিল তার পক্ষ থেকে খালেক
 ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশংগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস
 করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।
 মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর
 হাত। আসল কথা শুরু করবার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে
 তার বক্ষব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার ‘ভাই সকল’ বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা’লার কুদরত
 মানুষের বুবাবার ক্ষমতা নাই। দোষ শুণে স্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেন্টাও আছে।
 তাদের মধ্যে শুনাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরি
 বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে—তারা
 এইসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিঙ্গ করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বক্ষ; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার
 চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে
 আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমস্ত পৃথিবীতে।



খাজুভঙ্গিতে বসে গঞ্জীর কষ্টে ঢালু সুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তন্ধ ঘরে তার কষ্টে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারও দিকে তাকায় না। দাঢ়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

—পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর বানি এল মুস্তাফিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছেট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসমানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়ে হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অঙ্গে শয়তানের একচত্র প্রভুত্ব- যারা তারই চক্রান্তে খোদার বোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বধিত করে রাখে, তাদেরই বিশাঙ্ক রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল। হজরতের এতো পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগল। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবর্দ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতাঁলা মানবজাতিকে বললেন—

থেমে বিসমিত্তাহ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আল-নূর থেকে খানিকটা কেরাত পড়ে শোনায়। তার গঞ্জীর কষ্ট হঠাত মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তন্ধ ঘরে বিচ্ছি সুরবাংকার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাত একসময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে-লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়েছিল, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উন্দত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নামায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতাঁলার ভেদ তাঁরই সৃষ্টি বান্দার পক্ষে বোৰা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উন্দত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ-শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালো ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্য সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ঝঠায়। তার গুনাহ বড় মন্ত গুনাহ তার শান্তি বড় কঠিন শান্তি।

হঠাত মজিদের গলা বাল্যন করে ওঠে।

—তুমি কী মনে করো যিএও? তুমি কি মনে করো তোমার বিবি যিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে অয়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস্ ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাঁটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ-এতদিন পর আজ সন্দেহ! বল্দিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচত, হাসিখুশি উচ্ছলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠেছিল সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা



সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেয়ানান দেখাত না। কিন্তু আজ এত দিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রান্দি খোলস-তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের ঘন্থে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

—কী যিএঁ? তোমার দিলে কি য়ালা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রঞ্জনিপঞ্চশিসের স্তুতি নামে এবং সে-স্তুতির মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঙ্গনা আবার যেন আপনা থেকেই বাহ্যিক হয়ে ওঠে। সে বাংকার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থি-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

—কী কয়? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামলে কয় দিলের কথা?

—কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচেছে না কোথাও।

—তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিষ্পত্তি রঞ্জন করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিশ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেশ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাতে ঝজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শাস্তির ঝরনার মতো বেয়ে-বেয়ে আসে, ঝরে-ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজি বৃন্দ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কানায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শাস্তি গলায় বলে,

—তুমি কিংবা তোমার বিবি শুন্দুক কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে শিল্প দিবা পাঁচ পইসার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হৃকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাতে তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্জনভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সেকথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে-কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দেবিশীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।



হঠাতে রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, ওঠে গিয়ে চেলাকাট দিয়ে এ-মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উঠিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ হয়ে থাকে। চৃপচাপ শয়ে কেবল ভাবে। পৌরষের গর্ব ধূলিসাং হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠেই না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

—দেখ তো, ব্যাটা কি মরলো নাকি?

ছেলেরা ধরকে ওঠে মাঝের ওপর। বলে, কী যে কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

—তাই ক। আমার কি তেমন কপালভা!

আর মারবে না প্রতিশ্রূতি সঙ্গেও বড় ভয়ে-ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো-কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

—বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু-দিন পরে বড় ওঠে। আকাশে দুর্বত হাওয়া আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহবত নগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তর্বর্ক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শৌ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশংস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

বড় এলে হাসুনির মার হই হই করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেল রে, ছাগলটা কোথায় গেল রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেল রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী-একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

বড় আসছে হ-হ করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা ঝুঁজে পায় না। পেছনে বোপবাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কি না দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুর-কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়ত বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাতে কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য-শূন্য ঠেকে। বলে,

—আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে থায়। ক্ষিধা রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিড়া কটা গলাধংকরণ করে বলে,

—পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুত্তাপ আর মায়া-মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।

বুড়ো ঢকচক করে পানি থায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

—আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরও, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা তেওে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোগের অঙ্ককারের মধ্যে নিবন্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঁড়িয়ে-গোঁড়িয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় শুমরায়। সিঙ্গ কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে যেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অঙ্ককার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে-মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইয়া কষ্ট দিছি হে-দিন।

যেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝাড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরও পানি আসে, ছহ করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেল। কেউ বলতে পারল না গেল কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ঢুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কত দূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তন্ত্র হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তেলাওয়াত শুনেছে অনেক দিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

-আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে ওঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা-

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুবোছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ-যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে—সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গৃহতন্ত্র বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মানুষের ঘঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতুহল প্রকাশ করা অর্থহীন। ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথায় ভেসে উঠেছে কি না জানার জন্য কৌতুহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতুহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশঁস্তি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে-প্রশঁস্তি দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া-না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া-না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরবেদ্ধ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতুহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাহাত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জ্বালায় কেমন অস্ত্র-অস্ত্র করেছিল— যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি শুলিসাং হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

এ বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চির নীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্জ্যবন্ধীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই স্মৃত মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়—সে-কথা এরা বোঝে।



ହାସୁନିର ମାର ମନେଓ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ । ମାସଙ୍ଗଲୋ ଘୁରେ ଏଳେ ବରଷଣ ବାପେର ନିରଂଦେଶ ହବାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ଖୁଜେ ପାଇ ।

—ଖୋଦାର ଜିନିସ ଖୋଦା ତୁଇଲା ଲଇୟା ଗେଛେ!

ତାରପର ମାର ପ୍ରତି ଅହିଦୃଷ୍ଟି ହାନେ ।

—ବାପ ଆମାଗୋ ନେକବନ୍ଦ ମାନୁଷ ଆଛିଲ ।

ବୁଡ଼ି କିଛୁ ବଲେ ନା । ଖେଳୋଯାଡ଼ ଚଲେ ଗେଛେ, ଖେଲବେ କାର ସାଥେ । ତାଇ ଯେନ ଚୁପଚାପ ଥାକେ ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ହାସୁନିର ମା ମଜିଦେର ବାସାଯ ଆସତ ନା । ଲଜ୍ଜା ହତୋ । ମାର ଲଜ୍ଜା ନେଇ ବଲେ ତାର ଲଜ୍ଜା । ତାରପର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସତେ ଲାଗଲ । କଥନୋ କୃଚ୍ଛି ମଜିଦେର ସାମନାସାମନି ହୟେ ଗେଲେ ମାଥାଯ ଆଧହାତ ଘୋମଟା ଟେନେ ଆଡ଼ାଲେ ଗିଯେ ଦାଁଡାତ, ଆର ବୁକ୍ଟା ଦୁରକୁ ଦୁରକୁ କାପତ ଭଯେ । ବତୋର ଦିନେ ଏ-ବାଡ଼ିତେ ଯାତାଯାତ ସଖନ ବେଡ଼େ ଗେଲ ତଥନ ଏକଦିନ ଉଠାନେ ଏକେବାରେ ସାମନାସାମନି ହୟେ ଗେଲ । ମଜିଦେର ହାତେ ଛୁକ୍କା । ହାସୁନିର ମା ଫିରେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛେ ଏମନ ସମୟେ ମଜିଦ ବଲେ,

—ଛୁକ୍କାୟ ଏକ ଛିଲିମ ତାମାକ ଭଇରା ଦେଓ ଗୋ ବିଟି ।

କଥେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇତ୍ତନ୍ତ କରେ ଘୁରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ସେ ଛୁକ୍କାଟା ନେଯ । ବୁକ କାପତେ ଥାକେ ଧପଧପ କରେ, ଆର ଲଜ୍ଜାଯ ଚୋଥ ବୁଜେ ଆସତେ ଚାଯ ।

ଛୁକ୍କାଟା ଦିତେ ଗିଯେ ମଜିଦ କଥେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଟା ଧରେ ରାଖେ । ତାରପର ହଠାତ୍ ବଲେ, ଆହା!

ତାର ଗଲା ବେଦନାୟ ଛଲଛଳ କରେ ।

ତାରପର ଥେକେ ସଂକୋଚ ଆର ତଥ କାଟେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଖୋଲା-ମୁଖେ ସାମନେ ଦିଯେ ଆସା-ଯାଓୟା ଶୁକ କରେ । ନା କରେ ଉପାୟ କି! ବତୋର ଦିନେ କାଜେର ଅନ୍ତ ନେଇ । ମାନୁଷ ତୋ ରହିମା ଆର ସେ । ଧାନ ଏଲାନୋ-ମାଡ଼ାନୋ, ସିନ୍ଦ୍ର କରା, ଭାନା-କତ କାଜ ।

ଏକଦିନ ଉଠାନେ ଧାନ ଛଡ଼ାତେ ଛଡ଼ାତେ ହଠାତ୍ ବହଦିନ ପର ହାସୁନିର ମା ତାର ପୁରାନୋ ଆର୍ଜି ଜାନାଯ । ରହିମାକେ ବଲେ,

—ଓନାରେ କଳ, ଖୋଦାୟ ଜାନି ଆମାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଯ ।

ହଠାତ୍ ରହିମା ରକ୍ଷି ସ୍ଵରେ ବଲେ,

—ଅମନ କଥା କହିଓନା ବିଟି, ସରେ ବାଲା ଆଇସେ ।

ପରଦିନ ମଜିଦ ଏକଟା ଶାଡ଼ି ଆନିଯେ ଦେଯ । ବେଶ୍ଣି ରଂ, କାଲୋ ପାଡ଼ । ଖୁଶି ହୟେ ହାସୁନିର ମା ମୁଖ ଗଭୀର କରେ । ବଲେ,

—ଆମାର ଶାଡ଼ିର ଦରକାର କୀ ବୁବୁ? ହାସୁନିର ଏକଟା ଜାମା ଦିଲେ ଓ ପରତ ଥନ ।

ହଠାତ୍ କୀ ହୟ, ରହିମା କିଛୁ ବଲେ ନା । ଅନ୍ୟଦିନ ହଲେ, କଥା ନା ବଲୁକ ଅନ୍ତତ ହାସତ । ଆଜ ହାସେଓ ନା ।

ପୌଷ୍ଟେର ଶୀତ । ପ୍ରାନ୍ତର ଥେକେ ଠାଙ୍ଗ ହାୟା ଏସେ ହାଡ଼ କାପାଯ । ଗଭୀର ରାତେ ରହିମା ଆର ହାସୁନିର ମା ଧାନ ସିନ୍ଦ୍ର କରେ । ଖଡ଼କୁଟୋ ଦିଯେ ଆଶ୍ରମ ଜ୍ଞାଲିଯେଛେ, ଆଲୋକିତ ହୟେ ଉଠେଛେ ସାରା ଉଠାନଟା । ଓପରେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର । ଗନ୍ଧନେ ଆଶ୍ରମର ଶିଥା ଯେନ ମେ-କାଲୋ ଆକାଶ ଗିଯେ ଛୋଯ । ଓଧାରେ ଧୋଯା ହୟ, ଶବ୍ଦ ହୟ ଭାପେର । ଯେନ ଶତସହଶ୍ର ସାପ ଶିସ ଦେଯ ।

শেষ রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈমৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে-ঈমৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা যসৃণ উঠানটাকে শুভতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে শিরশির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহিমাকে সে লক্ষ করেনি, সে-রহিমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভৃতি! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অঙ্ককার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহিমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

—পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহিমা চেনে। অঙ্ককার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তুপিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

—ওই ধারে এত কাম ফজরের আগে শেষ করল লাগবো।

—থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিন্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারী হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অঙ্ককারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্ত্রিতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা? তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অঙ্ককার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্তি-অস্তির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিতে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহিমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিন্ধ হয়েছে কি না। সেও তাকায় না রহিমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পূব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লোথগতি আলো এসে রাতের অঙ্ককার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাত ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন ওঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যুষের বিরবির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরম্পরের পানে। নতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে-চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিন্দুয়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে।



ଶୁଣେ ମଜିଦ ମୁଖ ଗଣ୍ଡିର କରେ । ଦାଁଢ଼ିତେ ହାତ ବୁଲିଯେ ଆକାଶେର ପାନେ ତାକାଯ । ବଲେ, ଖୋଦାର ରହମତ । ଖୋଦାଇ ରିଜିକ ଦେନେଓଯାଳା । ତାରପର ଇଞ୍ଜିଟେ ମାଜାରେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ବଲେ, ଆର ତାନାର ଦୋଯା ।

ଶୁଣେ କାରାଓ ଚୋଖ ଛଲଛଲ କରେ ଓଠେ, ଆର ଆବେଗେ ରଙ୍ଗ ହେୟ ଆସେ କର୍ତ୍ତ । କେନ ଆସବେ ନା । ଧାନ ହେୟେଛେ ଏବାର । ମଜିଦେର ସରେ ସେମନ ମଗଡ଼ାଗୁଲୋ ଉପଚେ ପଡ଼ିଛେ ଧାନେର ପ୍ରାଚୁର୍ୟ, ତେମନି ସରେ-ସରେ ଧାନେର ବନ୍ୟା । ତବେ ଜୀବନେ ଯାରା ଅନେକ ଦେଖେଛେ, ଯାରା ସମସ୍ତଦାର, ତାରା ଅହଂକାର ଦାବିଯେ ରାଖେ । ଧାନେର ପ୍ରାଚୁର୍ୟ କାରାଓ କାରାଓ ବୁକେ ଆଶକ୍ତାଓ ଜାଗେ ।

ବସ୍ତୁତ, ମଜିଦକେ ଦେଖେ ତାଦେର ଆସଲ କଥା ସ୍ମରଣ ହୟ । ଖୋଦାର ରହମତ ନା ହଲେ ମାଠେ-ମାଠେ ଧାନ ହତେ ପାରେ ନା । ତାର ରହମତ ଯଦି ଶୁକିଯେ ଯାଇ-ବର୍ଧିତ ନା ହୟ, ତବେ ଖାମାର ଶୂନ୍ୟ ହେୟ ଥା ଥା କରେ । ବିଶେଷ ଦିନେ ସେ-କଥାଟା ସ୍ମରଣ କରିବାର ଜନ୍ୟ ମଜିଦେର ମତୋ ଲୋକେର ସାହୟ ନେୟ । ତାର କାହେଇ ଶୋକର ଗୁଜାର କରିବାର ଭାଷା ଶିଖିତେ ଆସେ । ଅପୂର୍ବ ଦୀନତାଯ ଚୋଖ ତୁଲେ ମଜିଦ ବଲେ, ଦୁନିଆଦାରି କି ତାର କାଜ? ଖୋଦାତାଙ୍କା ଅବଶ୍ୟ ଦୁନିଆର କାଜକାମକେ ଅବହେଲା କରତେ ବଲେନନି, କିନ୍ତୁ ଯାର ଅନ୍ତରେ ଖୋଦା-ରସୁଲେର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗେ, ତାର କି ଆର ଦୁନିଆଦାରି ଭାଲୋ ଲାଗେ? –ବଲେ ମଜିଦ ଚୋଖ ପିଟ-ପିଟ କରେ-ଯେନ ତାର ଚୋଖ ଛଲଛଲ କରେ ଉଠେଛେ । ସେ ଶୋନେ ସେ ଯାଥା ନାଡ଼େ ଘନ-ଘନ ।

ଅମ୍ପଟ ଗଲାଯ ସେ ଆବାର ବଲେ,
–ଖୋଦାର ରହମତ ସବ ।

ଆରାଓ ବଲେ ଯେ, ସେ-ରହମତେର ଜନ୍ୟ ସେ ଖୋଦାର କାହେ ହାଜାରବାର ଶୋକରଗୁଜାରି କରେ । କିନ୍ତୁ ଆବାର ଦୁ-ଯୁଠୋ ଭାତ ଖେତେ ନା ପେଲେଓ ତାର ଚିତ୍ତା ନେଇ । ଖୋଦାର ଓପର ଯାର ପ୍ରାଣ-ମନ-ଦେହ ନ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଖୋଦାର ଓପର ସେ ତୋଯାକୁଳ କରେ, ତାର ଆବାର ଏସବ ତୁଚ୍ଛ କଥା ନିଯେ ଭାବନା । ବଲତେ ବଲତେ ଏବାର ଏକଟା ବିଚିତ୍ର ହାସି ଫୁଟେ ଓଠେ ମଜିଦେର ମୁଖେ, କୋଟିରାଗତ ଚୋଖ ଝାପସା ହେୟ ଓଠେ ଦିଗନ୍ତପ୍ରସାରୀ ଦୂରତ୍ତେ ।

ତାର ସେ-ଚୋଥେ ଦିଗନ୍ତପ୍ରସାରୀ ଦୂରତ୍ତ ଜେଗେ ଓଠେ, ସେ-ଚୋଥେ କ୍ରମଶ ସୂଳ ଓ ସୂଚାଥ ତୀକ୍ଷ୍ନ ହେୟ ଓଠେ ।

ହଠାତ୍ ସଚେତନ ହେୟ ମଜିଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

–ତୋମାର କେମନ ଧାନ ହିଁଲ ମିଏତା?

ତୁମି ବଲୁକ ଆପନି ବଲୁକ ସକଳକେ ମିଏତା ବଲେ ସମ୍ବେଦନ କରାର ଅଭ୍ୟାସ ମଜିଦେର । ଲୋକଟି ଘାଡ଼ ଚଲକେ ନିତି-ବିତି କରେ ବଲେ,-ୟା-ଇ ହଇଛେ ତା-ଇ ଯଥେଷ୍ଟ । ଛେଲେପୁଲେ ଲଇଯା ଦୁଇ ବେଳା ଖାଇବାର ପାରନ୍ତ ।

ଆସଲେ ଏଦେର ବଡ଼ାଇ କରାଇ ଅଭ୍ୟାସ । ପଞ୍ଚଶଶ ମନ ଧାନ ହଲେ ଅନ୍ତର ଏକଶ ମନ ବଲା ଚାଇ । ବତୋର ଦିନେ ଉଁଚିଯେ ଉଁଚିଯେ ରାଖା ଧାନେର ପ୍ରତି ସବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାନ୍ତେ ଚାଇ । ଲୋକଟିର ଧାନ ଭାଲୋଇ ହେୟେଛେ, ବଲତେ ଗେଲେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଏମନ ଫସଳ ହେୟନି । କିନ୍ତୁ ମଜିଦେର ସାମନେ ବଡ଼ାଇ କରା ତୋ ଦୂରେର କଥା, ନ୍ୟାୟ କଥାଟା ବଲତେଇ ତାର ମୁଖେ କେମନ ବାଧେ । ତା ଛାଡ଼ା, ଖୋଦାର କାଳାମ ଜାନା ଲୋକେର ସାମନେ ଭାବନା କେମନ ସେନ ଗୁଲିଯେ ଯାଇ । କୀ କଥା ବଲଲେ କୀ ହବେ ବୁଝେ ନା ଓଠେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ।

କଥାର କଥା କଥା ମଜିଦ, ତାଇ ଉତ୍ତରେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଥାକେ ନା । ତାର ଅନ୍ତରେ କ୍ରମଶ ସେ ଆଶ୍ରମ ଜୁଲେ ଉଠେଛେ, ତାରଇ ଶିଖାର ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭବ କରେ । ସେ-ଉତ୍ତାପ ଭାଲୋଇ ଲାଗେ ।

ଲୋକଟି ଅବଶେଷେ ଉଠେ ଦାଁଢ଼ାଯ । ତବେ ଯାବାର ଆଗେ ହଠାତ୍ ଏମନ ଏକଟା କଥା ବଲେ ଯେ, ମଜିଦ ସେଥାନେ ଦାଁଢ଼ିଯେଛିଲ ସେଥାନେଇ ବୃକ୍ଷର ମତୋ ଦାଁଢ଼ିଯେ ଥାକେ ଅନେକକ୍ଷଣ । ଏବଂ ସେ-ଆଶ୍ରମ ଜୁଲେ ଉଠିଲି ଅନ୍ତରେ, ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନିର୍ବାପିତ ହୟ । ସଂକ୍ଷେପେ ବ୍ୟାପାରଟି ହଲୋ ଏହି— ଗୁହସରେ ଗୋଲାଯ-ଗୋଲାଯ ସବଳ ଧାନ ଭରେ ଓଠେ ତଥିନ ଦେଶମଯ ଆବାର ପିରଦେର ସଫର ଶୁରୁ ହୟ । ଏହି ସମୟ ଖାତିର-ସତ୍ତା ହୟ, ମାନୁଷେର ମେଜାଜଟାଓ ଖୋଲାସା ଥାକେ । ସେବାର ଆକାଶ ପଡ଼େ, ସେବାର ଅତି ଭକ୍ତ ମୁରିଦେର ସରେଓ ଦୁଦିନ ଗା ଚଲେ ଥାକତେ ତରସା ହୟ ନା ପିର ସାହେବଦେର ।



দিন কয়েক হলো তিন গ্রাম পরে এক পির সাহেবের এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

পির সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিল তাঁর চোখে, আর কঠে বজ্জিনীনাদ। একদা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ-দূর দেশে আসেন। সে কত দিন আগে তা পির সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অঙ্গতা স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই—কেবল বৃহৎ খড়গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্তালে উন্নত-ভাবতে কোনো-এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দ্ধ জবান এন্টেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পির সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই; তাঁর সমক্ষে গঁজেরও শেষ নেই। সে-গঁজ তাঁর রূহানি তাকত ও কাশ্ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জামাজা-পড়ানো খোন্কার-মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উচুতে, কিন্তু রূহানি তাকত তার নেই বলে অন্তরে-অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো-কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা ব্যক্ত করে। কিন্তু করে এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে, তা মহৎ ব্যক্তির দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মজিদ নিশ্চিন্ত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পিররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাঢ়েন তখন মজিদ কিন্তু শক্তি হয়ে উঠে। তব হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আআর শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্টি মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। অতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতাঁলার ভেদ বোঝা কি সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পির সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পির সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুম্ব দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্ধিকটে গিয়ে তার নূরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারও চোখ বলসে যায়, কারও এমন চোখ-ভাসানো কান্না পায় যে, তার এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পির সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারী বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গঁউর হয়ে থাকে। রহিমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে-আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উন্নরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহিমা হঠাত বলে,

—এক পির সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?



ପାଥର ଏବାର ହଠାତ୍ ନଡ଼େ । ଆବଛା ଅନ୍ଧକାରେ ମଜିଦେର ଚୋଥ ଝଲେ ଓଠେ । କ୍ଷଣକାଳ ନୀରବ ଥେକେ ହଠାତ୍ କଟମଟ କରେ ତାକିଯେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

—ଯରା ମାନୁଷ ଜିନ୍ଦା ହୁ କ୍ୟାମନେ?

ପ୍ରଶ୍ନଟା କୌତୁଳେର ନୟ ଦେଖେ ରହିମା ଦମେ ଗେଲ । ତାରପର ଆର କୋନୋ କଥା ହୟ ନା । ଏକ ସମୟ ରହିମା ପାଶେ ଶୁଯେ ଆଲଗୋଛେ ସୁମିଯେ ପଡ଼େ ।

ମଜିଦ ଘୁମୋଯ ନା । ସେ ବୁବୋଛେ ବ୍ୟାପାରଟା ଅନେକ ଦୂର ଏଗିଯେ ଗେଛେ, ଏବାର କିନ୍ତୁ ଏକଟା ନା କରଲେ ନୟ । ଆଜଙ୍କ ଅପରାହ୍ନେ ସେ ଦେଖେଛେ, ମତିଗଞ୍ଜେର ସଡ଼କଟା ଦିଯେ ଦଲେ-ଦଲେ ଲୋକ ଚଲେଛେ ଉତ୍ତର ଦିକେ ।

ମଜିଦ ତାବେ ଆର ତାବେ । ରାତ ଯତ ଗଭୀର ହୟ ତତ ଆଶ୍ଵନ ହୟ ଓଠେ ମାଥା । ମାନୁମେର ନିର୍ବୋଧ ବୋକାମିର ଜନ୍ୟ ଆର ତାର ଅକୃତଜ୍ଞତାର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ମାରାତ୍ମକ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ଉଷ୍ଣ ରଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟେ ଟଗବଗ କରତେ ଥାକେ । ସେ ଛଟଫଟ କରେ ଏକଟା ନିଷଳ ଝୋଖେ ।

ଏକସମୟ ଭାବେ, ବାଲର-ଦେୟା ସାଲୁକାପଡ଼େ ଆବୃତ ନକଳ ମାଜାରଟିଇ ଏଦେର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ତାଦେର ନିମକହାରାମିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଦାନ । ଭାବେ, ଏକଦିନ ମାଥାଯ ଖୁଲ ଚଢେ ଗେଲେ ସେ ତାଦେର ବଲେ ଦେବେ ଆସଲ କଥା । ବଲେ ଦିଯେ ହାସବେ ହା-ହା କରେ ଗଗନ ବିଦୀର୍ଘ କରେ । ଶୁଣେ ଯଦି ତାଦେର ବୁକ ଡେଙ୍ଗେ ଯାଇ ତବେଇ ତୃଷ୍ଣ ହବେ ତାର ରିଙ୍କ ମନ । ମଜିଦ ତାର ଘରବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରେ ସରେ ପଡ଼ିବେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ପଥେ-ସାଟେ । ଏ-ବିଚିତ୍ର ବିଶାଳ ଦୁନିଆଯ କି ଯାବାର ଜ୍ଞାଯଗାର କୋନୋ ଅଭାବ ଆଛେ?

ଅବଶ୍ୟ ଏ-ଭାବନା ଗଭୀର ରାତେ ନିଜେର ବିହାନାୟ ଶୁଯେଇ ସେ ଭାବେ । ସଥିନ ମାଥା ଶୀତଳ ହୟ, ନିଷଳ କ୍ରୋଧ ହତାଶାୟ ଗଲେ ଯାଇ, ତଥିନ ସେ ଆବାର ଶୁମ ହୟ ଥାକେ । ତାରପର ଶ୍ରାନ୍ତ, ବିକ୍ଷୁଳ ମନେ ହଠାତ୍ ଏକଟି ଚିକନ ବୁନ୍ଦିରଶ୍ମୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୟ ।

ଶୀଘ୍ର ତାର ଚୋଥ ଚକଚକ କରେ ଓଠେ, ଶ୍ଵାସ ଦ୍ରୁତତର ହୟ । ଉତ୍ୱେଜନାୟ ଆଧା ଓଠେ ବସେ ଅନ୍ଧକାର ଭେଦ କରେ ରହିମାର ପାନେ ତାକାଯ । ପାଶେ ସେ ଅଘୋର ଘୁମେ ବେଚାଇନ ।

ତାକେଇ ଅକାରଗେ କରେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚେଯେ-ଚେଯେ ଦେଖେ ମଜିଦ, ତାରପର ଆବାର ଚିତ ହୟ ଶୁଯେ ଚୋଥଖୋଲା ମୃତେର ମତୋ ପଡ଼େ ଥାକେ ।

ମଜିଦ ସଥିନ ଆଓୟାଲପୁର ଗ୍ରାମେ ପୌଛିଲ ତଥିନ ସୂର୍ୟ ହେଲେ ପଡ଼େଛେ । ମତଲୁବ ମିଶାର ବାଡ଼ିର ସାମନ୍ୟକାର ମାଠଟା ଲୋକେ-ଲୋକାରଣ୍ୟ । ତାର ମଧ୍ୟେ କୋଥାଯ ସେ ପିର ସାହେବ ବସେ ଆଛେନ ବୋବା ମୁଶକିଲ । ମଜିଦ ବେଁଟେ ମାନୁଷ । ପାରେର ଆଶ୍ରଳେ ଦାଁଡିଯେ ବକେର ମତୋ ଗଲା ବାଡ଼ିଯେ ପିର ସାହେବକେ ଏକବାର ଦେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । କିନ୍ତୁ କାଳୋ ମାଥାର ସମୁଦ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ବ୍ୟାହତ ହୟ ଫିରେ ଆସେ ।

ଏକଜନ ବଲଲେ ଯେ, ବଟଗାଟ୍ଟାର ତଳେ ତିନି ବସେ ଆଛେ । ତଥିନ ମାଘେର ଶେରାଶେରି । ତବୁ ଜନ-ସମୁଦ୍ରେ ଉତ୍ତାପେ ପିର ସାହେବେର ଗରମ ଲେଗେଛେ ବଲେ ତାର ଗାୟେ ହାତିର କାନେର ମତୋ ମୃତ ବାଲରଓୟାଲା ପାଥା ନିଯେ ହାଓୟା କରଛେ ଏକଟି ଲୋକ । କେବଳ ସେ-ପାଖାଟା ଥେକେ-ଥେକେ ନଜରେ ପଡ଼େ ।

ମୁଖ ତୁଲେ ରେଖେ ଭିଡ଼ ଠେଲେ ଏଗିଯେ ଯେତେ ଲାଗଲ ମଜିଦ । ସାମନେ ଶତ ଶତ ଲୋକ ସବ ବିଭୋର ହୟ ବସେ ଆଛେ, କେଉଁ କାଉକେ ଲକ୍ଷ କରିବାର କଥା ନଯ । ମଜିଦକେ ଚେନେ ଏମନ ଲୋକ ଭିଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ଅନେକ ଆଛେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର କେଉଁ ଆଜ ତାକେ ଚେନେ ନା । ସେଇ ବିଶାଳ ସୂର୍ୟଦୀର୍ଘ ହୟେଛେ, ଆର ସେ-ଆଲୋଯ ପ୍ରଦୀପେର ଆଲୋ ନିଚିହ୍ନ ହୟ ଗେଛେ । ପିର ସାହେବ ଆଜ ଦଫାଯ-ଦଫାଯ ଓୟାଜ କରାଛେ । ସଥିନ ଓୟାଜ ଶେଷ କରେ ତିନି ବସେ ପଡ଼େନ ତଥିନ ଅନେକକ୍ଷଣ ଧରେ ତାର ବିଶାଳ ବପୁ ଦ୍ରୁତ ଶ୍ଵସନେର ତାଳେ-ତାଳେ ଓଠା-ନାମା କରେ, ଆର ଶୁଣ ଉତ୍ସ ଚଉଡ଼ା କପାଳେ ଜମେ ଓଠା ବିନ୍ଦୁ-ବିନ୍ଦୁ ଘାମ ଖୋଲା ମାଠେର ଉଞ୍ଜଳ ଆଲୋଯ ଚକଚକ କରେ । ପାଥା ହାତେ ଦାଁଡିଯେ ଥାକା ଲୋକଟି ଜୋରେ ହାତ ଚାଲାଯ ।



এ-সময় পির সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিয়া ইজুরের শুগাঞ্চল সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে হয়ত তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা বলে, কারও-বা আবার ঢুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পালে তাকিয়ে সে মৃত্তিবৎ বসে থাকে। আধা ঘন্টা পরে শীতের বিপ্রাহরিক আয়েজে জনতা ঈষৎ বিমিয়ে এসেছে, এমনি সময়ে হঠাতে জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠল। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল— পির সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পির সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রাণে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুর্খিত হয়ে ওঠে।

পির সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধা ঘন্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন-সোহবতে তোয়ালে তুরা তোয়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে) –তখন গোটা জমায়েতেরই সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পির সাহেব পাখাওয়ালার পালে লাল-হয়ে-ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা-সংঘালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পির সাহেবকে ঘেরাও করে ফেলে। হঠাতে পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারল ধরল, -কেউ পা, কেউ হাত, কেউ আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। মানুষের ভাবমতো দেখে পির সাহেব অভ্যন্ত। কিন্তু আজকের ক্রমনৱাত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলো সহসা এই আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য হলো না। তিনি হঠাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠল পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা, আর তা-শুনে জমায়েতও হায়-হায় করে উঠল। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এই মর্মে যে, তাদের পির সাহেব তো শূল্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পির সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারী পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনে দ্রুত বিস্তারের মতো পির সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে-না-দেখতে ছাড়িয়ে গেল। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিল, এবার তারা মড়া কান্না জুড়ে বসল। পির সাহেব কি তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ-মূর্ধ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারি ঢেউয়ের মতো সম্মুখে ভেঙে এল জনশ্রোত। অনেক মড়া-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পির সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশ্যে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পির সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

-ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেল।



নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাতে সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠল। শত শত নামাজেরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠল।

সে-কর্তৃ মজিদের।

—যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মশ্রু! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করল,

—চেচামিচি করতা কিছুকা ওয়াত্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিথে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

—কোন নামাজ হইল এটা?

—কাহে? জোহরকা নামাজ হ্যাঁ।

উন্নত শুনে আবার চিন্কার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পির সাহেবের হৃকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিথে এসেছে সে বোঝানোর পছন্টা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভদ্র মাস থেকে ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, দু-কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে মাপো। এবং পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।

শুনে মজিদ কুর্দিসত্তমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বললে,

—কেন, তখন তোগো পির ধইরা রাখবার পারল না সুরুষ্টারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্জ্বকষ্টে ডাকলে,

—মহবতনগর যাইবেন কে কে?

মহবতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমৃঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কারও কারও মনে ভয়ও হয়েছিল—এই বুবি পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এল।

মতিগঞ্জের সড়কে ওঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিঃশ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকালো। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অর্থ পরিব্রত ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ-চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সন্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।



মজিদ শুরুগঠনীর কষ্টে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করল-ভাই সকলরা, সকলে অবগত আছেন যে, বেদাতি কোনো কিছু খোদাতালার অধিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুক্ত করবার জন্য মনোমুক্তকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে রূপ যতই মনোমুক্তকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে মুখোশ চিনে ফেলতে বিদ্যুমাত্র দেরি হয় না। তা ছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভঙ্গল হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেল, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।

ভানিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। আওয়ালপুরে তথাকথিত যে-পির সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে-যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহানামের দিকে চালিত করা। সে উদ্দেশ্যে তথাকথিত পিরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটু ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরণ্হ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ-যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজা করেননি-তাঁরা খোদার কাছে শুন্ধান্হ করছেন।

এ পর্যন্ত বলে বিশ্ময়াহত স্তুক লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজুঁই গলায় প্রশ্ন করে, হৃনলেনতো ভাই সকল? সাব্যন্ত হলো, অন্তত, এ-আমের কোনো মানুষ পির সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহববতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেল যে না, তা নয়। কিন্তু গেল অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পির সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেশত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল কতক্ষণ।

কালু মিয়া গোঙ্গায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মন্ত ব্যাঙ্গেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাঁড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মন্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর সুলিলিত কষ্টে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙ্গাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিশ্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে, -পোলাঙ্গলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে। ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।



ଭାଂ-ଗୋଜା ଖାଓୟା ରସକମଶ୍ନ୍ୟ ହାଡ଼ିଗିଲେ ଚେହାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟାରରେ । ପ୍ରଥମେ ଦୁଟୋ ପଯସାର ଲୋତେ ତାର ଚୋଥ ଚକଚକ କରେ ଉଠେଛିଲ, କିନ୍ତୁ ହୋଯାବେର କଥା ଶୁଣେ ଏକବାର ଆପାଦମଞ୍ଜକ ମଜିଦକେ ଦେଖେ ନେଇ । ତାରପର ନିରମତରେ ହାତେର ଶିଶିଟା ଝାଁକାତେ ଝାଁକାତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚଲେ ଯାଇ ।

ଆମେ କିମେ ମଜିଦ କାଳୁ ମିଯାର ବାପେର ସଙ୍ଗେ ଦୁ-ଚାରଟେ କଥା କରୁ । ବୁଡ଼ୋ ଏକ ଛିଲିମ ତାମାକ ଏନେ ଦେଇ । ମଜିଦ ନିଜେ ଗିଯେ ଛେଲେକେ ଦେଖେ ଏସେହେ ବଲେ କୃତଜ୍ଞତାୟ ତାର ଚୋଥ ଛଲଛଳ କରେ । ଟଙ୍କା ତୁଳେ ନେବାର ଆଗେ ମଜିଦ ବଲେ,

—କୋନୋ ଚିନ୍ତା କରିବାନା ମିଯା । ଖୋଦା ଭରସା । ତାରପର ବଲେ ଯେ, ହାସପାତାଲେର ବଡ଼ ଡାକ୍ତାରକେ ସେ ନିଜେଇ ବଲେ ଏସେହେ, ଓଦେର ଯେନ ଆଦରଯତ୍ତ ହୁଏ । ଡାକ୍ତାରକେ ଅବଶ୍ୟ କଥାଟା ବଲାର କୋନୋ ପ୍ରୋଜନ ଛିଲ ନା, କାରଣ, ଗିଯେ ଦେଖେ, ଏମନିତେଇ ଶାହି କାଣ୍ଡକାରଖାନା । ଓସୁଧପତ୍ର ବା ସେବା ଶୁକ୍ଳାବାର ଶେଷ ନାହିଁ ।

ଖୁବ ଜୋରେ ଦର୍ଶକ କମେ ଏକଗାଲ ଧୋୟା ଛେଡ଼େ ଆରା ଶୋନାଯି ଯେ, ତବୁ ତାର କଥା ଶୁଣେ ଡାକ୍ତାର ବଲେନ, ତିନି ଦେଖିବେଳ ଓଦେର ଯେନ ଅଯତ୍ତ ବା ତକଲିଫ ନା ହୁଏ । ତାରପର ଆରେକଟା କଥାର ଲେଜୁଡ଼ ଲାଗାଯ । କଥାଟା ଅବଶ୍ୟ ମିଥ୍ୟେ; ଏବଂ ସଞ୍ଜାନେ ସୁହୁ ଦେହେ ମିଥ୍ୟେ କଥା କରୁ ବଲେ ମନେ-ମନେ ତତ୍ତ୍ଵବା କାଟେ । କିନ୍ତୁ କୀ କରା ଯାଇ । ଦୁନିଆଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜାଯଗା । ସମୟ-ଅସମୟେ ମିଥ୍ୟେ କଥା ନା ବଲିଲେ ନା ।

ବଲେ, ଡାକ୍ତାର ସାହେବ ତାର ମୁରିଦ କି ନା ତାଇ ସେଥାନେ ମଜିଦେର ବଡ଼ ଖାତିର ।

ବାଇରେ ନିରଦ୍ଵିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ ଥାକଲେଓ ଭେତରେ-ଭେତରେ ମଜିଦେର ମନ କ-ଦିନ ଧରେ ଚିନ୍ତାୟ ଘୂରପାକ ଥାଇ । ଆଓୟାଲପୁରେ ଯେ ପିର ସାହେବ ଆଶାନା ଗେଡ଼େଛେ ତିନି ସୋଜା ଲୋକ ନନ । ବହୁ-ପୂର୍ବ ଆଗେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଶ୍ରମ ସ୍ଥିକାର କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦାଢ଼ି ନିଯେ ଶାନ୍ଦାର ଜୋବାଜୁବା ପରେ ଯେ-ଲୋକଟି ଏଦେଶେ ଆସେନ, ତାଁର ରଙ୍ଗ ଭାଟିର ଦେଶେର ମେଘ-ପାନିତେଓ ଏକେବାରେ ଆ-ନୋନା ହୁଏ ଯାଇଲା । ପାନ୍ସା ହୁଏ ଗିଯେ ଥାକଲେଓ ପିର ସାହେବେର ଶରୀରେ ସେ-ଭାଗ୍ୟାନ୍ବେଷୀ ଦୁଃଖାହୀସୀ ବ୍ୟକ୍ତିରଇ ରଙ୍ଗ । କାଜେଇ ଏକଟା ପାଲ୍ଟା ଜୋବାବେର ଅସ୍ତିକର ପ୍ରତ୍ୟାଶାୟ ଥାକେ ମଜିଦ । ମହବତନଗରେର ଲୋକେରା ଆର ଓଦିକେ ଯାଇ ନା । କାଜେଇ, ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଆସେଇ ଆଗେ-ଭାଗେ ତାର ହଦିଶ ପାବାର ଜୋ ନେଇ । ସେ ଜନ୍ୟ ମଜିଦେର ମନେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରାତଦିନ ଆରା ଓ ଥଚଖଚ କରେ ।

ମଜିଦ ଓ-ତରଫ ଥେକେ କିଛୁ ଏକଟା ଆଶା କରିଲେ କୀ ହବେ, ତିନ ଆମ ଡିଗିଯେ ମହବତନଗରେ ଏସେ ହାମଳା କରାର କୋନୋ ଥେଯାଲ ପିର ସାହେବେର ମନେ ଛିଲ ନା । ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ତାଁର ଜଇଫ ଅବହୁ । ଏ-ବଯାସେ ଦାଙ୍ଗବାଜି ହୈ-ହାଙ୍ଗମା ଆର ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା । ସାଗରେଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ କେଉଁ, ବିଶେଷ କରେ ପ୍ରଧାନ ମୁରିଦ ଯତନୁବ୍ରତୀ ଥାଇ, ଏକଟା ଜଙ୍ଗି ଭାବ ଦେଖାଲେଓ ହଜୁରେର ନିଷ୍ପତ୍ତା ଦେଖେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ଠାଙ୍ଗା ହୁଏ ଯାଇ । ପିର ସାହେବ ଅପରିସୀମ ଉଦାରତା ଦେଖିଯେ ବଲେନ, କୁତ୍ତା ତୋମାକେ କାମଡ଼ାଲେ ତୁମିଓ କି ଉଲ୍ଲଟୋ ତାକେ କାମଡ଼େ ଦେବେ? ଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସାଗରେଦରା ନିରାନ୍ତ ହୁଏ । ତବୁ ହିସର କରେ ଯେ, ମଜିଦ କିଂବା ତାର ଚେଲାରା ଯଦି କେଉଁ ଏଧାରେ ଆସେ ତବେ ଏକହାତ ଦେଖେ ନେଇବା ଯାବେ । ସେଦିନ କାଳୁଦେର କହ୍ନା ଯେ ଧଡ଼ ଥେକେ ଆଲାଦା କରତେ ପାରେନି, ସେ-ଜନ୍ୟ ମନେ ପ୍ରବଳ ଆଫସୋସ ହୁଏ ।

ଆମେର ଏକଟି ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରଟା ଠିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ ନା । ସେ ଅନ୍ଦରେର ଲୋକ, ଆର ତାର ତାଗିଦଟା ପ୍ରାୟ ବାଁଚା-ମରାର ମତୋ ଜୋରାଲୋ । ପିର ସାହେବେର ସାହାଯ୍ୟେର ତାର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୋଜନ । ନା ହଲେ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଲେ ଯାଇ ।



সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, আজ তিনিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হৃতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আন্ত-আন্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পির সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়ত বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নতুন এক আগম্ভুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন তার জন্মও নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, সন্তানের মার শেষ কাটালৈ।

কিন্তু মুশকিল হলো কথাটা পাঢ়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে করতে এদিকে মজিদ কাঙ্টা করে বসল। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পির সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পির সাবের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।-

-পানিপড়া ক্যান?

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরও দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উভরেই বোবো,-তাই দোয়া করে মনে মনে।

উভর পায় না বলেই ব্যাপারী বোবো। তারপর বলে, আইচছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পির সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো দেঁষা যায় না। অবশ্য পির সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউয়ের খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পির নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাড়ুর-চাবা-মাঠাইলুরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পির ডাকা। এবৎ সমাজের মূল হলো একটি লোক-যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনশ্রেণীতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্টো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্জনে না জানলেও তারা একটা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবির কানাসজল কর্ষের আকৃতি-ফিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়ত একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্তুর এক ভাই থাকে। নাম ধলা মিয়া। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়-দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। কুচিং কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়ত-বা শালার সঙ্গে খানিক মক্ষরাও করে।



ତାକେ ଡେକେ ବ୍ୟାପାରୀ ବଲଲେ : ଏକଟା କାମ କରେନ ଧଳା ମିଯା ।

ବ୍ୟାପାରୀର ସାମନେ ବସେ କଥା କହିତେ ହଲେ ଚରମ ଅସ୍ତି ବୋଧ କରେ ମେ । କେମନ ଏକଟା ପାଲାଇ-ପାଲାଇ ଭାବ ତାକେ ଅସ୍ତିର କରେ ରାଖେ । କୋନୋମତେ ବଲେ,

-କୀ କାମ ଦୁଲା ମିଯା?

କୀ ତାର କାଜ ବ୍ୟାପାରୀ ଆଗାଗୋଡ଼ା ବୁଝିଯେ ବଲେ । ଆଗେ ପ୍ରଥମ ବିବିର ଦିଲେର ଖାୟେଶେର କଥା ଦୀର୍ଘ ଭଣିତା ସହକାରେ ବର୍ଣନ କରେ । ତାରପର ବଲେ, ବ୍ୟାପାରଟା ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ, ଏବଂ ଆଓୟାଲପୁର ତାକେ ରଞ୍ଜନା ହତେ ହେବେ ଶେଷରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ-ସାତେ କାକପକ୍ଷୀଓ ଖବର ନା ପାଇ । ଆର ମେଖାନେ ଗିଯେ ତାକେ ପ୍ରଚୁର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରତେ ହେବେ । ଏ-ଥାମେ ଥେକେ ଗେଛେ ଏ-କଥା ସୁଗାନ୍ଧରେଓ ବଲତେ ପାରବେ ନା । ବଲବେ ଯେ, କରିମଗଞ୍ଜେର ଓପାରେ ତାର ବାଡ଼ି । ବଡ଼ ବିପଦେ ପଡ଼େ ଏସେହେ ପିର ସାହେବେର ଦୋଯା ପାନିର ଜନ୍ୟ । ତାର ଏକ ନିକଟତମ ନିଃସନ୍ତାନ ଆଜୀଯାର ଏକଟା ଛେଲେ ଜନ୍ୟ ବଡ଼ ସଥ ହେଯେଛେ । ସଥେର ଚେଯେଓ ଯେଟା ବଡ଼ କଥା, ସେଟା ହଲୋ ଏହି ଯେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନୋ ଛେଲେପୁଲେ ଯଦି ନା-ଇ ହୟ ତବେ ବଂଶେର ବାତି ଜ୍ଞାଲାବାର ଆର କେଉ ଥାକବେ ନା । ମୋଟ କଥା, ବ୍ୟାପାରଟା ଏମନ କରଣ୍ଣଭାବେ ତାକେ ବୁଝିଯେ ବଲତେ ହେବେ ଯେ, ଶୁନେ ପିର ସାହେବେର ମନ ଗଲେ ଯେନ ପାନି ହେଯେ ଯାଇ ।

ବିବିର ବଡ଼ ଭାଇ, କାଜେଇ ରେଣ୍ଟାଯ ମୁର୍କବି । ତବୁ ଧମକେ-ଧାମକେ କଥା ବଲେ ବ୍ୟାପାରୀ । ପରଗାଛା ମୁର୍କବିକେ ଆବାର ସମ୍ମାନ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଆବାର କେତାଦୁରସ୍ତ କଥା ।

-କି ଗୋ ଧଳା ମିଯା, ବୁଝାନ ନି ଆମାର କଥାଡ଼ା?

-ଜି ବୁଝାଇ । କାଁଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଡ଼ କାତ କରେ ଧଳା ମିଯା ଜବାବ ଦେଯ । ପ୍ରତ୍ତାବ ଶୁନେ ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ଭାବିତ ହୟ । ଭାବନାର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଯେ, ଆଓୟାଲପୁର ଓ ମହବେତନଗରେର ମାବପଥେ ଏକଟା ମନ୍ତ୍ର ତେଁତୁଲ ଗାଛ ପଡ଼େ ଏବଂ ସବାଇ ଜାନେ ଯେ ସେଟା ସାଧାରଣ ଗାଛ ନାଁ, ଦନ୍ତରମତ ଦେବାଣ୍ଣି ।

କାକପକ୍ଷୀ ଯଥନ ଦୁମିଯେ ଥାକେ ତଥନ ଅନେକ ରାତ । ଅତ ରାତେ କି ଏକାକି ଓହି ତେଁତୁଲ ଗାଛେର ସନ୍ନିକଟେ ସେଁଷା ଯାଇ? ଭାବନାର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଛିଲ ଯେ, ଯେ-ସବ ଦାଙ୍ଗ-ହାଙ୍ଗମାର କଥା ଶୁନେଛେ, ତାରପର କୋନ ସାହୁସ ପା ଦେଇ ମତଲୁବ ଥାର ଥାମେ । ତେଁତୁଲ ଗାଛେର ଫାଡ଼ାଟା କାଟିଲେଓ ଓଇଖାନେ ଗିଯେ ପିର ସାହେବେର ଦଜ୍ଜାଲ ସାଙ୍ଗ-ପାଙ୍ଗଦେର ହାତ ଥେକେ ରେହାଇ ପାଓୟା ନେହାତ ସହଜ ହେବେ ନା । ନିଜେର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚରାଇ ସେ ଲୁକୋବାର ଚେଷ୍ଟା କରବେ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼େ ଯାବେ ନା, କୀ ବିଶ୍ୱାସ! କେ କଥନ ଚିନେ ଫେଲେ କିଛୁ ଠିକ ନେଇ । ଯେ ଚେଷ୍ଟା ଲସା ଧଳା ମିଏଣ୍ଟା ।

-ଭାବେନ କୀ? ହମକି ଦିଯେ ବ୍ୟାପାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

-ଜି, କିଛୁ ନା!

ତବୁ କେବେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ପାନେ ଚେଯେ ଥେକେ ବ୍ୟାପାରୀ ବଲେ,

-ଆରେକ କଥା । କଥାଡ଼ା ଜାନି ଆପନାର ବହିନେ ନା ହୁନେ । ଆପନାରେ ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରଲାମ ।

-ତା କରବାର ପାରେନ ।

ସାରାଦିନ ଧଳା ମିଯା ଭାବେ, ଭାବେ । ଭାବତେ-ଭାବତେ ଧଳା ମିଏଣ୍ଟା କାଲା ମିଏଣ୍ଟା ବନେ ଯାବାର ଯୋଗାଡ଼ । ବିକେଲେର ଦିକେ କିନ୍ତୁ ଏକଟା ବୁଦ୍ଧି ଗଜାଯ । ବ୍ୟାପାରୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗେ ବାଇରେ ଘରେ ବସେ ନଲେର ହିଁକାଯ ଟାନ ଦିଛିଲ, ହଠାତ୍ ସେଟା ନାମିଯେ ରେଖେ ସେ ସରାସରି ବାଇରେ ଚଲେ ଯାଇ । ତାରପର ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ପା ଫେଲେ ହାଁଟିତେ ଥାକେ ମୋଦାଚେହର ପୀରେର ମାଜାରେର ଦିକେ । ହାଁଟାର ଢଂ ଦେଖେ ପଥେ ଦୁ-ଚାରାଜନ ଲୋକ ଥ ହେଁ ଦାଢ଼ିଯେ ଯାଇ-ତାର ଭ୍ରକ୍ଷେପ ନେଇ ।



বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,
—আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে ন্ম হলেও উভেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভণিতা সহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর
রং ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে-ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলা মিয়া কথা পাঢ়ে।
বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুরু। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ
জাগবে কেন আমেনা বিবি? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিষ্ঠার থাকে না।
খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিয়াকে ডেকে বলে দিল, আওয়ালপুরে গিয়ে পির সাহেবটির কাছ থেকে
সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাত তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,
—তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলা মিয়া হঠাত ফিচ্কি দিয়ে হাসে।

—আওয়ালপুর গেলে কী আর আপনার কাছে আছি? কী কেলা পানি পড়াড়া দিব হে লোকটা? বেচারির মনে মনে
যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব? —আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াড়া—আর কথাড়া
একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়। তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা
দেখে ধলা মিওর সব উভেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিঙ্গ কঠে সে প্রশ্ন করে,

—কী কন?

—কী আর কয়। এই সব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত না মামলা-মকদ্দমা?
দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতালার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলা মিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অঙ্ককারে দেবংশি তেঁতুলগাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ
ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পির সাহেবের ডাঙাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও
গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়ত ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলা মিয়া বলে,

—আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পিরের কাছে আমি যামু না।

—যাইবেন না ক্যান? এবার একটু ক্ষণ স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিয়া যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলা মিয়া বিভ্রান্ত হয়ে যায়।
অবশেষে কথাটার সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

—হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামুনে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলা মিয়ার মতলব, শেষ রাতে ওঠে গ্রামের বাইরে কোথায় গা-চাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে
মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পির সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারী যে-টাকা



ଦିବେ ତାର ଅର୍ଧେକ ବେମାଲୁମ ପକେଟସ୍ତ କରେ ବାକିଟା ମଜିଦକେ ଦେବେ । ମଜିଦ ଥାଯ ଘରେର ଲୋକ । ବ୍ୟାପାରୀର କାହେ ତାର ଦାବି-ଦାଓୟା ନେଇ । ଦିଲେଓ ଚଲେ, ନା ଦିଲେଓ ଚଲେ । ତବୁ କଥାଟା ଧାମାଚାପା ଦିଯେ ରାଖତେ ହଲେ ମଜିଦେର ମୁଖକେଓ ଚାପା ଦିତେ ହୟ ।

—ତାଇଲେ ପାକାପାକି କଥା ହଇଲ । ଭରଦୁଷୁରେ ଆମି ଆସୁମ ନେ ପାନିପଡ଼ା ନିବାର ଜନ୍ୟ । ତାରପର ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବଲେ, ଠଗେର ପିଛନେ ବେହଦୀ ଟାକା ଢାଳନ କି ବିବେକ-ବିବେଚନାର କାମ?

ଟାକାର ଇଞ୍ଜିତଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋଭନୀୟ ବଟେ । କିନ୍ତୁ ତବୁ ମଜିଦ ତାର କଥାଯ ଅଟଲ ଥାକେ । ନିମରାଜିଓ ହୟ ନା । କଠିନ ଗଲାୟ ବଲେ,

—ନା, ଆପଣେ ଆଓୟାଲପୁରେଇ ଯାନ ।

ଏତକ୍ଷଣ ପର ଧଳା ମିଆ ବୋବେ ଯେ, ମଜିଦେର କଥାଟା ରାଗେର । ଖାତିରେ ବ୍ୟାପାରୀ ମଜିଦେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେର ବରଖେଲାକ୍ଷ କରେ ସେ-ଠକ-ପୌରେର କାହେଇ ଲୋକ ପାଠାବେ ପଡ଼ାପାନି ଆନବାର ଜନ୍ୟ-ସେଟା ତାର ପଛନ୍ଦସଇ ନୟ । ନା ହବାରଇ କଥା । ବ୍ୟାପାରଟା ଯୋଡ଼ା ଡିଙ୍ଗିଯେ ସାମ ଥାବାର ମତୋ ।

ଧଳା ମିଏଣା ଭାରୀମୁଖ ନିଯେ ପ୍ରଥାନ କରେ । ଘରେ କିମ୍ବରେ ଆବାର ଭାବତେ ଶୁରୁ କରେ । କିନ୍ତୁ କୋନୋ ବୃଦ୍ଧି ଠାହର କରବାର ଆଗେଇ ମଜିଦ ଏସେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତ ହୟ ବ୍ୟାପାରୀର ବୈଠକଥାନାୟ ।

ଯତକ୍ଷଣ ନତୁନ ଏକ ଛିଲିମ ତାମାକ ସାଜାନୋ ହୟ କଞ୍ଚିତେ, ତତକ୍ଷଣ ଦୁଜନେ ଗରୁ-ଛାଗଲେର କଥା କଯ । ଦୁରେକ ବାଡ଼ିତେ ଗରୁର ବ୍ୟାରାମେର କଥା ଶୋନା ଯାଚେ । ମଜିଦେର ଧାମଡା ଗାଇଟା ପେଟ ଫୁଲେ ଚୋଲ ହୟ ଆହେ । ରହିମା କତ ଚେଷ୍ଟା କରଛେ କିନ୍ତୁ ଗାଇଟା ଦାନା-ପାନି ନିଚ୍ଛେ ନା ମୁଖେ । ଖାଚେଇ ନା କିଛୁ, ଦୁଧଓ ଦିଚେଇ ନା ଏକ ଫୋଟା ।

ତାମାକ ଏଲେ କତକ୍ଷଣ ନୀରବେ ଧୂମପାନ କରେ ମଜିଦ । ତାରପର ଏକସମୟ ମୁଖ ତୁଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

—ହେଇ ପିରେର ବାଚା ପିର ଶୟତାନେର ଖବର କି? ଏହନୋ ଇମାନଦାର ମାନୁଷେର ସର୍ବନାଶ କରତାହେ ନା ସଟ୍ଟକାଇଛେ?

ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁନେ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଟୈଫ୍ ଚମକେ ଓଠେ, ତାରପର ତାର ଚୋଥେର ପାତାଯ ନାଚୁଣି ଧରେ । ଚୋଖ ଅନେକ କାରଣେଇ ନାଚେ । ତାଇ ଶୁଦ୍ଧ ନାଚଲେଇ ଘାବଡ଼ାବାର କୋନୋ କାରଣ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରୀର ମନେ ହୟ, ତାମାକ-ଧୋଯାର ପଞ୍ଚାତେ ମଜିଦେର ଚୋଖ ହଠାତ ଅସ୍ତାଭାବିକଭାବେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୟେ ଉଠେଇଛେ ଏବଂ ସେ-ଚୋଖ ଦିଯେ ସେ ତାର ମନେର କଥା କେତାବେର ଅକ୍ଷରଙ୍ଗଲୋର ମତୋ ଆଗାଗୋଡ଼ା ଅନାଯାସେ ପଡ଼େ ଫେଲାଇଛେ ।

—କୀ ଜାନି, କାଇବାର ପାରି ନା । ଅବଶ୍ୟେ ବ୍ୟାପାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଯ । କିନ୍ତୁ ଆଓୟାଜ ଶୁନେ ମନେ ହୟ ଗଲାଟା ଯେନ ଧିସେ ଗେହେ ହଠାତ । ସଜୋରେ ଏକବାର କେଶେ ନିଯେ ବଲେ, ହସତ ଗେହେ ପିଯା ।

ମଜିଦ ଆସେ ବଲେ,

—ତାଇଲେ ଆର ତାନାର କାହେ ଲୋକ ପାଠାଇଯା କୀ କରବେନ?

—ଲୋକ ପାଠାଯୁ ତାନାର କାହେ? ବିନ୍ଦୁରେ ବ୍ୟାପାରୀ ଫେଟେ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ମଜିଦେର ଶୀତଳ ଚୋଖ ଦୁଟୀର ପାନେ ତାକିଯେ ହଠାତ ମେ ବୋବେ ଯେ, ମିଥ୍ୟ କଥା ବଲା ବୁଝା । ଶୁଦ୍ଧ ବୁଝା ନୟ, ଚେଷ୍ଟା କରଲେ ବ୍ୟାପାରଟା ବଡ଼ ବିସଦୃଶ୍ୱାସ ଦେଖାବେ । ଯେ କରେଇ ହୋକ, ମଜିଦ ଖବରଟା ଜେନେଇଛେ ।

ଏକବାର ସଜୋରେ କେଶେ ଧିସେ ଯାଓୟା ଗଲାକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଚାଙ୍ଗ କରେ ତୁଲେ ବ୍ୟାପାରୀ ବଲେ,

—ହେଇ କଥା ଆମିଓ ଭାବତାହି । ଆହେ କି ନା ଆହେ-ହଦାହଦି ପାଠାନୋ । ତବୁ ମେଯେମାନୁଷେର ମନ । ସତୀନ ଆହେ ସରେ । କ୍ୟାମନେ କଥନ ଦିଲେ ଚୋଟ ପାଯ ଡର ଲାଗେ । ତା ଯାକ । ପାଇଲେ ପାଇଲ, ନା ପାଇଲେ ନାଇ । ଆସଲେ ମନ-ବୋକାନ ଆର କୀ । ଠଗ-ପିରେର ପାନିପଡ଼ାଯ କି କୋନୋ କାମ ହୟ?



ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে-ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে ছাঁকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মতো বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়। শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরও বলে যে, ধলা মিয়াকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে-ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহৱত্বনগরের লোক। তা ছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

ধলা মিয়ারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ভূয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই-

মজিদ বাধা দেয়। ধলা মিয়ার শুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাত মধুর হাসি হেসে বলে,

-খালি আমার দৃঢ়খড়া এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-গির বেশি হইল? আমার মুখে কি জোর নাই?

-আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

-কথাড়া ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কি, তাগো কথা হৃলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হৃলে কি দূনিয়া ঢলে?

ব্যাপারীর মন্ত গৌফে আর ঘন দাঢ়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

-ঠিকই কইছেন কথাড়া। কিন্তু কী করি এহন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

-তানারে কল, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাত কৌতুহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে! ব্যাপারীর অভ্যন্তর দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

-পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারও পড়ে সাত পঁ্যাচ, কারও চোদো। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদো পঁ্যাচ।

ব্যাপারী উৎকর্ষিত কঢ়ে প্রশ্ন করে,

-আমার বিবিরডা ছাড়ান যায় না?

-ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগব কয় পঁ্যাচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নঢ়ান্তি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে-তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহুরি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারও সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুন্ধচিত্তে সারা দিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরিফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া-দরূণ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘূরতে হবে।



যদি সাত পঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টন্টন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্ধিষ্ঠ কর্তে প্রশ্ন করে,

—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

—তয় বুঝতে হইব যে, তানার চোদ্দো পঁচ কি আরও বেশি। সাত পঁচ হইলে দুশিষ্ঠার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গুরুভাগের কথা পাড়ে। একসময় আড়-চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্মের ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরও দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ ওঠে পড়ে। ফেরবার পথে মোঞ্চা শেখের বাড়ির কাছে কাঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ঘোঁয়াতে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে শুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরও কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাঁড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

—কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিল সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম। বয়স হলেও আনড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাস-খানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নয় বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিল মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কর্তে দৰদ মাথিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাঙ-ফ্যাঙ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কর্তে বলে,

—মা মরছে!

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

—আহা, ক্যামনে মৱল গো বিটি?

—অ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃক্ষ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুত্তাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

—ছ্যামড়ারা কই?

—আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙ্গের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটভি কয় কেরায়া নামের মাঝি হইব।

—দাফন-কাফনের যোগাড়যজ্ঞ করতাছেনি?

—করতাছে। মোঞ্চা শেখে জানাজা পড়ব।

খেলাল ভুলে হঠাৎ দাঁত খোচাতে থাকে মজিদ, কগালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

—মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিলনি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

—মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না!

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরও কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোবো, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারও মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুকড়ানো রগ-বোলা যে-মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিষ্পন্দিতভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদম্বগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়ত দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীত্র আবার মিলিয়ে যাবে সে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে-কবরে লোকচোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করবে—এ-কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে ওঠে সে প্রশ্ন করে,

—মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উভর দিতে মজিদের মুখে বাধে। ঘেমে বলে,

—খোদা তারে বেহেন্ট-নসিব কর, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরগ-ভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়ত-বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে না তো?

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পির সাহেবের পানিপড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিল; কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং পঁ্যাচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীত্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আন্তে-আন্তে একটা ভয়ও এল মনে। পঁ্যাচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদ্দো কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউয়ের তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারও সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবহায়ার মধ্যে মাদুরে বসে শুন্ধনিয়ে কোরান শরিফ পড়ে।

মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্বাস পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহিমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার ফ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়-পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দুর্দণ্ড পড়া পানি, তার প্রতিটি ফেঁটা পরিত্ব। কাজেই মাখবার সময় পুরুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাথে।

রহিমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। একসময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

—বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

—আমি দেই নাই।

—দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। —তব তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চোদ্দো পঁ্যাচ?



ରହିମା ଲଜ୍ଜାର ହାସି ହେସେ ବଲେ,

—ତାନି ଯେ ଆମର ଶାରୀ । ଶାରୀ ହଇଲେ ଆୟମନେଇ ବୋବୋ ।

ତର ତାନି ବୋବୋନ ନା କ୍ୟାନ୍? ତାନୁ ବିବିର ତାନି ମାନେ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ।

ରହିମା ମୁଶକିଲେ ପଡ଼େ । ଦୁଇ ତାନିତେ ଯେ ଥଚୁର ତଫାତ ଆଛେ ସେ କଥା କି କରେ ବୋଝାଯା! ତାନୁ ବିବି ଏକଟୁ ବୋକା ଅର୍ଥ ଆବାର ଦେମାକି କିଛିମେର ମାନୁଷ । ଶାରୀ ବିନ୍ଦୁ ଜମିଜମାର ମାଲିକ ବଲେ ତାବେ, ତାର ତୁଳନାଯ ଆର କେଉ ନେଇ । ଶେଷେ ରହିମା ଆନ୍ତେ ବଲେ,

—ତାନି ଯେ ଖୋଦାର ମାନୁଷ ।

ଆମେନା ବିବିକେ ଗୋପନ କରିଯେ ବାଡିତେ ଫେରେ ରହିମା । ମଜିଦ ଉତ୍ସକର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଵରେ ବଲେ,

—ପଡ଼ା ପାନିଡା ନାପାକ ଜାଗାଯ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତୋ?

—ନା । ଯା ପଡ଼ିଛେ ତାଲାବେର ମଧ୍ୟେଇ ପଡ଼ିଛେ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଥନ ଦିଗନ୍ତ-ସୀମାରେଖାର କାହାକାହି ପୌଛେହେ ତଥନ ଜୋଯାନ-ମଦ୍ଦ ଦୁଜନ ବେହାରା ପାଲକି ଏଣେ ଲାଗାଲ ଅନ୍ଦର ସରେର ବେଡ଼ାର ପାଶେ ।

ଏକ ଟିଲେର ପଥ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରୀର ବ୍ୟାବ୍ସାୟ ବ୍ୟାବ୍ସାୟ ହେଁଟେ ଯେତେ ପାରେ ନା ।

ବ୍ୟାପାରୀ ହାଁକେ, —କହି ତୈଯାର ହିଛେନି?

ଆମେନା ବିବି ଆବହାରାର ମଧ୍ୟେ ତଥନେ ଶୁଣଗୁଣିଯେ କୋରାନ ଶରିଫ ପଡ଼ିଛେ । ଦୁପୁରେର ଦିକେ ଚେହାରା ତବୁ କିଛୁ ଜୋଲୁସ ଛିଲ, ଏଥନ ବେଳାଶେଷେର ଦ୍ଵାନ ଆଲୋଯ ଏକେବାରେ ଫ୍ୟାକାଶେ ଠେକେ । ତାର ଚେଷ୍ଟେର ସାମନେ ଆଁକାବାଁକା ପ୍ଯାଚାନୋ ଅକ୍ଷରଗୁଲୋ ନାଚେ, ଆବହା ହେଁ ଗିଯେ ଆବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଁ ଓଠେ, ଛୋଟ ହେଁ ଆବାର ହଠାତ୍ ବଡ଼ ହେଁ ଯାଇ । ଆର ଶୁଣ୍ଟ ଟୋଟ-ଦୁଟୋ ଥେକେ ଥେକେ ଥରଥରିଯେ କେଂପେ ଓଠେ ।

ତାନୁ ବିବି ଗିଯେ ତାକେ,

—ଓଠ ବୁବୁ, ସମୟ ହିଛେ ।

ଡାକ ଶୁଣେ ଫାଁସିର ଆସାମିର ମତୋ ଆମେନା ବିବି ଚମକେ ଓଠେ ଭୀତବିହଳ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଏକବାର ତାକାଯ ସତୀନେର ପାନେ । ତାରପର ଛୁରା ଶେଷ କରେ କୋରାନ ଶରିଫ ବଞ୍ଚ କରେ, ଗୋଲାଫେ ଭରେ, ଶେମେ ପାଲକମ୍ପଶେର ମତୋ ଆଲଗୋଛେ ତାତେ ଚମୁ ଥାଇ । ସେଟା ଓ ରେହେଲ ନିଯେ ଉଠେ ଦାଁଡାତେଇ ହଠାତ୍ ତାର ମାଥା ଘୁରେ ଚୋଥ ଅନ୍ଧକାର ହେଁ ଯାଇ, ଆର ଶରୀରଟା ଟାଲ ଥେଯେ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ ଯାବାର ଉପକ୍ରମ କରେ । ତାନୁ ବିବି ଧରେ ଫେଲେ ତାକେ । ତାରପର ଏକଟୁ ଆଦା-ନୁନ ମୁଖେ ଦିଯେ ଘରେର କୋଣେଇ ମଗରେବେର ନାମାଜଟା ଆମେନା ବିବି ସେରେ ନେଇ ।

ଉଠାନେର ପଥଟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବୋଥ କରେ ଆମେନା ବିବି । ପୁରା ତ୍ରିଶ ଦିନ ରୋଜା ରେଖେ ଯେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର କାହିଁଲ ହେଁ ନା ସେ ଏକଦିନେର ରୋଜାତେଇ ଏକେବାରେ ଭେଣେ ଗେଛେ । ଗାଯେ-ମାଥାଯ ବୁଟିଦାର ହଲୁଦ ରଙ୍ଗେ ଏକଟା ଚାଦର ଦିଯେହେ । ସେଟା ବୁକେର କାହେ ଚେପେ ଧରେ ଶୁଟି-ଶୁଟି ପାଯେ ହାଁଟେ । କିମେର ଏତ ଭୟ ତାକେ ପିଷେ ଧରେଛେ—କ-ଘଟ୍ଟାଯ ଯେ—ତଯ ଦୀର୍ଘ ରୋଗଭୋଗ-କରା ମାନୁଷେର ମତୋ ତାକେ ଦୁର୍ବଲ କରେ ଫେଲେଛେ? ଏକ ଯୁଗେରେ ଓପରେ ଯେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥାକତେ ପାରଲ ସେ ସଦି ଜାନେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତେତେ ସେ ତେମନି ନିଃସନ୍ତାନ ଥାକବେ, ତବେ ଏମନ ମୁଷଡ଼େ ଯାବାର କି ଆହେ? ଏ-ପଣ୍ଡ ଆମେନା ବିବି ତାର ନିଜେର ମନକେଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ।

ତବେ କଥା ହଚେ କୀ, ତେରୋ ବହରେର କଥା ଏକଦିନେ ଜାନେନି, ଜେନେହେ ଧାପେ-ଧାପେ ଧୀରେ-ଧୀରେ, ପ୍ରତିବଂସରେର ଶୂନ୍ୟତା ଥେକେ । ସେ-ଶୂନ୍ୟତାଓ ଆବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହରେର ଆଶାଯ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷରେ ତେଜଶୂନ୍ୟ ହେଁ ଗେଛେ । ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନେର



শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাঙিদ কি হঠাত ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে-ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে বাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু শুটি-শুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকচোল বাড়িয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়ত-বা পারতো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশে মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা করে না। এ-সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে, সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না।

সমাজই আত্মহত্যার মাল-মসলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মক্ষরা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহৃদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহুরারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখল।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, —নাববোঁ?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটি পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গঠীর। বলে,
—তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। খেমে বলে, তানার ওজু আছেনি?

ব্যাপারী ছুটে যায় পালকির কাছে। পর্দা দৃষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,

—আছেনি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

—তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাত সে চিকন সুরে দোয়া-দরুন পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে না। চোখ হঠাত তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পালকির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিন্দু হয় সে-পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ, পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য আরও সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পালকি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড় চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নতুন বউয়ের মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোকা যায়। লজ্জায় শ্রিয়মাণ নতুন বউ-এর আত্মসচেতন রক্তভাব তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই। আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধা-আধি খোলে। ঘরে ইতোমধ্যে অঙ্ককার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ঝানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোর সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত চিরনীরব



মাজারটি। সে নীরবতা যেন বিশ্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মতো শত-ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। যানুষের রক্ষণ্ট যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তখাপি মহাকাশের মতোই সে মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহাকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সৃষ্টিসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

—তানারে বইবার কল।

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

—বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারও পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সে আবার চোখ বুজে থাকে। মনে হয় তার শান্তি হয়েছে, আর আশা নেই। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলক্ষ্মির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, শোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়ত মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের স্কুল কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে-থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি থেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়ায় হয়ত-বা তা জৈবৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট যিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কষ্টে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। স্নেহ-মতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ বুপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাপের ভয়ে পালিয়ে যেত। এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবাণু ভরা লালসিঙ্গ কেতাবের জালির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে—যেখানে কাদামাটি লাগেনি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে ওঠে ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার স্কুল চোখ চক্র খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবন্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্তুল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্র খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়েন। তবু থেকে থেকে সেখানেই চক্র খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

একসময় মজিদ ওঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

—পানিটা দেন।



ব্যাপারীও তার স্তুল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তন্ত্র মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝংকার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় মীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তা ছাড়া ত্বক্ষার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষ্ক নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির প্লান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অঙ্গুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে, তানারে উঠবার কল। এহল পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়! দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দূলেই স্থির হয়ে যায়।

—আমি দোয়া-দরুণ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কল। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোগে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অঙ্গকারে। কালো রঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কঠের সুর আরও মিহি করে তোলে।

এক পাক, দুই পাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তন্ত্রতায় তার মুখ জমে আছে, সে স্তন্ত্রতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা-বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরও তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর-অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

এক পাক, দুই পাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অঙ্গকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়ত-বা তাকে আলিবালি দেখলও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখল না, জানল না ক-প্যাচ পড়েছে তার পেটে, জানল না মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উঠলে উঠত।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কঠে আর্তনাদ করে বলে,—কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মুর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।



ବାହିରେ ମାଜାରେ ରହିମା ଆସେ ନା । ଆଜ ଆମେନା ବିବି ଏମେହେ ବଲେ ହୟତ ଆସତ ଯଦି ନା ସଙ୍ଗେ ଥାକତ ବ୍ୟାପାରୀ । ମାଜାର ଘରେ ବେଡ଼ାର ଫୁଟୋତେ ଚୋଖ ପେତେ ମେ ବ୍ୟାପାରଟା ଦେଖଛିଲ । ସଙ୍ଗେ ହାସୁନିର ମା-ଓ ଛିଲ । ରହିମା ମନେ-ମନେ ହିର କରେଛିଲ, ପାକ ଦେୟା ଚୁକେ ଗେଲେ ଆମେନା ବିବିକେ ଭେତରେ ନିଯେ ଯାବେ, ସଖ କରେ ଯେ ଫିରନିଟା କରେଛେ ତା ଦେବେ ଥେତେ, ତାରପର ଦୁୟେକ ଥିଲି ପାନ ଚିବୋତେ ଚିବୋତେ ଦୁ-ଦୁଗୁ-ସୁଖ-ଦୁଃଖେର ଗଲ୍ଲ କରବେ । ନିଜେ ମେ ସ୍ଵଳ୍ପ-ଭାଷୀ ମାନୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେନା ବିବିର ହଦୟର ସଙ୍ଗେ ତାର ହଦୟର କୋଥାଯ ଯେନ ସମତା, ଯା-ଇ କଥା ହୋକ ନା କେବ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଆଲାପ ଜମେ ଓଠେ । କିନ୍ତୁ ଫୁଟୋ ଦିଯେ ରହିମା ଯେ-ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତାରପର ଗଲ୍ଲ-ଶ୍ଵରର ଆଶା ତାକେ ତ୍ୟାଗ କରତେ ହଲୋ । ବ୍ୟାପାରୀର ଲଞ୍ଜା କାଟିଯେ ବାହିରେ ଏସେ ମେ ଆର ହାସୁନିର ମା ଅଭିଧିକେ ଭେତରେ ନିଯେ ଗେଲ । ନିଯେ ଗେଲ ପୌଜାକୋଲ କରେ, ମୁଖେ କଥା ଫୋଟାବାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ । ସଖ କରେ ତୈରି କରା ଫିରନିର କଥା ବା ପାନ ଖେଯେ ଦୁ-ଦୁଗୁ ଗଲ୍ଲ କରାର କଥା ଭୁଲେ ଗେଲ ।

ମଜିଦ ଆର ବ୍ୟାପାରୀ ମାଜାର ଘରେଇ ଚୁପ ହୟେ ବସେ ରଇଲ, ଦୁ-ଜନେର ମୁଖେ ଚିନ୍ତାର ରେଖା । ତାରପର ମଜିଦ ଆଣ୍ଟେ ଉଠେ ଅନ୍ଦରଘରେ ବେଡ଼ାର ପାଶେ ବୈଠକଖାଲାଯ ଗିଯେ ହିଁକା ଧରିଯେ ଆବାର ଫିରେ ଏସେ ବ୍ୟାପାରୀକେ ଡେକେ ନିଯେ ଗେଲ । ଦୁ-ଜନେଇ ଏକ କରେ ହିଁକା ଟାନେ, କଥା ନେଇ କାରାଓ ମୁଖେ ।

ମଜିଦ ଭାବେ ଏକ କଥା । ଯେ-ଆମେନା ବିବିର ପିରେର ପାନି ପଡ଼ା ଖାବାର ସଖ ହୟେଛିଲ ସେ-ଆମେନା ବିବିର ଓପର, ଆକାର-ଇଞ୍ଜିତେ ବା ମୁଖେର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ନା କରଲେଓ ମଜିଦେର ମନେ ଏକଟା ନିଷ୍ଠାର ଶାନ୍ତିଓ ସେ ହିର କରେଛିଲ । ଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆବହା ଅମ୍ପଟ ଆଲୋଯ ଆମେନା ବିବିର ସାଦା କୋମଳ ପା ଦେଖେ ଶାନ୍ତି ବିଧାନେର ସେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ପ୍ରଶମିତ ନା ହୟେ ବରଷଃ ଆରା ନିଷ୍ଠାରତମଭାବେ ଶାନ୍ତି ହୟେ ଉଠେଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତଭାବେ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମେନା ବିବିର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଓଯା ସମନ୍ତ କିଛୁ ଯେନ ଗୋଲମାଲ କରେ ଦିଲ । ମୁଠୋର ମଧ୍ୟେ ଏସେଓ ମେ ଯେନ ଫକ୍କେ ଗେଲ, ଯେ-ମଜିଦେର କ୍ଷମତାକେ ମେ ଏତ ଦିନ ଉପେଙ୍ଗା କରେଛେ ତାର ପ୍ରତି ଆଜାଓ ଅବଜ୍ଞା ଦେଖାଲୋ, ତାକେ ନିଷ୍ଠରଭାବେ ଆଘାତ କରତେ ସୁଯୋଗ ଦିଯେଓ ଦିଲ ନା । ଦିଯେଓ ଦିଲ ନା ବଲେ ମେଯେଲୋକଟି ଯେନ ଚରମ ବାହାଦୁରି ଦେଖାଲୋ, ସମନ୍ତ ଆକ୍ଷାଲନେର ମୁଖେ ଚୁନ ଦିଲ ।

ହିଁକଟା ରେଖେ ହଠାତ ଏବାର ବ୍ୟାପାରୀ କଥା ବଲେ । ବଲେ,

—ଦିନଭର ରୋଜା ରାଖନେ ବଡ଼ ଦୂର୍ବଳ ହଇଛିଲ ତାନି ।

ମଜିଦ କରେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ ଥାକେ । ତାରପର ଗଣ୍ଠିର କଟେ ବଲେ,—ରୋଜା ରାଖନେ ଦୂର୍ବଳ ହଇଛିଲ କଥାଡା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମି ଯେ ପାଲିପଡ଼ାଡା ଦିଲାମ—ତା କିସେର ଜଳ୍ଯ? ଶରୀଲେ ତାକତ ହଇବାର ଜଳ୍ଯ ନା? ଏମନ ତାହିର ହେଇ ପାନି ପଡ଼ାର ଯେ ପେଟେ ଗେଲେ ଏକ ମାସେର ଭୁଖ ମାନୁଷଓ ଲଗେ ଲଗେ ଚାଙ୍ଗା ହଇଯା ଓଠେ । ଶରୀଲେର ଦୂର୍ବଳତାର ଜଳ୍ଯ ତିନି ଅଜାନ ହନ ନାହିଁ ।

ମଜିଦ ଥାମେ । କୀ ଏକଟା କଥା ବଲେଓ ବଲେ ନା । ବ୍ୟାପାରୀ ମୁଖ ଫିରିଯେ ତାକାଯ ମଜିଦେର ପାନେ, କତକ୍ଷଣ ତାର ଚିନ୍ତିତ-ବ୍ୟଥିତ ଚୋଖ ଚେଯେ-ଚେଯେ ଦେଖେ । ତାରପର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

—ତଯ କ୍ୟାନ ତାନି ଅଜାନ ହଇଛେ?

—ଆପନେ ତାନାର ଶ୍ଵାସୀ—କ୍ୟାମନେ କହି ମୁଖେର ଉପରେ?

ହଠାତ ବ୍ୟାପାରୀର ଚୋଖ ସନ୍ଦିନ୍ଧ ହୟେ ଓଠେ ଏବଂ ତା ଏକବାର କାନିଯେ ଚେଯେ ଲକ୍ଷ କରେ ଦେଖେ ମଜିଦ । ବ୍ୟାପାରୀର ଚୋଖେ ସନ୍ଦେହେର ଜୋଯାର ଆସୁକ, ଆସୁକ କ୍ରୋଧେର ଅନଳକଣ୍ଠ । ମଜିଦ ଆଣ୍ଟେ ହିଁକଟା ତୁଲେ ନେଯ । ତାକେ ଭାବତେ ସମୟ ଦିତେ ହେବେ । ବାହିରେ କୁଯାଶାଚ୍ଛଳ ରହସ୍ୟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା । ତାର ଆଲୋଯ ଘରେର କୁପିଟାର ଶିଖା ମନେ ହୟ ଏକବିନ୍ଦୁ ରଙ୍ଗ-ଟାଟିକା ଲାଲ ଟକଟକେ । ଖୋଲା ଦରଜା ଦିଯେ କୁଯାଶାଚ୍ଛଳ ମ୍ଲାନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପାନେଇ ଚେଯେ ଥାକେ ମଜିଦ, ଦୁଇତିମୁଦ୍ରା ମାନୁଷେର ଜୀବନେର ବ୍ୟର୍ତ୍ତାର ବୋକା । ତାତେ ବିଦେଶ ନେଇ, ପତିତେର ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ-ଘୃଣା ନେଇ, ଆହେ ଶୁଦ୍ଧ ଅପରିସୀମ ବ୍ୟଥାହତ ପ୍ରଶ୍ନେର ନିଶ୍ଚପତା ।

ଆଚମକା ବ୍ୟାପାରୀ ମଜିଦେର ଏକଟି ହାତ ଧରେ ବସେ । ତାର ବସନ୍ତ ଗଲାଯ ଶିଶୁର ଆକୁଳତା ଜାଗେ । ବଲେ,

—କନ, କ୍ୟାନ ତାନି ଅଜାନ ହଇଛେ? ଭିତରେ କୀ କୋନୋ କଥା ଆଛେ?



একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাত সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,
—না। কওন যায় না। খেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তেরো বছর বয়সে ফুটফুটে যে যেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে
এত বছর যাবৎ তার ঘরকল্প করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন
মায়া-মহবত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের
বসবাসের পর একটা সমন্ব আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাত তালাক দেবার কথা
শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের স্লান জোত্ত্বার পানে বেদনাভারী চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে।
আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,
—কথাড়া কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তত্ত্ব বাপের কথা মনে আছেন?
ব্যাপারী ভারী গলায় আস্তে বলে,

—আছে।

—হে তত্ত্ব বাপের কথা মাইনমেরো ভুইলা গেছে। এমন কি তার রঞ্জের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু
আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—ক্যান?

—কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাড়া হইল এই : পাক-দিল আর
গুনাগার-দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুনাগার-দিলের শান্তি দিবার চায় তখন পাক-দিলই শান্তি
পায়। তত্ত্ব বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শান্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুনাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোবে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাঁধা। আমেনা
বিবিকে শান্তি দিতে হলে আগে সে-বক্ষন ছিল করা চাই। অতএব তাকে তালাক দিয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার
ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নির্দারণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশ্যে
তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুনাগার হয়েছে, পাপীও ভালো মানুষের ওপর
দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শান্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কষ্টে প্রশ্ন করলে,

—আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

—সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানি পড়াড়া খাইয়া তিনি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন,
তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের
রোশনাইর মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কয় না। তানারে তালাক দেন।

এই সময়ে হাস্যনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়াল। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—কী গো বিটি?

—তানার ছঁশ হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতেছেন।

মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী ওঠে দাঁড়ালো। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পালকিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।



ଆମେନା ବିବିକେ ନିଯେ ସେ-ପାଞ୍ଜି ଯଥନ କୁର୍ଯ୍ୟାଚନ୍ଦ୍ର ରହସ୍ୟମୟ ଚାନ୍ଦେର ଆଲୋର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଚଳେ କିଛୁକ୍ଷଣ ପରେ ଗାନ୍ଧାଚଲାର ଆଡ଼ାଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ହେଁ ଗେଲ, ତଥନ ମଜିଦ ବୈଠକଖାନା ଘରେର ସାମନେ ହିର ହେଁ ଦାଁଢିଯେ । ଅନ୍ୟମନକ୍ଷତାବେ ଖେଳାଳ ଦିଯେ ଦାଁତ ଖୌଚାଚେ; ଦାଁଢିଯେ ଥାକାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଅନିଶ୍ଚଯତାର ଭାବ । କୋନୋ କଥା ନା କଯେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାପାରୀ ଚଳେ ଗେଲ । ତାର ମନେର କଥା ଜାନା ଗେଲ ନା ।

ହଠାତ୍ ଏକସମୟେ ଏକଟା କଥା ଘରଣ ହେଁ ମଜିଦେର । କଥା କିଛୁ ନା, ଏକଟା ଦୃଶ୍ୟ-ଆବହା ଆଲୋଯ ଦେଖା କାଳୋ ପାଡ଼େର ନିଚେ ଏକଟି ସାଦା କୋମଳ ପା । ସେ-ପା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଦେଖିଲ ନା ବଲେ ହଠାତ୍ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ କେମନ ଆଫସୋସ ବୋଧ କରେ ମଜିଦ । ତାରପର ମନେ ମନେଇ ସେ ହାସେ । ଦୁନିଆଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର । ସେଥାନେ ସାପ ଜାଗେ ସେଥାନେ ଆବାର କୋମଲତାର ଫୁଲ ଫୋଟେ । କିନ୍ତୁ ସେ-ଫୁଲ ଶର୍ଯ୍ୟତାନେର ଚକ୍ରାନ୍ତ । ମଜିଦ ଶକ୍ତ ଲୋକ । ସାତ ଜନ୍ମେର ଚେଷ୍ଟାଯାଓ ଶର୍ଯ୍ୟତାନ ତାକେ କୋନୋ ଦୂର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆଚସିତେ ଆକ୍ରମଣ କରତେ ପାରବେ ନା । ସେ ସଦା ଛାଁଶିଯାର ।

କର୍ତ୍ତେ ଦୋଯା-ଦୂରଦେର ମିହି ସୁର ତୁଳେ ମଜିଦ ଭେତରେ ଯାଇ ।

ଏତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପାରୀର ଜୀବନେ କଥିନୋ ଦେଖା ଦେଇନି । ନିଜେର ଚୋଖେ କୋନୋ ଗୁରୁତର ଅନ୍ୟାଯ ଦେଖେ ଯଦି ଶରୀରେ ଦାଉ-ଦାଉ କରେ ଆଗୁନ ଜୁଲେ ଉଠିତ ତାହଲେ ବ୍ୟାପାର୍ଟା ସମସ୍ୟାଇ ହତୋ ନା । ଆସଲ କଥା ଜାନେ ନା, ଆବାର ଏକଟା କିଛୁ ଗୋଲଯୋଗ ଯେ ଆଛେ ଏ-ବିଷୟେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ମାନୁଷ ମଜିଦେର କଥା ନା ହେଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରା ଯେତ, କିନ୍ତୁ ଯେ-କଥା ଜେନେହେ ମଜିଦ ତା ତାର ନିଜେର ବୁଦ୍ଧିର ଜୋରେ ଜାନେନି । ଖୋଦାର କାଳାମେର ସାହାଯ୍ୟେଇ ସେ-କଥା ଜେନେହେ ଏବଂ ମାନୁଷ ମଜିଦ ତାର ଅନ୍ତରେର ବିବେଚନାର ଜନ୍ଯଇ ତା ଖୁଲେ ବଲତେ ପାରେନି । ହାଜାର ହଲେଖ ତାରା ବସୁ ମାନୁଷ । ବ୍ୟାପାରୀ କଷ୍ଟ ପାବେ ଏମନ କଥା କୀ କରେ ବଲେ ।

ବୈଠକଖାନା ଛାଁକାର ନୀଲାଭ ଧୋଯାଇ ଅନ୍ଧକାର ହେଁ ଓଠେ । ବ୍ୟାପାରୀର ଚୋଖେ ଧୋଯା ଭାସେ, ମଗଜେଓ କିଛୁ ଗଲିଯେ ଚୁକେ ତାର ଅନ୍ତରଦୃଷ୍ଟି ଆବହା କରେ ଦେଇ । ବ୍ୟାପାରୀ ଭାବେ ଆର ଭାବେ । ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ଛାଁ-ହା କରେ କଥା କଯ, ଦଶ ପ୍ରଶ୍ନେ ଏକ ଜୀବାବ ଦେଇ । ଏକଟା କଥାଇ ମନେ ଘୋରେ । ଏକସମୟେ ସେଟା ସୋଜା ମନେ ହେଁ, ଏକସମୟେ କଠିନ । ଏକବାର ମନେ ହେଁ ବ୍ୟାପାର୍ଟା ହେଲେ-ନେଲେ ହେଁ ଏକଟିମାତ୍ର ଶଦ୍ଵେର ତିନିବାର ଉଚ୍ଚାରଣେଇ; ଆରେକବାର ମନେ ହେଁ, ସେ ଶଦ୍ଵଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇ ଭୟାନକ ଦୂରହୁ ବ୍ୟାପାର । ଜିନ୍ହା ଖେସେ ଆସବେ ତରୁ ସେଟା ବେରିଯେ ଆସବେ ନା ମୁଖ ଥେକେ ।

ତେରୋ ବହର ବସ ଥେକେ ଯେ ତାର ଘରେ ବସବାସ କରଛେ, ତାର ଜୀବନେର ଅଲି-ଗଲିର ସନ୍ଧାନ କରେ । ଯଦି କିଛୁ ନଜରେ ପଡ଼େ ଯାଇ ହଠାତ୍ । ଦୀର୍ଘ ବସବାସେର ସରଳ ଓ ଜାନା ପଥ ଛେଡ଼େ ବୋପ-ବାଡ଼ ଥୋଜେ, ଡାଲପାଲା ସରିଯେ ଅନ୍ଧକାର ହାନେ ଥମକେ ଦାଁଡ଼ାଯ । କିନ୍ତୁ ଆପନ୍ତିକର କିଛୁଇ ନଜରେ ପଡ଼େ ନା । ଆମେନା ବିବି ରାପବତୀ, କିନ୍ତୁ କୋନୋଦିନ ତାର ରାପେର ଠାଟ ଛିଲ ନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଚେତନା ଛିଲ ନା; ଚଳନେ-ବଲନେ ବେହାୟାପନାଓ ଛିଲ ନା । ଠାତା, ଶୀତଳ, ଧର୍ମଭିରୁ ଓ ସ୍ଵାମୀଭିରୁ ମାନୁଷ । ସେ ଏମନ କୀ ଅନ୍ୟାଯ କରତେ ପାରେ?

ପ୍ରଶ୍ନଟା ମନେ ଜାଗତେଇ ମଜିଦେର ଏକଟା କଥା ଛାଁକାର ଦିଯେ ଯେଣ ତାକେ ସାବଧାନ କରେ ଦେଇ । କଥାଟା ମଜିଦ ପ୍ରାୟଇ ବଲେ । ବଲେ, ମାନୁଷେର ଚେହରା ବା ସ୍ଵଭାବ ଦେଖେ କିଛୁ ବିଚାର କରା ଯାଇ ନା । ତାକେ ଦିଯେ କିଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନେଇ । ଏମନ କାଜ ନେଇ ଦୁନିଆତେ ଯା ସେ ନା କରତେ ପାରେ ଏବଂ କରଲେ ସବ ସମୟେ ଯେ ସମାଜେର କାହେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଏମନ ନନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ଖୋଦାର କାହେ କୋନୋ ଫାଁକି ନେଇ । ତିନି ସବ ଦେଖେନ, ସବ ଜାନେନ । କଥାଟା ଭାବତେଇ ବ୍ୟାପାରୀର କାନ ଦୁଟୀତେ ଝାଁଧି ଥରେ । ପଶୁପକ୍ଷୀକେଓ ନା ଜାନତେ ଦିଯେ କୋନୋ ଗର୍ହିତ କାଜ ବ୍ୟାପାରୀ କି କଥିନୋ କରେନି? ବ୍ୟାପାରୀର ମତୋ ଲୋକର କରରେ, ଯଦିଓ ଆଜ ବଲଲେ ହୟତ ଅନେକେ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ନା । କିନ୍ତୁ ସେ-କଥା ଖୋଦାତାଙ୍ଗ ଠିକ ଜାନେନ । ତାର କାହେ ଫାଁକି ଚଲେ ନା ।

ନା, ମଜିଦେର କଥାଯ ଭୁଲ ନେଇ । ସହସା ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ମନ୍ତ୍ରିର କରେ ଫେଲେ । ଏବଂ ଏଇ ତିନ ଦିନ ପର ଯେ-ଆମେନା ବିବି ହଠାତ୍ ସଞ୍ଚାଳ-କାମନାୟ ଅଧୀର ହେଁ ଉଠେଛିଲ ସେ-ଇ ସମସ୍ତ କାମନା-ବାସନା ବିବରିତ ଏକଟା ତ୍ରକ, ବଜ୍ରାହତ ମନ



নিয়ে সেদিনের পালকিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পালকির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রু দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়ত হঠাত তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসত। সেটা হলো খোতামুখের তালগাছটা। বহুদিনের গাছ, বড়ে-পানিতে আরও লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম ঘোবনে নাইয়ার থেকে ফিরবার সময় পালকির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুবত যে, স্বামীর বাড়ি পৌছেছে। শুটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

সেদিন রাতে কে যেন একটা মন্ত্র মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘটনা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাত তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে উজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ওইখানে কেমন একটু অঙ্ককার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালি উজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাঞ্জলো খসেও গ্রেসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অঙ্ককার হয়ে আসে। তার ভুক্ত ঝুঁঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে শৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর উজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অঙ্ককার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিনি বছর অঙ্গের মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয় এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারাই। খরচ করে তার আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরোনো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে সে-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রং চটে যায়, বা সালুকাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া-তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারা দিন আজ মনটা ভারী হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাত কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কি ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে-অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা বিড় বিড় করে বলে, তুমি এত দয়ালু, খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড় বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালুকাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারী। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাবের মিএগার ছেলে আক্সাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্সাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাবের মিএগা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিতটা এই জন্য আরও বেশি বোধ করল যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকে আক্সাস



কিছু উচ্চকা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুবিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুবিরা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখল না। ভাবল, বিদেশি হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আকাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। বলে, ইস্কুল দেবে। কোথেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিপ্রাণ নেই। হাঁ, মুরুবিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে দু-দুটো মজবুত বসানো হয়লি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আকাস যুক্তিতর্কের ধার ধারেনা। সে ঘূরতে লাগল চরকির মতো। ইস্কুলের জন্য দস্তরমতো চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়িবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনো প্রকার ভগিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল,

—কী হনি ব্যাপারী মিএঁ?

ব্যাপারী বলে, কথাড়া ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আকাস এল, আকাসের বাপ মোদাবের এল।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আকাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আকাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে— এমন সময় মজিদ যেন হঠাতে চেতনায় ফিরে এল। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রং। ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করল, —তোমার দাঢ়ি কই মিএঁ?

আকাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইস্কুল হবে কী হবে না— সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাঢ়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আকাস। দাঢ়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারও ছাটা, কারও স্বভাবত হাঙ্গা ও ক্ষীণ; কারও-বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিস্থিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাঢ়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাঢ়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—তুমি না মুসলমানের ছেলে-দাঢ়ি কই তোমার?

একবার আকাস ভাবে যে বলে, দাঢ়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুবির সামনে আর যাই হোক বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাবের মিএঁ স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস ফেলে গা চিলা করে। এতক্ষণ সে নিঃশ্বাস রঞ্জ করে ছিল এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাবের মিএঁ বলে,

—আমি কত কই দাঢ়ি রাখ ছ্যামড়া দাঢ়ি রাখ-তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারী বলে,

—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কি আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাঢ়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্ষাস নাকি একটা ইঙ্গুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্ষাস অশ্লোন বদনে উত্তর দেয়,

—আপনি যা হৃনহেন তা সত্য।

মজিদ দাঢ়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

—তা এই বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজ-কাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাত হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্ষাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুবির কথা কেউ কি কখনো শুনেছে? শোন শোন, ছেলের কথা শোন একবার—এই রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্ষাস মিএঞ্চ যে-দিনকালের কথা কইলা তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে—।

সকলে একবাক্যে সে-কথা শীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাষাঙ্গুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তা ছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি যপতত্প পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, মাজারে শিরানি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে-ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্তের গীত ধরত—আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজিদের একশ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, ভাই সকল! পোলা মাইনষের মাথায় একটা বদ খেয়াল চুকছে—তা নিয়ে আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্ষাসের বিচার হবে, তার একটা শান্তি বিধান হবে— এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওঠে বলে,

—বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন।

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাঢ়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক জানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন— আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।



একসময়ে আঙ্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

—তয় ইঙ্গুলের কথাড়া?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোবা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে উঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

—চুপ কর ছ্যামড়া, বেন্তিভিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আঙ্কাস আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারও মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে শুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আঙ্কাসের মতো খামখেয়ালি বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্পত্তিয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। একসময়ে খরচের কথা উঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা ছড়কায় কারও না কারও যেন যথকিঞ্চিং হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এই ভেবে তৃষ্ণি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় থালেক ব্যাপারী তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশ-খোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট শুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটল। কানাঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃক্ষি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা যেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টপাথরে ঘমলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাজা বউদের দূর করার, আর গন্তায় গন্তায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মায়ের কোনো অন্যায়ে বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়ত দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

—ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে—এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্চের হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আন্তই হোক—একজন লোক অন্তত একটা খুরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আঙ্কাসের বদখেয়ালের কথা উঠে। কিন্তু মোদাবের মিয়ার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দারিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।



যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গম্ভীরওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিঞ্চি-কারিগর এসেছে, আর গতর খাটোবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুষ্ট লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাতে মাঠের ধারে ফাল্বনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, বাকবাকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচ্ছিন্ন ঠেকে। তা ছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাতে মনের কোনো-এক অভ্যন্তরকে মিথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধূলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিল এই মহববতনগর গ্রামে। সেদিন ছিল ভাগ্যঘৰ্ষণী দুষ্ট মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে। এবং তাই সারা দিন মনটা কেমন-কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে-কইতে সে সহসা কেমন আনন্দনা হয়ে যায়।

সারা দিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দুরুদ পড়েছিল মজিদ, এবার নিষ্ঠুরতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নামিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর যাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাতে সে চমকে ওঠে। রূপালি ঝালরওয়ালা সালুকাপড়টার এক কোণে উলটে আছে।

সত্যই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্বোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাক্কা হাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি থায়। কারণ, ঘরের স্নান আলোয় কবরের সে-অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সম্মুক্তির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরটা, কিন্তু সে জানে না কে চিরশায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সন্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উলটানো নগ্ন অংশই হঠাতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিশ্বাস করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এ নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন-যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহিমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষ্যণী রহিমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে।

একসময়ে মজিদই বলে,

-বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহিমা কথাটার উভর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য ধামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর ঢাকিয়ে সে আস্তে বলে, আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্য রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।



ପ୍ରଥମେ ମଜିଦ କିଛୁଇ ବଲେ ନା । ତାରପର ବଲେ,

—ନିଜେର ରଙ୍ଗେର ନା ହଇଲେ କି ମନ ଭରେ? କଥାଟା ବଲେ ଆର ମନେ ମନେ ଅନ୍ୟ ଏକଟା କଥାର ମହଡା ଦେଯ । ମହଡା ଦେଯା କଥାଟା ଶେଷେ ବଲେଇ ଫେଲେ । ବଲେ, ତା ଛାଡା ତାର ମାଯେର ଜନ୍ମେର ନାଇ ଠିକ!

ତାରପର ତାରା ଅନେକକ୍ଷଣ ନୀରବ ହୟେ ଥାକେ । ମଜିଦେର ନୀରବତା ପାଥରେର ମତୋ ଭାରୀ । ଯେ ନିଃଶବ୍ଦତା ଆଜ ତାର ମନେ ଘନ ହୟେ ଉଠେଛେ ସେ ନିଃଶବ୍ଦତା ସତିକାର, ଜୀବନେର ମତୋ ତା ନିଛକ ବାନ୍ତବ । ଏବଂ କଥା ହଚେ, ପୁରୀ ଛେଲେ ତୋ ଦୂରେର କଥା, ରହିମାଓ ସେ-ନିଃଶବ୍ଦତାକେ ଦୂର କରତେ ପାରେ ନା । ଦୂର ହବେ ସଦି ନେଶା ଧରେ । ମଜିଦେର ନେଶାର ପ୍ରୋଜନ ।

ବ୍ୟଥାବିଦୀର୍ଘ କଟେ ମଜିଦ ଆବାର ହାହାକାର କରେ ଓଠେ,

—ଆହା, ଖୋଦା ସଦି ଆମାଗୋ ପୋଲାପାଇନ ଦିତ!

ମଜିଦେର ମନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଘୋରେ । ତଥନ ମାଜାରେର ଅନାବୃତ କୋଣଟା ମୃତ ମାନୁଷେର ଚୋଥେର ମତୋ ଦେଖାଇଲ । ତା ଦେଖେ ହୟତ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଅରଣ ହୟେଇଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ-କଥାଓ ଅରଣ ହୟେଇଲ ଯେ, ଜୀବନକେ ସେ ଉପଭୋଗ କରେନି । ଜୀବନ ଉପଭୋଗ ନା କରତେ ପାରଲେ କିମେର ଛାଇ ମାନ-ସମ୍ପଦି? କାର ଜନ୍ୟ ଶରୀରେର ରଙ୍ଗ ପାନି କରା, ଆରେଶ-ଆରାମ ଥେକେ ନିଜେକେ ବସିତ ରାଖା?

ପରଦିନ ସକାଳେ ମଜିଦ ସଥନ କୋରାନ ଶରିଫ ପଡ଼େ ତଥନ ତାର ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ସୂର୍ଖ ହୟେ ଓଠେ ମିହି ଚିକନ କଟେର ଢାଳା ସୁରେ । ପଡ଼ୁତେ ପଡ଼ୁତେ ତାର ଟୌଟ ପିଛିଲ ଓ ପାତଳା ହୟେ ଓଠେ, ଚୋଥେ ଆସେ ଏଲୋମେଲୋ ହାଓୟାର ମତୋ ଅସ୍ତିରତା ।

ବେଳା ଚଢ଼ିଲେ ତାର କୋରାନ-ପାଠ ଖତମ ହୟ । ଉଠାନେ ସେ ସଥନ ବେରିଯେ ଆସେ ତଥନୋ କିନ୍ତୁ ତାର ଟୌଟ ବିଡ଼ିବିଡ଼ କରେ-ତାତେ ଯେନ କୋରାନ-ପାଠେର ରେଶ ଲେଗେ ଆଛେ ।

ଉଠାନେର କୋଣେ ଆୟୁଳାଘରେର ନିଚୁ ଚାଲେର ଓପର ରହିମା କଦୁର ବିଚି ଶୁକାବାର ଜନ୍ୟ ବିଛିଯେ ଦିଇଲ । ସେ ପେହଳ ଫିରେ ଆଛେ ବଲେ ମଜିଦ ଆଡ଼ଚୋଥେ ଚେଯେ ଚେଯେ ତାକେ ଦେଖେ କତକ୍ଷଣ । ଯେନ ଅପରିଚିତ କାଉକେ ଦେଖେ ଲୁକିଯେ ଲୁକିଯେ । କିନ୍ତୁ ଚୋଥେ ଆଶୁଳ ଝୁଲେ ନା ।

ରାତେ ମଜିଦ ରହିମାକେ ବଲେ,

—ବିବି, ଏକଟା କଥା ।

ଶୁନବାର ଜନ୍ୟ ରହିମା ପା-ଟୈପା ବନ୍ଦ କରେ । ତାରପର ମୁଖ୍ୟୀ ତେରଛାଭାବେ ଘୁରିଯେ ତାକାଯ ସ୍ଵାମୀର ପାନେ ।

—ବିବି, ଆମାଗୋ ବାଡ଼ିଟା ବଡ଼ି ନିରାନନ୍ଦ । ତୋମାର ଏକଟା ସାଥି ଆନୁମ? ସାଥି ମାନେ ସତୀନ । ସେ-କଥା ବୁବାତେ ରହିମାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ହୟ ନା । ଏବଂ ପଲକେର ମଧ୍ୟେ କଥାଟା ବୋବେ ବଲେଇ ସହସା କୋଳେ ଉତ୍ତର ଆସେ ନା ମୁଖେ ।

ରହିମାକେ ନିରମତର ଦେଖେ ମଜିଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

—କୀ କଣ?

—ଆପଣେ ଯେମୁନ ବୋବେନ ।

ତାରପର ଆର କଥା ହୟ ନା । ରହିମା ଆବାର ପା ଟିପତେ ଥାକେ ବଟେ କିନ୍ତୁ ଥେକେ-ଥେକେ ତାର ହାତ ଥେମେ ଯାଯ । ସମ୍ଭବ ଜୀବନେର ନିଷ୍ଫଲତା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର କାହେ ହଠାତ ମନ୍ତ୍ରବଢ଼ ହୟେ ଓଠେ । କିନ୍ତୁ ବଲବାର ତାର କିଛୁ ନେଇ ।

ଜ୍ୟେଷ୍ଠେର କଡ଼ା ରୋଦେ ମାଠ ଫାଟିଛେ ଆର ଲୋକଦେର ଦେହ ଦାନା-ଦାନା ହୟେ ଗେଛେ ଘାମାଟିତେ, ଏମନ ସମୟ ମସଜିଦେର କାଜ ଶେଷ ହୟ । ଏବଂ ତାର କିଛିଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ମଜିଦେର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିରେଣ୍ଡ ସମ୍ପଦ ହୟ ଅନାଦୂଷର ଦ୍ରୁତତାଯ । ଢାକଢୋଲ ବାଜେନା, ଖାନାପିନା ମେହମାନ ଅତିଥିର ହୈ ହୁଲୁଙ୍ଗୁଲ ହୟ ନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜେ ବ୍ୟାପାରଟା ଚୁକେ ଯାଯ ।



বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশ্ত্রিভূত ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাঙ্গিতে হাত বুলায়, আর তার আশ-পাশ আতরের গঞ্জে ভুরভুর করে।

এক সময় গলায় পুরুক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—হে নামাজ জানে নি?

রহিমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

—জানে।

জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহিমা সরাসরি উত্তর দেয়,

—পড়ব আর কি ধীরে-সুস্থে।

আড়ালে রহিমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,

—তোমারে হে মানসম্মান করেনি?

—করে না? খুব করে। একরতি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর যুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে-ধীরে তার যুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে— এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাত শোনে সোনালি যিহি সুন্দর হাসির ঝংকার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনেনি। রহিমা জোরে হাসে না। সালুআব্দত মাজারের আশে-পাশে যারা আসে তারাও কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হহ করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝংকার ওঠে না কখনো। জীর্ণ গোয়ালঘরের মতো মজবুত খিটখিটে মেজাজের মৌলবির সামনে প্রাণভয়ে তারস্তেরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অন্ন-সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলোর মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুক্ত মানুষের মতো মজিদ শুরু হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাত সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

—কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে যুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

—মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো ছনে না। তোমার হাসিও জানি কেউ ছনে না।

রহিমা এবার ফিসফিস করে বলে, হৃন্দানি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।



জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাত হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সত্যে চমকে ওঠে রহিমা বলে,

-জোরে হাইস না বইন, মাইনবে ছুনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচ্ছিন্নভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঘরনার অনাবিল গতির মতো হৃদয় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

-একটা ঘজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহিমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

-কী কথা বইন?

-কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

-কও না।

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

-তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

-কারে দেখাইছিল?

-আমারে। তয় দেইখা আমি কই; দ্যুত, তুমি আমার লগে মক্ষরা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুবি দুলার বাপ। আর— হঠাত আবার হাসির একটা গমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে—আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুবি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অঘনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হলো না।

রহিমার হঠাত কেমন গন্তীর হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেল।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে একসময়ে জমিলার চোখ ছল ছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারণ অভিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারী হয়ে থাকে। রহিমার অলঙ্কে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রু সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তারপর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহিমা যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝুঁকে চোখ-নাক মোছে।

রহিমা আস্তে বলে,

-কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহিমাকে হঠাত গন্তীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিল এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোবা যায় না। রহিমা উত্তরে হঠাত তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।



জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে তাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন? তার মনের হাদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় বালমল করে—পূর্বাহ্নে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুঃক্ষর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহিমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোথেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাহ্টা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে জান্দুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। মজিদ তাকে অনেক বোৰাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উভরে এবার সে কোমরে গৌঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরও বোৰায় তাকে। ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরও জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের ঝগ্হের জন্য দোয়া করা; সে যেন বেহেশতে স্থান পায়, তার শুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়—তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ-চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুঁস নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেল। দুপুরের আগে মজিদকে নিকটে কোনো এক স্থানে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশা নাই।

রহিমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

থাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহিমার হাত থেকে ছঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

—ওইটার হইছে কী?

রহিমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আন্তে বলে,

—মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক ছঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—কিন্তু ... ক্যান খারাপ করছে?

রহিমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

—ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ওইরকম কইরা বসে না।

মজিদ ছঁকা টানে আর মীলাভ ধোয়ায় হাঙ্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জুলা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মন্ত সংসারের কর্তৃ—তবে না হয় বুবুত মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরভি মেয়ের আবার ওটা কী চং? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাট্টাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।



হঠাতে মজিদ গর্জন করে ওঠে । বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে । ও কি ঘরে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছেল্লে থাক, মড়ক লাঞ্চক ঘরে?

গর্জন শুনে রহিমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে । জমিলাও এবার নড়ে । হঠাতে কেমন অবস্থা দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাতে উঠে সিড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায় ।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব । সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভেঁতা উদ্দেশ্যায় ঢোলক বেজে চলেছে । বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে । মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে । একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কূল-কিনারাইন অথবা প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটিখিটে হয়ে আছে । প্রশ্ন করলে কি একটা অতলতার প্রমাণ পাবে-এই ভয় মনে । মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকালের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে । তাই আজ সকালে ওই সাতকুল খাওয়া শগের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি । কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে । কেন?

মনে মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে ।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অঙ্ককারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয় । মজিদের ঘুম আসে না । ঘুমের আগে জমিলার পায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঢ়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত । হয়ত এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মতার মধ্যে হঠাতে নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা যষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খী-খী করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে । তার সে শুক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খৌচায় ধিকিধিকি করে ঝুলে, মানে অঙ্ককারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে । সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কঢ়ি-কোমল লতার মতো হাঙ্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল-তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিল । মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাতে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারী হয়ে এল । তারই ভারিত্বে হয়ত চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল । ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহ আকবার বলার অভ্যাস । তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই । কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝল না, তারপর ধী করে ওঠে বসল । তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সং্যত করে অক্ষিপ্ত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো ।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহিমা শোয় । সেখানেই রহিমার প্রশ্নস্ত বুকে মুখ শুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে । পরদিন জমিলার মুখের অঙ্ককারটা কেটে যায় । কিন্তু মজিদের কাটে না । সে সারা দিন ভাবে । রাতে রহিমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুন-পানি মেশানো ভুসি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরিবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায় । রহিমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ । পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে রহিমা দেখে, মজিদ । তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুসি গোলায় ।

মজিদ একবার কাশে । তারপর বলে,

-জমিলা কই?

-ঘুমাইছে বোধ হয় ।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস । মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারণ ঘুমের জন্য । নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না । যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাটোকা যা বাসি থাবার পায় তাই থায় গবগব করে ।



মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে উঠে,

—যুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লাটবিবির মতো খাটে চইড়া যুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছেনি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই চুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কোনো অকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে যুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহিমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রাখা করছিল বলে সে-কথা সে জানে না।

—কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

—বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ওইসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া তারে যুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কণ।

রহিমা নিরুণ্নরে ভূসি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্দ্র ঢুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভূসি খেতে শুরু করে। কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধূয়ে এসে ঠাণ্ডা সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহিমা যখন ধীরে ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার যুম কাঠের মতো। সে-যুম ভাঙ্গে না। রহিমার গলা চলে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাত এগিয়ে এসে এক হাত দিয়ে রহিমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কজার কঢ়ি হাড় হয়ত মড়মড় করে উঠে।

আচমকা যুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে তেবে জমিলার চোখ ভীত বিহুল হয়ে উঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ প্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝালেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামাটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাত তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহবতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হৃকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনো দিন। আজ তার ঘরের এক রাস্তি বউ-যাকে সে সৌদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোক জেগেছিল বলে—সে কিনা তার কথায় কাল না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে ক্রোধ দাউদাউ করে জুলে উঠে সে ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অঙ্গ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহিমার বুক কেঁপে উঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত যুথে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছাড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিস্তু।

—ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কি রাগ করা যায়?

—রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে উঠে। এই বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই। এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মৃত্তি।

অবশ্যে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এরপর কী করবে। হঠাত এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে,



দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

—ওই দিলে খোদার ভয় নেই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান-পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সিঁথি কাটছে। তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে ঝলঝল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিম্নের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সবত্ত্বে মেছোয়াক করে-দাঁতের আশে-পাশে, ওপরে-নিচে। ঘৃততে ঘৃততে ঠোঁটের পাশে ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুরুরে গিয়ে দেহ রংগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিম্নের ডাল দাঁতে কাঘড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই-মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চকর খায় মজিদ। একসময়ে সশঙ্কে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুরুরাঘাটে যেমন থাক থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি এটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে, তারপর বলে,

—রূপ দিয়া কী হইব? মাইন্মের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষীণগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শক্র আভাস-পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

—তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছ, তা কি শক্ত শুনার কাম জানোনি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কি ডরাও না, দোজখের আগরে কি ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

—তা ছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি! এই ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তানার বহের দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তানার দিলে গোৱা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশঙ্কে থুথু ফেলে মজিদ পুরুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিতে তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মতো। তারপর হঠাতে একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোল্ডে মুখ দিতে গিয়ে খটক করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়ত তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাচায় ধরা পড়েছে।



তারপর এক অঙ্গু ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠেট কেঁপে ওঠে, নাসারন্তর বিস্ফুরিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল-মসলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহিমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেক্টিতে রাখা হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মসলা এল ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মসলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্ৰ সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগন্তনে।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মসলা এল ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মসলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্ৰ সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগন্তনে।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন-দিকটায় তার বিষত খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দৱল্দ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে-ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত টেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরম্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এই যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে-নাবতে শুরু করেছে।

চিমেতেতালা টেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরম্পরের সন্নিকটে। এ-ধীর গতিশীল অগ্সর হবার মধ্যে চাখল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরাদিত্ব বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়া শূন্য। মৌমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারাটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, মিশল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুনে চলে জিকির। প্রত্যেকে পরম্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে এবং যে-মহাআশ্চীরুণের সৃষ্টি হবে শীঘ্ৰ তারই ছিটেফেঁটা স্ফুলিঙ্গ জলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংযর্ষণে।

মজিদের চোখ বিমিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বারবার দেহ ঝুকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিধে যায় আর তার অন্তরখন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরম্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘৰবসতির মাঝা-মমতা জলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রিত হতে থাকে। হু হু হু। আবার : হু হু হু। আবার—

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহিমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গক্ষে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেক্টিতে বলক-গুঠা চেয়ে-চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাঢ়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।



ବାହିରେ ଥେକେ ଢେଉ ଆସେ ଜିକିରେର । ଡେକଚିତେ ବଲକ-ଆସା ଦେଖେ ଜମିଲା, ଆର ସେ-ଟେଉଁୟେର ଗର୍ଜନ କାନ ପେତେ ଶୋନେ । ସେ-ଢେଉ ସଖନ କ୍ରମଶ ଏକଟା ଅବକ୍ଷବ୍ୟ ଉତ୍ତାଳ ବାଡ଼େ ପରିଣତ ହୟ ତଥନ ଏକସମୟେ ହଠାତ୍ କେମନ ବିଚଲିତ ହୟ ପଡ଼େ ଜମିଲା । ସେ-ଢେଉ ତାକେ ଆଚିହିତେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ାବେ ଆଘାତ କରେ । ତାରପର ଆଘାତେ ପର ଆଘାତ ଆସତେ ଥାକେ । ଏକଟା ସାମଲିଯେ ଉଠିତେ ନା ଉଠିତେ ଆରେକଟା । ସେ ଆର କତ ସହ୍ୟ କରିବେ! ବାଲୁ ତୀରେ ଯୁଗ୍ୟୁଗ ଆଘାତ ପାଓୟା ଶକ୍ତ-କଟିଲ ପାଥର ତୋ ସେ ନୟ । ହଠାତ୍ ଦିଶେହରା ହୟ ସେ ପିଠ ସୋଜା କରେ ବସେ, ତାରପର ବିଭାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଏଧାର-ଓଧାର ଚେଯେ ଶେଷେ ରହିମାର ପାନେ ତାକାଯ । ଗନ୍ଗନେ ଆଗୁନେର ପାଶେ କେମନ ଚାନ୍ଦା ଦେଖାଯ ତାକେ କିନ୍ତୁ କାନେର ପାଶେ ଗୌଜା ଘୋମଟାଯ ଆବୃତ ମାଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ : ଚୋଥ ତାର ବାଞ୍ଚେର ମତୋ ଭାନେ ।

ପାନିତେ ଡୁରବେତେ ଧାକା ମାନୁଷେର ମତୋ ମୁଖ ତୁଲେ ଆବାର ଶରୀର ଦୀର୍ଘ କରେ ଜମିଲା ସ୍ଥିର ପାଯ ନା କୋଥାଓ । ଶେଷେ ସେ ରହିମାକେ ଡାକେ,

—ବୁବୁ!

ରହିମା ଶୋନେ କି ଶୋନେ ନା । ସେ ଫିରେ ତାକାଯାନ୍ତି ନା, ଉତ୍ତରାନ୍ତ ଦେଇ ନା । ଏଦିକେ ଢେଉଁୟେର ପର ଆରା ଢେଉ ଆସେ, ଉତ୍ତାଳ ଉତ୍ତରୁଙ୍ଗ ଢେଉ । ଛ ଛ ଛ । ଆବାର : ଛ ଛ ଛ । ଦୁନିଆ ଯେନ ନିଃଶ୍ଵାସ ରଙ୍କ କରେ ଆହେ, ଆକାଶେ ଯେନ ତାରା ନେଇ । ତାରପର ଏକଟୁ ପରେ ଚିତ୍କାର ଓଠେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୟକର ଦ୍ରୁତତାଯ ଆସତେ ଥାକା ପର୍ବତପ୍ରମାଣ ଅଜନ୍ତ ଢେଉ ଭେଣେ ଛତ୍ରାଖାନ ହୟ ଯାଯ । ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୀ ଯେନ ଲଞ୍ଚଭଣ୍ଡ ହୟ ଯାଯ, ମାରାତ୍ମକ ବନ୍ୟାକେ ଯେନ ଅବଶେଷେ କାରା ରଖିତେ ପାରେ ନା । ଏବାର ଭେସେ ଯାବେ ଜେନମାନବ-ଘରବସତି, ମାନୁଷେର ଆଶା-ଭରସା ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଗତିତେ ଜମିଲା ଉଠେ ଦାଢ଼ାଯ । କ୍ଷୀଣ ଦେହେ ବୃଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷେର ମତୋ କଟିଲଭାବେ ଦାଢ଼ିଯେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଟେ ଆବାର ଡାକେ,

—ବୁବୁ!

ଏବାର ରହିମା ମୁଖ ତୁଲେ ତାକାଯ । ତାର ଚାନ୍ଦା ଦେହଟି ଶାନ୍ତ ଦିନେର ନଦୀର ମତୋ ବିଭ୍ରତ ଆର ନିଷ୍ଠରଙ୍ଗ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଚୋଥ ଝଲମଳ କରଛେ ବଟେ କିନ୍ତୁ ତାଓ ଶାନ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ । ସେ-ଚୋଥେର ଦିକେ ଜମିଲା ତାକିଯେ ଥାକେ କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷେ କିନ୍ତୁ ବଲେ ନା । ତାରପର ସେ ଦ୍ରୁତ ପାଯେ ହାଁଟିତେ ଥାକେ ଉଠାନ ପେରିଯେ ବାହିରେ ଦିକେ ।

ଜିକିର କରତେ କରତେ ମଜିଦ ଅଜାନ ହୟ ପଡ଼େଛେ । ଏ ହରେଇ ଥାକେ । ତବୁ ଲୋକେରା ତାକେ ନିଯେ ବ୍ୟନ୍ତ ହୟ ପଡ଼େ । କେଉ ହାତ୍ୟା କରେ, କେଉ ବୁକଫଟା ଆଓୟାଜେ ହା-ହା କରେ ଆଫସୋସ କରେ, କେଉ-ବା ଏ ହଟ୍ଟଗୋଲେର ସୁଧୋଗେ ମଜିଦେର ଅବଶ ପଦ୍ୟୁଗଳ ମତ ଚୁମ୍ବନେ-ଚୁମ୍ବନେ ସିଙ୍ଗ କରେ ଦେଇ । କେବଳ କ୍ଷୟୋ-ଆସା ମୋମବାତି ଦୁଟୋ ତଥନୋ ନିକଷ୍ପ ଛିରତାଯ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୟ ଥାକେ ।

ହଠାତ୍ ଏକଟା ଲୋକେର ନଜର ବାହିରେ ଦିକେ ଯାଯ । କେନ ଯାଯ କେ ଜାନେ, କିନ୍ତୁ ବାହିରେ ଗାଛତଲାର ଦିକେ ତାକିଯେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛିର ହୟ ଯାଯ । କେ ଓଥାନେ? ଆଲିବାଲି ଦେଖା ଯାଯ, ପାତଳା ଏକଟି ମେରେ, ମାଥାଯ ଘୋମଟା ନେଇ । ସେ ଆର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଯ ନା । ତାରପର ଏକେ ଏକେ ଅନେକେଇ ଦେଖେ । ତବୁ ମେଯେଟି ନଢ଼େ ନା । ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରେ ଘୋମଟାଶୂନ୍ୟ ତାର ମୁଖଟା ଢାକା ଢାଦେର ମତୋ ରହସ୍ୟମୟ ମନେ ହୟ ।

ଶୀଘ୍ର ମଜିଦେର ଜାନ ହୟ । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉଠେ ବସେ ତାରପର ଚୋଥେ ଅର୍ଥହିନ ଅବସାଦ ନିଯେ ଘୂରେ-ଘୂରେ ସବାର ଦିକେ ତାକାଯ । ଏକସମୟେ ସେଇ ଦେଖେ ମେଯେଟିକେ । ସେ ତାକାଯ, ତାରପର ବିମୂଳ ହୟ ଯାଯ । ବିମୂଳତା କାଟିଲେ ଦପ୍ତ କରେ ଜୁଲେ ଓଠେ ଚୋଥ ।

ଅବଶେଷେ କୀ କରେ ଯେନ ମଜିଦ ସରଲ କଟେ ହାନେ । ସକଳେର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲେ,

—ପାଗଲି ବିଟା । ଏକଟୁ ଥେକେ ଆବାର ବଲେ, ନତୁନ ବିବିର ବାଡ଼ିର ଲୋକ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଆସଛେ ।

ତାରପର ହାତତାଲି ଦିଯେ ଉଚ୍ଚ ଗଲାଯ ମଜିଦ ହାଁକେ, ଏଇ ବିଟି ଭାଗ! ଠୋଟେ ତଥନୋ ହାସିର ରେଖା, କିନ୍ତୁ ସେଇକେ ତାକିଯେ ଚୋଥ ତାର ଦପଦପ କରେ ଜୁଲେ ।

ହୟତ ତାର ଚୋଥେର ଆଗୁନେର ହଙ୍କା ଲେଗେଇ ଘୋର ଭାଣେ ଜମିଲାର । ହଠାତ୍ ସେ ଭେତରେର ଦିକେ ଚଲତେ ଥାକେ, ତାରପର ଶୀଘ୍ର ବେଡ଼ାର ଆଡ଼ାଲେ ଅଦ୍ୟ ହୟ ଯାଯ ।



আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙ্গন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্তায় নিষ্পিণ্ঠ হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন থাঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্পত্তাবে ঝলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন ঞেড়িয়ে তস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,
—ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচাইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে, আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোপ্তাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশতাবে চুপচাপ।

নিভৃত চুলার পাশে রহিমা তখনো বসে আছে, পাশে নামিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেক্টি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একান্ত পরে মজিদও আসে। রহিমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এইবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

—হে কই?

রহিমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাত ওঠে চলে গেল তারপর আর সে এদিকে আসেনি। আস্তে রহিমা বলে,

—বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

—ও যে একদম বাইরে চইলা গেল, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তুতি হয়ে যায় রহিমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

—হে বাইরে গেছিল?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

—হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিভৃত ছঁকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিল মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধে হঠাত ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরোধ-করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে তা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহিমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা বিমর্শিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই তাবে তখনই তার মাথা বিমর্শিম করে



ওঠে। যনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো যেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গঢ়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাথ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহিমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাত ডাকে— বিবি শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরক্ষৰে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহিমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোট যেন কেমন ধর ধরে করে কেঁপে ওঠে।

—বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলানি?

শেয়েক্ষণ কথাটা তড়িৎেরগে আহত করে রহিমাকে। তৎক্ষণাত সে স্কুল কষ্টে উত্তর দেয়,

—তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখ দুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রং শূন্য নিষ্পত্তি মানুষ রহিমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাত দুরকা হাওয়ার মতো নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়ত কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহিমাকে বলে,

—কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

কখনো এমন সহজ-সরল পরমাত্মীয়ের মতো কথা মজিদ বলে না। তাই বাট করে রহিমা তার অর্থ বোবে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে ওঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এত দিনের ঘনিষ্ঠতার ফলেও যে-চোখের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যাখ্যাবিদীর্ঘ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহিমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিগত হয়ে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে পুলক শিহরণের অজ্ঞ চেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাত ঝাপটা দিয়ে রহিমা বলে,

—কী কমু? মাইয়াড়া জানি কেমুন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়া-পানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। সুম থেকে ওঠে বাসি খিচুড়ি গোঁফাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেমেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গঞ্জীর। ততোধিক গঞ্জীর কষ্টে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছ! খালি তা না, তুমি তানারে নারাজ করছ। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার উপর তানার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু ধেয়ে মজিদ আবার বলে, —আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাখি দিয়ে বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিত। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগামোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

—হচ্ছ নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কষ্টস্বর আরও রুক্ষ করে সে বলে,

—দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছ তার পরেও আমি চৃপচাপ আছি এই কারণে যে, আমার শরীরটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চৃপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

—তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষেরে কোরানের ভাষায় কর মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার যাবে। কখন তার অজ্ঞ ভেঙে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। মাজার-ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এল তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরহওতেই মুহূর্তে সে আওয়াজ থেমে গেল। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করল মাজার-ঘরে তখন শোনে আবার সেই শতসহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে। আবার বাইরে গেল, আবার এল ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজ্ঞ নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার-ঘরে সে চুকচে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজ্ঞ বানিয়ে এল। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এল তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অঞ্চল বিসর্জন করল মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজার পাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে আটুট গান্ধীর্ঘ বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছুটা খুশি না হয়ে পারে না। সে বোবো, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

—তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নাবিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংস্থারের কাজ শেষ করে রহিমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। ও ঘরে মজিদ ছাঁকায় দয় দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃষ্ণিতে ভরে ওঠেছে। রহিমা অজ্ঞ বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন ছাঁকায় টান মারে, আর চোখটা পিটিপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহিমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে পা টেপে রহিমা, ঘুণধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টেন্টন করে তার আরাম করে।



ସୁଖଭୋଗ ନୀରବେଇ କରେ ମଜିଦ । ହଙ୍କାଯ ତେଜ କମେ ଏସେଛେ, ତବୁ ଟେନେ ଚଲେ । କାନ୍ଟା ଓଧାରେ । ନୀରବତାର ମଧ୍ୟେ ଓଦର ହତେ ଥେକେ ଥେକେ କାଂଚେର ଚଢ଼ିର ମୃଦୁ ବାଂକାର ଭେସେ ଆସେ । ସେ କାନ ପେତେ ଶୋଳେ ସେ ବାଂକାର ।

ସମୟ କାଟେ । ରାତ ଗଭୀର ହଯେ ଓଠେ ବାଶବାଡ଼େ, ଗାହେର ପାତାଯ ଆର ମାଠେ-ଘାଟେ । ଏକସମୟେ ରହିମା ଆଣ୍ଟେ ଉଠେ ଚଲେ ଯାଇ । ମଜିଦେର ଚୋଖେଓ ଏକଟୁ ତନ୍ଦ୍ରାର ମତୋ ଭାବ ନାହିଁ । ଏକଟୁ ପରେ ସହସା ଚମକେ ଜେଗେ ଓଠେ ସେ କାନ ଖାଡ଼ା କରେ । ଓ ଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା : ସେ ନୀରବତାର ଗାଯେ ଆର ଚଢ଼ିର ଚିକନ ଆଓଯାଜ ନେଇ ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜିଦ ଓଠେ । ଓ ସରେ ଗିଯେ ଦେଖେ ଜାଯନାମାଜେର ଓପର ଜମିଲା ସେଜଦା ଦିଯେ ଆସେ । ଏଖୁନି ଉଠିବେ-ଏହି ଅପେକ୍ଷାଯ କରେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକେ ମଜିଦ । ଜମିଲା କିନ୍ତୁ ଓଠେ ନା ।

ବ୍ୟାପାରଟା ବୁଝାତେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଲମ୍ବ ହୟ ନା ମଜିଦେର । ନାମାଜ ପଡ଼ତେ ପଡ଼ତେ ସେଜଦାଯ ଗିଯେ ହଠାତ୍ ସେ ସୁମିଯେ ପଡ଼େଛେ । ଦସ୍ତୁର ମତୋ ଆଚମକା ଏସେଛେ ସେ-ସୁମ, ଏକ ପଲକେର ମଧ୍ୟେ କାବୁ କରେ ଫେଳେଛେ ତାକେ ।

କରେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପଚାପ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକେ ମଜିଦ, ବୋବୋ ନା କୀ କରବେ । ତାରପର ସହସା ଆବାର ସେ-ଚିନ୍ଚନେ କ୍ରୋଧ ତାର ମାଥାକେ ଉତ୍ତନ୍ତ କରତେ ଥାକେ । ନାମାଜ ପଡ଼ତେ ପଡ଼ତେ ଯାର ସୁମ ଏସେଛେ ତାର ମନେ ଭୟ ନାହିଁ ଏ-କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ । ମନେ ନିଦାରଣ ଭୟ ଥାକଲେ ମାନୁମେର ସୁମ ଆସତେ ପାରେ ନା କଥିଲୋ । ଏବଂ ଏତ କରେଓ ଯାର ମନେ ଭୟ ହୟ ନାହିଁ, ତାକେଇ ଏବାର ଭୟ ହୟ ମଜିଦେର ।

ହଠାତ୍ ଦ୍ରୁତପଦେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ସେଦିନକାର ମତୋ ଏକ ହାତ ଧରେ ହ୍ୟାଚକା ଟାନ ମେରେ ବସିଯେ ଦେଇ ଜମିଲାକେ । ଜମିଲା ଚମକେ ଓଠେ ତାକାଯ ମଜିଦେର ପାନେ । ଥିଥମେ ଚୋଖେ ଜାଗେ ଭୀତି, ତାରପର ସେ-ଚୋଖ କାଳୋ ହୟେ ଆସେ ।

ମଜିଦ ଗୌ ଗୌ କରେ କ୍ରୋଧେ । ରାତର ନୀରବତା ଏତ ଭାରୀ ଯେ, ଗଲା ଛେଡେ ଚିତ୍କାର କରତେ ସାହସ ହୟ ନା, କିନ୍ତୁ ଏକଟା ଚାପା ଗର୍ଜନ ନିଃସ୍ତୁତ ହୟ ତାର ମୁଖ ଦିଯେ । ଯେନ ଦୂର ଆକାଶେ ମେଘ ଗର୍ଜନ କରେ ଗଡ଼ାଯ, ଗଡ଼ାଯ ।

-ତୋମାର ଏତ ଦୁଃସାହସ ? ତୁମି ଜାଯନାମାଜେ ସୁମାଇଛ ? ତୋମାର ଦିଲେ ଏକଟୁ ଭୟଭର ହଇବ ନା ?

ଜମିଲା ହଠାତ୍ ଥରଥର କରେ କାଂପତେ ଶୁରୁ କରେ । ଭୟେ ନୟ କ୍ରୋଧେ । ଗୋଲମାଲ ଶୁନେ ରହିମା ପାଶେର ବିଛାନା ଥେକେ ଓଠେ ଏସେଛିଲ, ସେ ଜମିଲାର କାଂପୁନି ଦେଖେ ଭାବଲେ ଦୁରଭ୍ୟ ଭୟ ବୁଝି ପେଯେଛେ ମେଯେଟାର । କିନ୍ତୁ ଗର୍ଜନ କରଛେ ମଜିଦ, ଗର୍ଜନ କରଛେ ଖୋଦାତାଯାଲାର ନ୍ୟାଯ ବାଣୀ, ତାଁର ନାଥୋଶ ଦିଲ । ମଜିଦେର କ୍ରୋଧ ତୋ ତାଁରଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତଚ୍ଛଟା, ତାଁରଇ କ୍ରୋଧେର ଇଞ୍ଜିତ । କୀ ଆର ବଲବେ ରହିମା । ନିଦାରଣ ଭୟେ ସେଓ ଅସାଡ ହୟେ ଯାଇ । ତବେ ଜମିଲାର ମତୋ କାଂପେ ନା ।

ବାକ୍ୟବାଣ ନିଷଫଲ ଦେଖେ ଆରେକଟା ହ୍ୟାଚକା ଟାନ ଦେଇ ମଜିଦ । ଶୋଯା ଥେକେ ଆଚମକା ଏକଟା ଟାନେ ଯେ ଉଠେ ବସେଛିଲ, ତାକେ ତେମନି ଏକଟା ଟାନ ଦିଯେ ଦାଁଡ଼ କରାତେ ବେଗ ପେତେ ହୟ ନା । ବରଷି କିଛୁ ବୁବେ ଓଠିବାର ଆଗେଇ ଜମିଲା ସୁନ୍ତରି ହୟେ ଦାଁଡ଼ାଳ, ଏବଂ କାଂପତେ ଥାକା ଠୋଟିକେ ଉପେକ୍ଷା କରେ ଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଏକବାର ନିଜେର ଡାନ ହାତେର କଜିର ପାନେ ତାକାଳ । ହୟତ ବ୍ୟଥା ପେଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଥାର ହ୍ୟାନ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲ । ତାତେ ହାତ ବୁଲାଲ ନା । ବୁଲାବାର ଇଚ୍ଛେ ଥାକଲେଓ ଅବସର ପେଲ ନା । କାରଣ ଆରେକଟା ହ୍ୟାଚକା ଟାନ ଦିଯେ ମଜିଦ ତାକେ ନିଯେ ଚଲିଲ ବାଇରେ ଦିକେ ।

ଉଠାନ୍ଟା ତଥିଲେ ପେରୋଯାନି, ବିଭାନ୍ତ ଜମିଲା ହଠାତ୍ ବୁଝାଲେ କୋଥାଯ ମେ ଯାଚେ । ମଜିଦ ତାକେ ମାଜାରେ ନିଯେ ଯାଚେ । ତାରବିର ନାମାଜ ପଡ଼େ ମାଜାରେ ଗିଯେ ମାଫ ଚାହିତେ ହବେ ସେ-କଥା ମଜିଦ ଆଗେଇ ବଲେଛିଲ, ଏବଂ ସେଇ ଥେକେ ଏକଟା ଭୟାନ୍ତ ଉଠିଛିଲ ଜମିଲାର ମନେ । ମାଜାରେର ତ୍ରିସୀମାନାଯ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇନି ମେ । ସକାଳେ ଆଜ ମଜିଦ ଯେ-ଗଲ୍ପଟା ବଲେଛିଲ, ତାରପର ଥେକେ ମାଜାରେର ପ୍ରତି ଭୟଟା ଆରଓ ଘନୀଭୂତ ହୟେ ଉଠିଛେ ।

ମାବ-ଉଠାନେ ହଠାତ୍ ବେଁକେ ବସଲୋ ଜମିଲା । ମଜିଦେର ଟାନେ ଶ୍ରୋତେ-ଭାସା ତୃଗୁଳେରେ ମତୋ ଭେସେ ଯାଚିଲ, ଏଥିନ ମେ ସମନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ କରେ ମଜିଦେର ବଜ୍ରମୁଣ୍ଡି ହତେ ନିଜେର ହାତଟା ଛାଡ଼ିଯେ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗଲ । ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା



করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাতে সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিষ্কেপ করল।

পেছনে-পেছনে রহিমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অঙ্গকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এও বুঝল না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম উঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিগুণ মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাতে অঙ্গকার ভেদ করে মজিদ রহিমার পানে তাকালো, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,

—হে আমার মুখে থুথু দিল!

একটু পরে অঙ্গকার থেকে তৌক্ষুকস্তে আর্টনাদ করে উঠল রহিমা,

—কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্টনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাতে শুক হয়ে গেল মনে-গ্রানে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরণ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহিমার চিংকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোনো কথাও বললো না। আরও কিছুক্ষণ সে স্তুতিভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাতে হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেললো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নাই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নাই। তার হাতের লইটা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসর্তক হবার কোনো কারণ দেখলো না; সে নিজের বজ্রযুষিকে আরও কঠিনতর করে তুলল। তারপর হঠাতে দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে। ভেবেছিল, হাত-পা ছোড়াচূড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার বলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। এবারেও সে অসর্তক হলো না। এখন গা-চেলে নিষেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিশাঙ্গ সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ। ঘর অঙ্গকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি স্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অঙ্গকার; সে-অঙ্গকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লর্ণ বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তৌক্ষ আর্টনাদ শুনে অদ্দের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তৈরি ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অঙ্গকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অঙ্গকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাতে যেন বাঢ় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরস্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরগাদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশ ধ্বনি থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।



ମଜିଦେର କଟ୍ଟେର ବାଡ଼ ଥାଏ ନା । ଜମିଲା ଶୁଣ ହେଁ ବସେ ତାକିଯେ ଥାକେ ସାମନେର ଦିକେ, ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ଏକଟା ଘନବର୍ଣ୍ଣ ଜୁପ ବେଖାଯିତ ହେଁ ଓଠେ ସାମନେ । ମାଜାରେର ଅମ୍ପଟି ଚେହାରାର ଦିକେ ତାକିଯେ-ତାକିଯେ ଜମିଲାର ଭୀତ ଚଞ୍ଚଳ ମନଟା କିଛି ଛିର ହେଁ ଏସେହେ-ଏମନି ସମୟେ ବୁକ-ଫାଟା କଟ୍ଟେ ମଜିଦ ହୋ ହୋ କରେ ଉଠିଲ । ତାର ଦୁଃଖେର ତୀକ୍ଷ୍ନଭାର ମେ କୀ ଧାର । ଅନ୍ଧକାରକେ ଯେଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ କରେ ଦୁ-ଫାଁକ କରେ ଦିଲ । ସଭୟେ ଚମକେ ଓଠେ ଜମିଲା ତାକାଳ ସ୍ଵାମୀର ପାନେ । ମଜିଦେର କଟ୍ଟେ ତଥନ ଆବାର ଦୋଯା-ଦରଙ୍ଦେର ବାଡ଼ ଜେଗେଛେ, ଆର ବାଡ଼େର ମୁଖେ ପଡ଼ା କୁଦ୍ରପଣ୍ଡବେର ମତୋ ଘୂର୍ଣ୍ଣଯମାନ ତାର ଅଶାନ୍ତ ଉଦ୍ଭାନ୍ତ ଚୋଥ ।

ଏକଟୁ ପରେ ହଠାତ ଜମିଲା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ଉଠିଲ । ଆଓୟାଜଟା ଜୋରାଲୋ ନଯ, କାରଗ ଏକଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୀତି ତାର ଗଲା ଦିଯେ ସେଇ ଆନ୍ତ ହାତ ଢୁକିଯେ ଦିଯେଛେ । ତାରପର ସେ ଚୁପ କରେ ଗେଲ । କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େର ଶେଷ ନେଇ । ଓଠା-ନାମା ଆଛେ, ଦିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଛେ, ଶେଷ ନେଇ । ଏବଂ ଶେଷ ନେଇ ବଲେ ମାନୁଷେର ଆଶ୍ଵାସେର ଭରସା ନେଇ ।

ଧାଁ କରେ ଜମିଲା ଉଠେ ଦାଁଡାଲ । କିନ୍ତୁ ମଜିଦଙ୍କ କ୍ଷୀପ୍ରଭାବେ ଉଠେ ଦାଁଡାଲ । ଜମିଲା ଦେଖିଲ ପଥ ବନ୍ଦ । ସେ-ବାଡ଼େର ଉଦ୍ଦାମତାର ଜନ୍ୟ ନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲିବାର ଯୋ ନାହିଁ, ସେ ବାଡ଼େର ଆଘାତେହି ଡାଲପାଳା ଭେତେ ପଥ ବନ୍ଦ ହେଁ ଗେଛେ । ଏକଟୁ ଦୂରେ ଖୋଲା ଦରଜା, ତାରପର ଅନ୍ଧକାର ଆର ତାରାମୟ ଆକାଶେର ଅସୀମତା । ଏହିଟକୁଳ ପଥ ପେରୋବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ।

ଜମିଲାକେ ବସିଯେ କିଛିକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା-ଦରଙ୍ଦ ପଡ଼ା ବନ୍ଦ କରେ ମଜିଦ । ଏହି ସମୟ ସେ ବଲେ,

-ଦେଖ ଆମି ସେଇଭାବେ ବଲି ସେଇଭାବେ କର । ଆମାର ହାତ ହିତେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଭୂତ୍ପ୍ରେତ୍ତେ ରଙ୍ଗା ପାଯ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁନିଆର ମାନୁଷରା ସେମନ ଆମାରେ ଭଯ କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ତେମନି ଭଯ କରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆର ଜିନ-ପରିରା । ଆମାର ମନେ ହିତେହି, ତୋମାର ଓପର କାରଙ୍ଗ ଆହର ଆଛେ । ନା ହିଲେ ମାଜାରପାକେର କୋଳେ ବହ୍ସାଓ ତୋମାର ଚୋଥେ ଏଖନୋ ପାନି ଆଇଲ ନା କେନ, କେନ ତୋମାର ଦିଲେ ଏକଟୁ ପାଶୋନିର ଭାବ ଜାଗଲ ନା? କେନଇ-ବା ମାଜାରପାକ ତୋମାର କାହେ ଆଗନେର ମତୋ ଅସହ୍ୟ ଲାଗତାହେ?

ଏହି ବଲେ ସେ ଏକଟା ଦଢ଼ି ଦିଯେ କାହାକାହି ଏକଟା ଖୁଟିର ସଙ୍ଗେ ଜମିଲାର କୋମର ବାଁଧିଲ । ମାରଖାନେର ଦଢ଼ିଟା ଚିଲା ରାଖିଲ, ଯାତେ ସେ ମାଜାରେର ପାଶେହି ବସେ ଥାକତେ ପାରେ । ତାରପର ଭୟେ ଅସାଡ଼ ହେଁ ଯାଓୟା ଜମିଲାର ଦିକେ ଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକିଯେ ବଲଲ,

-ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଆମାର ମାଯା ହୁଏ । ତୋମାରେ କଟ୍ଟ ଦିତେଛି ତାର ଜନ୍ୟ ଦିଲେ କଟ୍ଟ ହିତେହି । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ଫୋଡ଼ା ହିଲେ ସେ-ଫୋଡ଼ା ଧାରାଲୋ ଛୁରି ଦିଯା କାଟିତେ ହୁଏ, ଜିନେର ଆହର ହିଲେ ବେତ ଦିଯା ଚାବକାଇତେ ହୁଏ, ଚୋଥେ ମରିଚ ଦିତେ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତୋମାରେ ଆମି ଏଇସବ କରନ୍ତି ନା । କାରଗ ମାଜାରପାକେର କାହେ ରାତର ଏକ ପହର ଥାକଲେ ଯତିଇ ନାହୋଡ଼ବାନା ଦୁଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହୋକ ନା କେନ, ବାପ-ବାପ ଡାକ ଛାଡ଼ି ପଲାଇବ । କାଇଲ ତୁମି ଦେଖିବା ଦିଲେ ତୋମାର ଖୋଦାର ଭୟ ଆଇଛେ, ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଇଛେ, ମନେ ଆର ଶୟତାନି ନାହିଁ ।

ମନେ-ମନେ ମଜିଦ ଆଶଙ୍କା କରେଛି, ଜମିଲା ହଠାତ ତାରମ୍ବରେ କାଁଦତେ ଶୁରୁ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆଶର୍ଯ୍ୟ, ଜମିଲା କାଁଦିଲା ନା, କିଛି ବଲିଲା ନା, ଦରଜାର ପାନେ ତାକିଯେ ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ବସେ ରହିଲ । କ୍ଷେତ୍ରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ଦିକେ ସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକିଯେ ଥିଲେ ସେ ଗଲା ଉଚିତ୍ୟେ ବଲଲ,

-ହେ କହି?

-ମାଜାରେ । ଓର ଓପର ଆହର ଆଛେ । ମାଜାରେ କିଛିକ୍ଷଣ ଥାକଲେ ବାପ-ବାପ ଡାକ ଛାଡ଼ି ପଲାଇବ ହେ-ଜିନ ।

-ଓ ଭୟ ପାଇବ ନା?

ହଠାତ ଥିଲେ ଦାଁଡାଲୋ ମଜିଦ । ବିଶ୍ଵିତ ହେଁ ବଲଲ,



—কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার ঘুথে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের। দম খিচে ক্রোধ-সংবরণ করে সে আবার বলল,

—তুমি ঘরে শিয়া শোও বিবি।

রহিমা ঘরে চলে গেল। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইল তার সঙ্গান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ। মধ্যরাতের শুক্রতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ করে রইল। যে-কোনো মুহূর্তে বাইরেথেকে একটা ভীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে—এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুলল। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে থেকে দূরে প্যাচা ডেকে উঠছে, আরও দূরে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অঙ্ককারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিল্লু বিল্লু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমুর্শ রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারপর নড়চড় নাই। আরও সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে ওঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তুপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীত্য ঝির বিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু শোনেও না কিছু। মেঘ দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্ত্রিতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে অপেক্ষা মুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্দেশ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া বলসে ওঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উত্তাসিত অত্যুজ্জল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্ঘ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অঙ্ককারের পানে। সে অঙ্ককারে তবু চোখ পিটিপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটিপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদুরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়ত-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁওয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাতির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন, কারণ ক্রম কাছটা একটু কুঁচকে যায়।



ତାରପର ହଠାଏ ଝଡ଼ ଆସେ । ଦେଖତେ ନା ଦେଖତେ ସାରା ଆକାଶ ଛେଯେ ଯାଇ ଘନକାଳୋ ମେଘେ, ତୀର୍ତ୍ତ ହାଓୟାର ଝାପ୍ଟାଯା ଗାହପାଳା ଗୋଣ୍ଡା, ଥରଥର କରେ କାଁପେ ମାନୁଷେର ବାଡ଼ିଘର । ମଜିଦ ଉଠେ ଆସେ ଭେତରେ । ଭାବେ, ଝଡ଼ ଥାମୁକ । କାରଣ ଆର ଦେଇ ନୟ, ଓଧାରେ ମେଘେର ଆଡ଼ାଳେ ପ୍ରଭାତ ହେଁଥେ । ସୁବେହ୍ ସାଦେକ । ନିର୍ମଳ, ଅତି ପବିତ୍ର ତାର ବିକାଶ । ଯେ-ରାତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଆଆରା ଘୁରେ ବେଡ଼ାଯ ସେ ରାତେର ଶେଷ; ନତୁନ ଦିନେର ଶୁରୁ । ମଜିଦେର କର୍ତ୍ତେ ଗାନେର ମତୋ ଶୁନଗୁଣିଯେ ଉଠେ ପାଁଚ ପଦେର ଛୁରା ଆଲ-ଫାଲାକ । ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶେ ଅଞ୍ଚଳୀମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଛଢାନୋ ଲାଲ ଆଭାକେ ଯେ କୁଞ୍ଚିତ ଭୟାବହ ଅନ୍ଧକାର ମୁଛେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦେଇ, ସେ-ଅନ୍ଧକାରେର ଶୟତାନି ଥେକେ ଆମି ଆଶ୍ୟ ଚାଇ, ଚାଇ ତୋମାରଇ କାହେ ହେ ଖୋଦା, ହେ ପ୍ରଭାତେର ମାଲିକ । ଆମି ବାଁଚତେ ଚାଇ ଯତ ଅନ୍ୟାଯ ଥେକେ, ଶୟତାନେର ମାଯାଜାଳ ଥେକେ ଆର ଯତ ଦୂର୍ବଲତା ଥେକେ, ହେ ଦିନାଦିର ଅଧିକାରୀ ।

ଏହିକେ ପ୍ରଭାତେର ବାହ୍ୟିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇ ନା । ବାଡ଼େର ପରେ ଆସେ ଜୋରାଳୋ ବୃଷ୍ଟି । ଅସଂଖ୍ୟ ତୀରେର ଫଳାର ମତୋ ସେ ବୃଷ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ କରେ ମାଟିକେ । ତାରପର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତଭାବେ ଆସେ ଶିଲାବୃଷ୍ଟି । ମଜିଦେର ଟେଉ-ତୋଳା ଟିନେର ଛାଦେ ଯଥନ ପଥଭାଟ୍ ଉଷ୍କାର ମତୋ ପ୍ରଥମ ଶିଲାଟି ଏସେ ପଡ଼େ ତଥନ ହଠାଏ ମଜିଦ ସୋଜା ହେଁ ଉଠେ ବସେ, କାନ ତାର ଖାଡ଼ା ହେଁ ଉଠେ ବିପଦ ସଂକେତ ଶୁଣେ । ଶ୍ରୀ ଅଜନ୍ତ୍ର ଶିଲାବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁତେ ଶୁରୁ କରେ ।

ତଡ଼ିବେଗେ ମଜିଦ ଉଠେ ଦ୍ଵାରାୟ । ଭୟେ ତାର ମୁଖ୍ୟଟା କେମନ କାଳୋ ହେଁ ଗେଛେ । ଦୁ-ପା ଏଗିଯେ ଓଧାରେ ତାକିଯେ ସେ ବଲେ, ବିବି, ଶିଲାବୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହିଛେ!

ପରିଷକାର ପ୍ରଭାତେର ଅପେକ୍ଷାଯ ରହିମା ଗାଲେ ହାତ ଦିଯେ ଚୁପ୍ଚାପ ବସେଛିଲ । ସେ କୋନୋ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନା । ମଜିଦ ଆରେକୁଟ୍ ଏଗିଯେ ଯାଇ, ତାରପର ଆବାର ଉତ୍ସକର୍ତ୍ତି ଗଲାଯ ବଲେ,

—ବିବି, ଶିଲାବୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହିଛେ!

ରହିମା ଏବାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନା । ତାର ଆବହା ଚୋଖେର ପାନେ ଚେଯେ ମନେ ହୟ, ସେ ଚୋଖ ଯେନ ଜମିଲାର ସେଦିନକାର ଚୋଖେର ମତୋ ହେଁ ଉଠେ-ହେଁ-ଯେଦିନ ସାତକୁଳଖାଓୟା ଥ୍ୟାହଟା ବୁଡ଼ି ଏସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେଛିଲ ।

ଏହିକେ ଆକାଶ ଥେକେ ବରତେ ଥାକେ ପାଥରେର ମତୋ ଥଶ୍ବରେ ବରଫେର ଅଜନ୍ତ୍ର ଟୁକରୋ, ହୟ ଜମା ବୃଷ୍ଟିପାତ । ଦିନେର ବେଳା ହଲେ ବାହୁରଙ୍ଗଳେ ଦିଶେହାରା ହେଁ ଛୁଟି, ଏକ-ଆଖଟା ହ୍ୟତ ଆଘାତ ଥେଯେ ଶୁଯେଓ ପଡ଼ିତ, କାଦେର ମିଶ୍ରର ପେଟଓୟାଲା ଛାଗଲଟା ଡାକତେ ଡାକତେ ହସରାନ ହତୋ । ବଟରା ଆସତ ବେରିଯେ, ଛେଲେରା ଛୁଟି ବାଇରେ, ଲୁଫେ ଲୁଫେ ଥେତ ଖୋଦାର ଟିଲ । କାରଣ ଶୟତାନକେ ତାଡ଼ାବାର ଜନ୍ୟଇ ତୋ ଶିଲା ଛୋଡ଼େ ଖୋଦା ।

ଛେଲେ-ଛୋକରାର ଆନନ୍ଦ କରଲେଓ ବୟକ୍ତ ମାନୁଷେର ମୁଖ କାଳୋ ହେଁ ଆସେ-ତା ଦିନ-ରାତେର ଯଥନଇ ଶିଲାବୃଷ୍ଟି ହେକ ନା କେନ । କାରଣ ମାଠେ-ମାଠେ ନଥର-କଟି ଧାନ ଧରିବ ହେଁ ଯାଇ, ଶିଲାର ଆଘାତେ ତାର ଶିଷ ବାରେ-ବାରେ ପଡ଼େ ମାଟିତେ । ଯାରା ଦୋଯା-ଦରଳଦ ଜାନେ ତାର ତଥନ ବାଡ଼େର ମୁଖେ ପଡ଼ା ନୌକାର ଯାତ୍ରୀଦେର ମତୋ ଆକୁଳକର୍ତ୍ତେ ଖୋଦାକେ ଡାକେ, ଯାରା ଜାନେ ନା ତାରା ପାଥର ହେଁ ବସେ ଥାକେ ।

ରହିମାର କାହେ ଉତ୍ତର ନା ପେଯେ ଏଲେମଦାର ମାନୁଷ ମଜିଦ ଖୋଦାକେ ଡାକତେ ଶୁରୁ କରେ । ଏକବାର ଛୁଟେ ଦରଜାର କାହେ ଯାଇ, ସର୍ବେର ମତୋ ଉଠାନେ ଛେଯେ ଯାଓୟା ଶିଲା ଦେଖେ, ତାରପର ଆବାର ଦୋଯା-ଦରଳଦ ପଡ଼େ ପାଯାଚାରି କରେ ଦ୍ରଂତପଦେ । ଏକସମୟେ ରହିମାର ସାମନେ ଗିଯେ ଥମକେ ଦ୍ଵାରାୟ । ବଲେ,

—କୀ ହୈଲ ତୋମାର? ଦେଖ ନା, ଶିଲାବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ!

ଏକବାର ନଡ଼ବାର ଭକ୍ଷି କରେ ରହିମା, କିନ୍ତୁ ତବୁ କିଛୁ ବଲେ ନା । ପୋଷା ଜୀବଜ୍ଞ ଏକଦିନ ଆହାର ମୁଖେ ନା ଦିଲେ ଯେ ରହିମା ଅନ୍ତିର ହେଁ ଉଠେ ଶୁଦ୍ଧିତ୍ୟା, ଦୁଟୋ ଭାତ ଅଧିକା ନଟ ହଲେ ଯେ ଆଫସୋସ କରେ ବାଁଚେ ନା, ମାଠେ ମାଠେ କଟି ନଥର



ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাতে মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোবো না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিশ্বিত কষ্টে বলে,

—কী হইলো তোমার বিবি?

রহিমা হঠাতে গা বাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

—ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলারুষ্ট থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটা ধূসর আলো ছাড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

বাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছাড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেন্দি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ঝুঁক্ষ হয় না; এমনকি তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহিমা স্পষ্ট কষ্টে প্রশ্ন করে,

—মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হৃক্ষার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উন্নত দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

—না। একটু খেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছের ছাড়লে এই রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহিমা তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাতে বন্যার মতো দুর্বার হয়ে উঠে, তার কম্পমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্঵াস জাগে; তাই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমুঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে।

মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচ্ছিন্ন জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের আস্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারও মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে-সব তো গেল! এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিকরা প্রভাতের স্লান আলোয় বির্বর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

—নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াকল রাখ।

এরপর আর কারও মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাঞ্চ হয়ে আছে বারে-পড়া ধানের ধূসস্তুপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

(সংক্ষেপিত)



শব্দার্থ ও টীকা

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চল

- উপন্যাসিক বাংলাদেশের এমন একটি বিশেষ অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে ফসল এবং খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব অথচ, জনসংখ্যার আধিক্য বর্তমান।

বেরিয়ে পড়বার ... করে রাখে

- অভাবের তাড়নায় দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ জীবিকার সঙ্গানে বেরিয়ে পড়ছে অজানার উদ্দেশে। এই অজানা, অচেনা হান সম্পর্কে তার মধ্যে অনিষ্টয়তার শঙ্কা কাজ করে সেটিই এখানে বোঝানো হয়েছে।

নলি

জ্বালাময় আশা

- জাহাজে চড়ার অনুমতিপত্র।

হা শূন্য

- তীব্র ক্ষুধা ও যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তির প্রত্যাশা।

দিনমানক্ষণের সবুর

- অভাবগ্রস্ত। দারিদ্র্য।

ফাঁসির শামিল

- মৃত্যুর অপেক্ষা। সামান্য সময়ের প্রতীক্ষা।

ঘীমধরা

- মৃত্যুর অনুরূপ।

সর্পিল গতিতে

- অবসন্ন। স্থির।

সজাকুর কাঁটা হয়ে ওঠে

- সাপের আঁকাবাঁকা চলনের মতো।

বহিমুখী উন্নততা

- হঠাতে জেগে ওঠে। সচল হয়।

জানপছানের লোক

- কাজের সঙ্গানে বাইরে যাওয়ার ব্যাকুলতা।

দেহচুত হয়ে

- আত্মীয়স্বজন। প্রিয়জন।

সরভাঙ্গ পাড়

- ইঞ্জিন যখন ট্রেনের বগি থেকে পৃথক হয়।

শস্যের চেয়ে টুপি বেশি

- প্রবল স্নোতে ভেঙে যাওয়া নদীর পাড়।

হেফজ

- উপন্যাসিক যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে প্রচণ্ড অভাবের পাশাপাশি মানুষগুলো ধর্মভীরু। খাদ্য না থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মচর্চার কার্পণ্য নেই –এটাই বোঝানো হয়েছে।

সরুগলা কেরাত

- মুখস্থ। কষ্টস্থ।

ফিকে দাঢ়ি

- চিকন সুরে কোরান পাঠ।

কিতাবে যে বিদ্যে ...

- পাতলা বা হালকা দাঢ়ি।

লোক আবার নেই

- পূর্বের লিখিত বিষয় পুনর্কৃত যেন স্থির ও স্থবির হয়ে আছে।

খোদার এলেমে বুক...

- তাকে গতিশীল এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী করার মতো কেউ নেই।

পেট শূন্য বলে

- ধর্মীয় বিদ্যা এবং ধর্মচর্চা দ্বারা ক্ষুধার্ত মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।

বাহে মূলুকে

- উভরবঙ্গ এলাকায়।

নিরাক পড়া

- বাতাসহীন নিষ্ঠন্ত গুমোট আবহাওয়া। ভদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আকাশটা বুঝি চেতের

মতো চিরে গেল

- টানিয়ে রাখা চেতে কাঁচি চালানোর সাথে সাথে যেমন এক প্রাত্ন থেকে অপর প্রাত্ন পর্যন্ত একেবারে চিরে যায় তেমন অবস্থা বোঝাতে উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

গলুই

চোখে ধারালো দৃষ্টি

ধানের ফাঁকে ফাঁকে ...

ঠিকেবেঁকে চলে

- নৌকার সামনের বা পেছনের শাঙ্ক ও সরু অংশ।
- চোখের সূক্ষ্ম, কৌতুহলী ও অস্তভোদী দৃষ্টি। পানি নিচের মাছের অবস্থান অনুমান করার মতো দৃষ্টি।

- পানিতে নিমজ্জিত ধানক্ষেতে নৌকার এক প্রান্তে চালক খুব সাবধানী। নৌকা চালানোর সময় যেন কোনোভাবে চেউ বা শব্দ তৈরি না হয়। তেমনি অপর প্রান্তে জুতি-কোঁচ হাতে দাঁড়িয়ে শিকারি। তার দৃষ্টিকে সাপের ঠিকেবেঁকে ছুটে চলার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে উপন্যাসিক উদ্ভৃত উপমাটি প্রয়োগ করেছেন।

চোখে তার তেমনি

শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা

দাঁড় বাইছে, ...পানি নয়, তুলো

- তাহের-কাদের মাছ ধরছে। কাদের সন্তর্পণে নৌকা চালাচ্ছে। তাহের নৌকার সম্মুখভাগে-তার দৃষ্টি যেন সূচের অগভাগের মতো তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন। যেখানেই মাছ থাকুক না কেন-দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় তা চোখে ধরা পড়বেই।

- কাদের পেছনে বসে নৌকা চালাচ্ছে। সামনে তাহের। তার ইশারা মতো এতটা সাবধান, সতর্ক ও নিঃশব্দে নৌকা চালাচ্ছে সে। লেখক এখানে পানিকে তুলোর সাথে তুলনা করেছেন। পানিতে বা নৌকায় শব্দ হলে মাছ পালিয়ে যাবে। এ কারণে শিকারিদের অবস্থান এবং বিচরণ নিঃশব্দে এবং সন্তর্পণে হওয়াই উচিত। তাহের কাদেরের নৌকা যেন পানিতে নয়-তুলোর উপর দিয়ে চলছে।

- খাদ্য গ্রহণের জন্য মাছ ধানগাছের পানির মধ্যকার অংশের গায়ে জমে থাকা শেওলায় ঠোকর দেয়। আবার কখনো বা পানির উপরকার শেওলা বা পানায় ঠোকর দিতে থাকে। ধানগাছের ডগা, শেওলা বা পানা নড়তে থাকলে শিকারি মাছের অবস্থান বুবাতে পারে।

- খুব সাবধানে, আলতোভাবে।
- মাছ ধরার জন্য নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র। মাথায় তীক্ষ্ণ শলাকাগুচ্ছ যুক্তবর্ণ বিশেষ।

- দম বন্ধ হওয়া সময় চরম উত্তেজনাকর মুহূর্ত।

- ধানক্ষেতে পানির মধ্যে মাছের অবস্থান দেখে তাহেরের পরবর্তী বিভিন্ন অ্যাকশানের বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। বিলের ভিতর অন্য নৌকার শিকারিরা দেখেছে— তাহের কীভাবে নিঃশব্দে ডান হাতে কোঁচ তুলে বাম হাতের আঙুল দিয়ে ইশারা করে নৌকার



চোখ নিমীলিত

কোটরাগত নিমীলিত সে
চোখে একটুও কম্পন নেই

এভাবেই মজিদের প্রবেশ ...
নাটকেরই পক্ষপাতী

নবাগত লোকটির কোটরাগত
চোখে আগুন

জাহেল
বেঞ্চেম
আনপাড়ু
বেচাইন
চড়াই-উত্তরাই ভাব
চিকনাই
এখানে ধানক্ষেতে ...
আকাশে ভাসে না

দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে ...
সে খেলা সাংঘাতিক

অবস্থান, সামনে-পেছনে-ডাইনে-বায়ে নির্দেশ করছে। অবশেষে শরীরটাকে ধনুকের ঘতো বাঁকিয়ে অতি দ্রুত এবং জোরালোভাবে, সা-বাক শব্দে কোঁচ নিষ্কেপ করেছে।

- চোখ বোজা। মোনাজাত বা প্রার্থনার সময় একাগ্রতার জন্য চোখ বন্ধ রাখা হয়।
- দেবে যাওয়া বন্ধ চোখ দুটির মধ্যে কোনো দ্বিধা, ভয় বা কম্পন নেই। নেই মিথ্যে বলার অপরাধবোধ। মানসিকভাবে সে খুব সাহসী।
- চেনা নেই, জানা নেই; একটা গ্রামে হঠাতে করে চুকে একটি অসাধারণ অভিনয়ে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষকে আকৃষ্ট করে ফেলে আগস্তক মজিদ। অপরিচিত মানুষ দেখে ছেলে বৃক্ষ সবাই কৌতুহলী হয়ে ওঠে। আর এই কৌতুহলকে কাজে লাগায় মজিদ। তার আদব-কায়দা অভিনয়, গ্রামের সাধারণ মানুষের আগ্রহ সবকিছুকে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মকভাবেই উপস্থাপন করেছেন লেখক।
- শীর্ষকায় মজিদের দেবে যাওয়া চোখে আগুন। অসাধারণ অভিনয়। সে যখন বুঝে ফেলে গ্রামের মানুষগুলো মুর্খ কিন্তু কৌতুহলী – তখনই সে যে বিশাল মিথ্যাটিকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার পূর্ব মুহূর্তের অভিনয়টি সে করে নেয়। তার চোখেমুখে ক্রোধের আগুন সবার অন্তরে ছড়িয়ে দিয়ে এক জীতিকর পরিবেশ তৈরি করে।
- অজ্ঞ। মূর্খ। নির্বোধ।
- বিদ্যাহীন। লেখাপড়া জানে না এমন লোক।
- যাদের পড়াশোনা জ্ঞান নেই এমন লোক।
- অস্থির। উত্তল।
- অস্থিরতাজনিত শুক্ষতা, ঝান্তির ভাব।
- উজ্জ্বল। লাবণ্যময় চেহারা।
- যে স্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানকার মানুষ জমি-জমায় আবাদ করে— ফসল ফলিয়ে ভালোই আছে কিন্তু তাদের অন্তরে খোদার প্রতি আগ্রহ বা অনুরাগের অভাব আছে।
- বস্তুত মজিদ অভাবগ্রস্ত এলাকার অধিবাসী। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এলাকা ছেড়েছে সে। মহববতনগরে এসে সেখানকার মানুষকে

- বোকা বানিয়ে যে মিথ্যে মাজার ব্যবসার পথে অগ্রসর হয়েছে লেখক তাকে সাংস্কৃতিক বা ভয়ংকর ‘খেলার’ সাথে তুলনা করেছেন। যদি কখনো এই মিথ্যার রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় তখন সামাল দেওয়া মজিদের পক্ষে কতটা সম্ভব সে কথা ভেবেই লেখক এ অন্তব্য করেছেন।
- মজিদ যখন মিথ্যা মোদাচ্ছের পিরের মাজারের কথা বলে উপস্থিত গ্রামবাসীকে গালাগালি করছিল তখন তাদের ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। সত্যিই তারা পিরের মাজারকে এরকম অযত্ত অবহেলায় ফেলে রেখেছে? এ কারণে তাদের অপরাধী মুখ নিচু হয়ে আছে— চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে লজ্জা মিশ্রিত অপরাধবোধ।
 - এক রকম লাল সুতি কাপড়।
 - এটি একটি উপমা। মাছের পিঠের মাঝখানটা যেমন উঁচু, মাজারের মাঝখানটাও তেমনি উঁচু।
 - জমিতে বীজ বপন বা ফসল বোনার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।
 - প্রচুর ধান। গোলা বা মোড়া ভর্তি ধান।
 - প্রচণ্ড অভাবের দিনের কথা। না খেতে পেয়ে অপুষ্টি অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষের বুকের পাঁজরের হাড় জেগে ওঠে। এ রকম অবস্থার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে।
 - বিধবা।
 - কথা বা আওয়াজ নেই।
 - মাটি রাগ করে।
 - কবরে শান্তি হবে।
 - অনাত্মীয়।
 - সীসা একটি কঠিন ধাতব পদার্থ। আগুনে পোড়ালে তা গলে যায় এবং যে পাত্রে রাখা যায় তাতে ছড়িয়ে পড়ে সমান্তরালভাবে। মজিদের উপদেশ বাণী শোনার পর লজ্জা রহিমার সমস্ত শরীরে ওই রূপ ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি উপমা।
 - রহিমা মজিদের স্ত্রী। তার অনুগত ও বাধ্য। মজিদের ভয়ে সে ভীতও। মজিদের চোখের ভাষা বোবে সে। তাছাড়া সে ধর্মভীকু। গ্রামের মানুষগুলোও তারই মতো একই রকম ধর্মভীকু ও মজিদের প্রতি অনুগত।



আত্মর্যাদার ভুয়ো বাণ্ডা

উঁচিয়ে রাখবার

- জমির মালিকানা সংক্রান্ত ধারণা। গ্রামে যে যত বেশি জমির মালিক, সে তত বেশি র্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। এই মালিকানার র্যাদাকে লেখক বাণ্ডা উঁচিয়ে রাখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে যে বৈষয়িক অহমিকা তাকে লেখক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভুয়ো বা আমার বলে অভিহিত করেছেন।
- মাটির চেলা, কোদাল দিয়ে কোপানো বা লাঙল দিয়ে চাষ করার পর মাটির যে ছোট ছোট খন্দ তৈরি হয়।

মাটির এলো খাবড়া দলাঙ্গলো

সিপাইর খণ্ডিত ছিল দেহের
একতাল অর্থহীন মাংসের
মতো জমি

- জমি নিয়ে মানুষে মানুষে বিবাদ হয়, হানাহানি, ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি এমন কি রক্তারক্তিও হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো সৈনিকের অর্থহীন খণ্ডিত দেহের মাংসপিণ্ডের সঙ্গে জমি নিয়ে এই বিবাদ বিস্বাদের অর্থহীনতাকে তুলনা করা হয়েছে। এটি একটি উপমা।
- অনুর্বর ভূমি নিষ্পত্তি জমি।

রুঠাজমি

শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায়
নীল হয়ে ঝলেপুড়ে মরে

- মেঘ বৃষ্টিবিহীন নীল আকাশকে কেমন উন্মুক্ত - ন্যাংটো মনে হয়। রোদের তাপদাহে মাঠ-প্রান্তের মাটি ফেটে চৌচির। বৃষ্টি আর মেঘ শূন্যতায় আকাশকেই মনে হয় শূন্য। তার নীলের ভেতর মৃত্যু যত্নগা ছাড়া আর কিছু নেই যেন।
- কমনীয়, সরস ও নবীন।
- বিশেষ এক ধরনের পাত্রে এবং গ্রাম্য পদ্ধতিতে জমিতে সেচ দেওয়া।

নধর নধর

কোঁদে কোঁদে পানি তোলে
মাটির তৃক্ষণায় তাদেরও
অন্তর থা থা করে

- কৃষক শ্রম দিয়ে মেধা-মনন দিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে মাঠে ফসল ফলায়। ফসল ফলানোর এক পর্যায়ে মাঠে পানি দিতে হয়। পানির অভাবে চারাগাছ শুকিয়ে যায়— হলুদ হয়ে মারা যায়, মাটি শুক হয়ে মাঠ ফেটে যায়। এ অবস্থা দেখে কৃষকের বুক ফেটে যায় অজানা শক্তায়।

দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাণ্টে

তাগড়া
গাঁটাগোটা
শ্যেন দৃষ্টি

- অমাবস্যার দুইদিন পরের চাঁদ— দ্বিতীয়ার চাঁদ। নতুন ওষ্ঠা এই চাঁদের আকৃতি বাঁকা কাণ্টের মতো। যে কাণ্টে হাতে কৃষক মাঠের ধান কাটে আর মনের আনন্দে গান ধরে।
- বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া।
- খর্ব ও স্তুল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় অঙ্গ প্রতিযুক্ত; আঁটসাঁট দেহবিশিষ্ট।
- বাজপাথি বা শিকারি পাথির মতো দৃষ্টি।



ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে

... অবজ্ঞা করে যেন

- মহবতনগরের মানুষের অকৃতিম হাসি, অনাবিল আনন্দ মজিদকে করে তোলে ভীতসন্ত্রস্ত। গ্রামের মানুষ যদি ফসলের মাধ্যমে সচ্ছলতা অর্জন করে ফেলে তাহলে তাদের মনে খোদার প্রতি আনুগত্য করে যাবে – করে যাবে মজিদের প্রতি নির্ভরশীলতা। মজিদ তো চায় গ্রামের মানুষ অভাব অনটনে থাকুক, ঝাগড়া-বিবাদ, হানাহানি-রাহাজানিসহ বিভিন্ন ফ্যাসাদে জড়িয়ে থেকে মজিদের শরণাপন্ন হয়। মজিদ তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে তাদের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে। কিন্তু তারা নির্ভেজাল জীবন যাপন করলে মজিদ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে এই মনোভাবই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

রিজিক দেনেওয়ালা

বুত পূজারী

নছিহত

খতম পড়াবার

- জীবনোপকরণ বা অন্ন-বস্ত্র দাতা, খাদ্য যোগানদার।
- ঘার মূর্তি পূজা করে।
- উপদেশ। পরামর্শ।
- অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনো বিপদ আগদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা পবিত্র কোরান-শরিফ পড়ানোর ব্যবস্থা করে। কোরান শরিফের ৩০ পারা পড়ে শেষ করাকে কোরান খতম বলে। এর মাধ্যমে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন হবে বলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মনে করেন।

কলমা

- কলেমা। ইসলাম ধর্মে পাঁচটি কলেমা আছে। এর প্রথমটি কলেমা তাইয়েব-“লা ইলাহা ইল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্” অর্থাৎ আল্লাহ ব্যক্তিত কোনো উপাস্য নাই; মুহম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল— অর্থাৎ মুহম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

মুরক্কু

আমসিপারা

- মুর্খ। বোকা।

- আরবি বর্গমালার উচ্চারণসহ সুরা সংকলন। পবিত্র কোরান শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ।

মন্তব

- মুসলমান বালক-বালিকাদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিক্ষালয়।

জুম্মাবার

- শুক্রবার দিন জোহরের সময়ে মুসলমানদের জামাতে অংশগ্রহণ করে আদায়কৃত নামাজ।

রা নেই

- রব। সাড়া। শব্দ। ধ্বনি। মুখের কথা নেই।

তারস্বর

- অতি উচ্চ শব্দের চিত্কার।

ধামড়া

- বয়ক্ষ। পাকা।

মারংফ

- মহান পুরুষ। মহাপুরুষ।

রুহ

- আজ্ঞা। অন্তরাজ্ঞা।

মহা তমিদ্রা

- গভীর অন্ধকার। ঘোর অমানিশা।

রহমত

- করণা। দয়া। কৃপা। অনুগ্রহ।

মওত

- মৃত্যু। মরণ।



- ଦେଖା** — ଲସ୍ବା । ପାତଳା ଶରୀର ।
- ଶୟତାନେର ଖାଦ୍ୟ** — ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖୁଟି ବା କୁଣ୍ଡ । ଏଥାମେ ହାସୁନିର ମାର ବାପ ତଥା ତାହେର କାଦେରେର ବାପକେ ମଜିଦେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଶ୍ୟତାନେର ଖୁଟି ବଲା ହେଁଛେ । ତାହେରେର ବାପ ବୁଡ୍ଢୋ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ଲେଖେ ଥାକେ । ଏ ଦିକେ ବୁଡ୍ଢୋର ମେଯେ ହାସୁନିର ମା ମଜିଦେର କାହେ ଏସେ ବାପେର ବିରଳକୁ ନାଲିଶ ଜାନାଯ । ତାହେରେର ବାପ କିଛୁଟା ବୋକା ଓ ଏକରୋଥା । ଏଟି ମଜିଦେର ମୋଟେଇ ପଛନ୍ଦ ନୟ । ମଜିଦ ଭାବେ ଏଇ ବୁଡ୍ଢୋଇ ଶ୍ୟତାନେର ଖାଦ୍ୟ ।
- ବାଜଖୌଇ ଗଲାଯ** — ଗଞ୍ଜିର ଓ କରକଶ ଘରେ ।
- ବ୍ୟାକ୍ଷଈ** — ବେବାକ । ସବାଇ । ସକଳେଇ ।
- ଝୁଟମୁଟ** — ମିଥ୍ୟା । ବାନାନୋ କଥା ।
- ଚୋଲ-ସୋହରତ** — କୋଳେ ବିଷୟ ଢାକ-ଢୋଲ ବାଜିଯେ ପ୍ରଚାର କରା, ପ୍ରଚାରେର ବ୍ୟାପକତା ଅର୍ଥେ ।
- ଛୁରା ଫାତେହା** — ପବିତ୍ର କୋରାନେର ପ୍ରଥମ ସୁରା ।
- ନେକବନ୍ଦ** — ପୁଣ୍ୟବାନ । ମହାପୁରୁଷ ।
- ଝାଜୁଭଙ୍ଗିତେ** — ସୋଜାସୁଜିଭାବେ ।
- ବରସନା ପ୍ରକ୍ଷିଣ୍ଟ ହେଁଛେ** — ଜିହ୍ଵା ବେରିଯେ ଏସେଛେ ।
- ଛୁରାଯେ ଆଲ-ନୂର** — ପବିତ୍ର କୋରାନ-ଶରିଫେର ଏକଟି ସୁରା— ସେଥାନେ ମାନବ ଜାତିକେ ଆଲୋର ପଥ ଦେଖାନୋ ହେଁଛେ । ପାଶାପାଶ ମୂଳତ ନାରୀଦେର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଛେ ।
- କେରାତ** — ପବିତ୍ର କୋରାନ-ଶରିଫେର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ।
- ଚୋଥ ନାବାୟ** — ଚୋଥ ନତ କରେ । ମାଦ୍ଦା ନତ କରେ ନିଚେର ଦିକେ ତାକାଯ ।
- ହଲଫ** — ସତ୍ୟ କଥା ବଲାର ଜନ୍ୟ ଯେ ଶପଥ କରା ହୟ । ଶପଥ । ପ୍ରତିଜ୍ଞା ।
- ରନ୍ଦି** — ପଚା । ବାସି ।
- ରମ୍ଦନ ନିଃଶ୍ଵାସେର ସ୍ତରତା** — ଦମ ବନ୍ଧ କରା ବା ନିଃଶ୍ଵାସ ବନ୍ଧ ହେଁ ଯାଉୟାର ମତୋ ନୀରବତା ।
- ଲେଲିହାନ ଶିଖା** — ଦାଉଦାଉ କରା ଆଶ୍ଵନେର ଶିଖା ।
- ଦେଖା ବଦମେଜାଜି ବୃକ୍ଷ ଲୋକଟି** — ଲସ୍ବା ବା ଦୀର୍ଘଦେହୀ ଉହା ମେଜାଜି ବା ରଗଚଟା ବୁଡ୍ଢୋ ମାନୁଷଟି । ଏଥାମେ ତାହେର-କାଦେରେର ବାପେର କଥା ବଲା ହେଁଛେ ।
- ଆମସିଗାନା ମୁଖ** — ଶୁକିଯେ ଯାଉୟା ମୁଖ ।
- ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭଙ୍ଗିତେ** — ବାଁକା । ଅସରଲ । କୁଟିଲଭାବେ ।
- ବାଜପାଥି** — ଏକ ଧରନେର ଶିକାରି ପାଥି ।
- ଆଥାଲି-ପାଥାଲି** — ଏଲୋମେଲୋ ।
- ଲୋଟା** — ଘଟି । ପାତ୍ର ବିଶେଷ ।
- ବାଳା** — ଆପଦ-ବିପଦ ।
- ମଗଡ଼ାର ପର ମଗଡ଼ା** — ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣେର ଗୋଲାର ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୋବାତେ ।
- ଶୋକର ଗୁଜାର** — କୃତଜ୍ଞତା । ପ୍ରଶଂସା । ତୃଷ୍ଣି ବା ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ



- তোয়াক্কল** – ভরসা। নির্ভর।
- নিতিবিতি করে** – সংকোচে ইতস্তত করা।
- পির** – মুসলিম দীক্ষাশুরু। পুণ্যাত্মা।
- মুরিদ** – মুসলমান ভক্ত বা শিষ্য। সাধক।
- খড়গনাসা-গৌরবর্ণ চেহারা** – ধারালো নাকবিশিষ্ট সুন্দর উজ্জ্বল চেহারা।
- এন্টেমাল** – ব্যবহার করা। আয়ত্ত করা।
- রুহানি তাকত ও কাশফ** – আত্মিক শক্তি উন্মোচন করা।
- কৃষ্ণপঙ্কের চাঁদ** – অমাবস্যার পূর্বে চাঁদ ছোট হতে হতে হঠাত যেমন মিলিয়ে যায়। এটি একটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- বাতরস স্ফীত পদযুগল** – পির সাহেবের বাতরোগগ্রস্ত পায়ের কথা এখানে বলা হয়েছে।
- কালো মাথার সমুদ্র** – অনেক মানুষের মাথার চূল এক সঙ্গে একটি কালো সমুদ্রের মতো মনে হয়। এটি একটি উপমা।
- বয়েত** – কবিতাংশ; আরবি, ফারসি বা উর্দু কবিতার শ্লোক।
- বেদাতি** – ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতির বাইরের কিছু।
- তকলিফ** – কষ্ট।
- জঙ্গীফ** – অতি বৃদ্ধ।
- রেস্তায়** – সম্পর্কে। আত্মায়তায়।
- দেবৎশি** – দেবতার ভাব।
- স্টকাইছে** – পালিয়ে গেছে।
- কেরায়া নায়ের মাঝি** – ভাড়াখাটা নৌকার মাঝি।
- রেহেল** – কোরান খরিফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো।
- তাছির** – প্রভাব।
- উচ্চকা** – অবাধ্য। ডানপিঠে। দুরস্ত।
- বৃষ্টি পানিসিদ্ধিত জঙ্গলের মতো** – বৃষ্টির পানি পেয়ে জঙ্গল যেমন আরও ঘন হয়ে উঠে – তেমন।
- শিরালি** – শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মন্ত্র বা দোয়া পড়ে।
- বরগা** – ছাদের ভর ধরে রাখার কাঠ বা লোহা।
- হড়কা** – দরজার খিল।
- বাজা মেয়ে** – বন্ধ্যা নারী। যে নারীর সন্তান হয় না।
- মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো** – এটিও একটি উপমা। মাজারের পিঠের ওপর থেকে কাপড়টি সরে যাওয়ায় তাকে তাকিয়ে থাকা মরদেহের মতো মনে হয়।



বাইরে আকাশে শঙ্খচিল...

ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্ত

- এটি একটি রূপকার্থক বাক্য। শঙ্খচিল স্বাধীনভাবে আকাশে উড়ে, কাকও স্বাধীনভাবে ডাকাডাকি করে। এখানে বস্তুত জগিলার স্বাধীন সত্ত্বার রূপকার্থক পরিচয় জ্ঞাপন করে।

দুলার বাপ

- বরের বাবা। শঙ্খুর।

ঠাটাপড়া

- অকস্মাত বজ্রপাত হওয়া।

বালা

- বিপদ।

এৎবার

- বিশ্বাস।

রগড়ে

- ডলে। ঘষে।

বর্তন

- বড় থালা।

এলেমদার

- জ্ঞানী। বিদ্বান।

দিনাদির অধিকারী

- আল্লাহ। স্বষ্টি।

খোদার চিল

- শয়তানকে তাড়ানোর জন্য বৃষ্টিকপী শিলা।

নফরমানি

- অবাধ্য।

তোয়াক্কল

- বিশ্বাস। আস্থা।

বিশ্বাসের পাথরে যেন

- চোখের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা বোঝাতে উৎপ্রেক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মজিদের মহৱত্তনগ্র গ্রামে প্রবেশটা কেমন ছিল?

ক. অবধারিত

খ. নাটকীয়

গ. কাব্যিক

ঘ. স্বাভাবিক

২. ‘মাজারটি তার শক্তির মূল’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. বিশ্বাস

খ. আনুগত্য

গ. ভীতি

ঘ. অনুরাগ

নিচের উচ্চীপক্ষটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

কাজিপাড়া গ্রামের কামরূল কর্মসূত্রে ঢাকায় থাকেন। তিনি চিন্তা করলেন আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানের পরিআশ নেই। এ তাড়না থেকেই তিনি গ্রামে একটি সাধারণ শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ নিলেন। তিনি গ্রামের মানুষদের বোঝালেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলে মুসলমানরা বর্তমান যুগে পিছিয়ে পড়বে। গ্রামের লোকেরা তাকে আর্থিক সহযোগিতা করতে সম্মত হলো। এ ক্ষেত্রে বাদ সাধল গ্রামের প্রভাবশালী ও রক্ষণশীল কতিপয় লোক। ফলে কামরূলের উদ্যোগ সফল হতে পারল না।



৩. উদ্বীপকের কামরূলের সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?

ক. তাহের

খ. খালেক

গ. আকাশ

ঘ. ধলা মিয়া

৪. উক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে-

i. সংগ্রামী মনোভাব ও আহ্বাশীলতা

ii. গ্রামের উন্নতি সাধনে আগ্রহ

iii. আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের ইচ্ছা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

ওয়াসিকা গ্রামের এক দুরন্ত মেয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে ছুটোছুটি করা, অবাধে সাঁতার কাটা তার আনন্দের কাজ। তার বাবা অভাবের তাড়নায় ওয়াসিকাকে পাশের গ্রামের এক বুড়ো লোকের সাথে বিয়ে দিলেন। লোকটি গ্রামের মাতব্বর। তাকে সবাই একাকর মুসি বলে ডাকে। মুসির কথা গ্রামের সবাই মানলেও চঞ্চল ও স্বাধীনচেতা ওয়াসিকা তার কথা মানে না।

ক. ধলা মিয়া কেমন ধরনের মানুষ ছিল?

খ. ‘সঙ্গের নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মৃত্তিবৎ বসে থাকে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ওয়াসিকা ‘লালসালু’ উপন্যাসের জমিলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্বীপকের একাকর মুসি ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের সামগ্রিক দিক ধারণ করেনি- মূল্যায়ন কর।

সমাপ্তি



২০২১-২০২২

শিক্ষাবর্ষ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম

সহপাঠ

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করছন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়